যে হিসাবে ঋষি বলা যায়, সে হিসাবে দেবেন্দ্রনাথকে ঋষি বলিতে অনেকেরই বিবেক আপত্তি করিবে।

'সেকালেই ঋষি যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে' এমন কথা আমরা বলি না। তবে এ কথা আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য যে, এ কালের ঋষিদের দেখিয়া মনে হয় যে, সেকালে যে সমস্ত কারণে ঋষি হওয়া যাইত, একালে বা তাহা না হইলেও চলে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থকে কেহ কেহ ব্রাহ্মী উপনিষদ বলিয়াছেন। আমরা তাহাতে কিঞ্চিৎ আপত্তি করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের অধিকাংশ শ্লোকগুলিই এক নিরাকার সগুণ আনন্দময় ব্রহ্মকে প্রতিপন্ন করিতেছে কিন্তু ইহা ছাড়াও ব্রহ্মপ্রতিপাদক বহু শ্লোক ত উপনিষদে রহিয়াছে—দেবেন্দ্রনাথ যাহা সংগ্রহ করেন নাই? তাহা কি ব্রাহ্মী উপনিষদ হইবে না? যদি হয়, তবে বিশেষভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থকে ব্রাহ্মী উপনিষদ বলিবার সার্থকতা কি?

আমাদের শ্রুতিশাস্ত্রে ব্রহ্মের দুইটি দিকের বিষয়ই খুব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। এক নির্গুণের দিক্, আর সগুণের দিক্। এই শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যে সমস্ত দার্শনিক মতবাদ দেখা দিয়াছে, তাহার কোন মত নির্গুণ ব্রহ্মকে এবং কোন মত বা সগুণ ব্রহ্মবাদকে সমর্থন করিয়াছে। শ্রুতিশাস্ত্রের মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্মবাদসূচক শ্লোকগুলিকে দেবেন্দ্রনাথ বাছাই করিয়া 'নীর' বিবেচনায় ত্যাগ করিয়াছেন, আর সগুণ ব্রহ্মবাদমূলক কতকগুলি শ্লোককে 'ক্ষীর' বিবেচনায় গ্রহণ করিয়াছেন; এবং এই বাছাই প্রণালীকেই এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার এক অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড বলিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিবার জন্য এক আধুনিক চেষ্টা দেখা দিয়াছে। তাহার যুক্তি হইতেছে এই যে, নির্গুণ ব্রহ্মবাদে ব্যক্তিত্বের আদর্শ ফুটে না, নৈতিকধর্ম্ম জাগে না, সমাজধর্ম্ম অব্যাহত থাকে না, সমস্ত জাতির পক্ষে একটা স্থিতির আদর্শ ঘোচে না,—ইত্যাদি। খৃষ্টান পাদ্রীদের এই সমস্ত যুক্তির উত্তর রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সমানে দিয়া আসিতেছেন, তাহার পুনরুল্লেখ আবশ্যক করে না। যাঁহারা দেশী খৃষ্টান, ধর্ম্ম না হইলেও ভাবে ও আচরণে, তাঁহারা হিন্দুর জাতীয় চিন্তার বিশিষ্টতাকে হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য-ভ্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং তাঁহারা না দেশী, না বিলাতী, এই দুইয়ের বার! তাঁহাদের সহিত তর্ক পণ্ডশ্রম। তবে অদ্বৈতবাদের সমাধিকে যাঁহারা 'একরকমের জীবন্ত কবর' বলিয়া উপহাস করিবার স্পর্দ্ধা রাখেন, তাঁহাদের ধর্ম্মানুভূতির নিকট আমরা জানিতে চাই যে, তাঁহারা ইহা জানিলেন কিরূপে? সমাধি একটা মতের ব্যাপার নহে। ইহা সাধনার ফল, সিদ্ধির অবস্থা। যে সাধনা করে নাই, যে সিদ্ধ হয় নাই, সে যদি এবংবিধ ধৃষ্ট-বাক্য

দ্বারা জাতীয় ধর্ম্মানুভূতিকে অযথা ব্যঙ্গ করে এবং প্রশ্রয় পায়, তবে বস্তুতঃই অনুতাপের বিষয়।

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থে উপনিষদের শ্লোকের এরূপ উদ্ভট বাছাই, বোধ হয়, কোন বিদেশী-তেও সম্ভব হয় না। ব্রহ্মের নির্গুণের দিক্‌টাকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া হিন্দু-জাতির সমগ্র শ্রুতিশাস্ত্রের উপর এই বাছাই-প্রণালী এক অতি অমার্জ্জনীয় অবিচার বলিয়া আমরা মনে করি। আর বিশেষতঃ এইরূপ বাছাই-প্রণালী ও মত-বাদ যে উভয়তঃই রাজা রামমোহনের আদর্শ ও প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে প্রস্তুত। একটা বিশেষ দার্শনিক মতবাদের মধ্যে এই বাছাই-প্রণালী ব্রাহ্মধর্ম্মকে আবদ্ধ করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বাভাবিক বিকাশের পথে এই গ্রন্থ এক বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থসম্বন্ধে আমরা ইহার উৎপত্তিকালে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থার আলোচনা করিয়াছি। এই গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথের শাস্ত্রমীমাংসার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি; ব্রাহ্মসমাজের উপর এই গ্রন্থের কিরূপ প্রভাব, তাহা দেখাইয়াছি; শাস্ত্রের গ্রহণ ও বর্জ্জন ব্যাপারে এই গ্রন্থে কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি এবং এই গ্রন্থের মতবাদেরও যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।

আমাদের বিবেচনায় ইহা দেবেন্দ্রনাথের আত্মপ্রত্যয়লব্ধ অথচ শ্রুতিবাক্যানু-গামী ধর্ম্মানুভূতির গ্রন্থ বলিলেই অধিকতর শোভন হইত। ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ বলিতে অনেক দিক্ হইতে অনেক রকম আপত্তি উঠিয়াছিল এবং এখনও উঠিবে। উঠা স্বাভাবিক।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

সাহিত্যে "রূপান্তর"

সকল সাহিত্যেই মাঝে মাঝে এমন এক একটা কথার সৃষ্টি হয়, যাহাতে জনসাধারণের চিন্তাতে একটা যুগান্তর আনিয়া দেয়।

"সাহিত্যের রূপান্তর" কথাটি, আমার মনে হয়, এই জাতীয়।

প্রথমে যখন এই কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, সাধারণ লোকে ইহার মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই; তবে ইহাতে যে বুঝিবার বস্তু আছে, এ ধারণা অনেকেরই জন্মিয়াছিল। কথাটি এখনও সকলে ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। ধরিতে পারিলে সাহিত্য সমালোচনায় একটা নূতন বিজ্ঞানের সূত্রপাত হইবে।

সাহিত্য বলিতে এক্ষেত্রে রস-সাহিত্যমাত্র বুঝিতে হইবে। ব্যাপক অর্থে আজ কালি সাহিত্য শব্দে গণিত, দর্শন, ইতিহাস, জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় লিপিবদ্ধ জ্ঞানকেই বুঝায়। ইংরাজিতে এ সকলই লিটারেচরের (literature) অন্তর্গত। কিন্তু যে সাহিত্যের রূপান্তরের কথা বলা হয়, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গণিত, দর্শন, ইতিহাস, জড় বা জীব বিজ্ঞানাদির কোনও সম্বন্ধ নাই। গণিতের বা দর্শনের ইতিহাসের বা ভূতত্ত্বের বা রসায়নের বা জড়বিজ্ঞানের বা physics'এর কথা যখন সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়, অর্থাৎ কোনও গণিতবিদ্ বা দার্শনিক বা ঐতিহাসিক বা ভূতত্ত্ববিদ্ বা রাসায়নিক বা জড়বিজ্ঞানবিদ্ যখন আপনাপন গবেষণাদিকে লিপিবদ্ধ ও প্রণালিবদ্ধ করিয়া কোনও সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি সম্পাদন করেন, তখন তাঁহাদের এ সকল রচনাতে গণিতের বা দর্শনের, ইতিহাসের বা ভূগোলের, জড়বিজ্ঞানের বা জীববিজ্ঞানের সত্য ও তথ্য সকল কোনও প্রকারের রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না। ইঁহারা যে বস্তু বা ব্যাপারকে যে ভাবে দেখেন, ঠিক সেই ভাবেই তার বর্ণনা করিয়া থাকেন। আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যেখানে যে ভাবে ও যে রূপেতে, যে সকল সম্বন্ধেতে আবদ্ধ হইয়া দূরবীক্ষণের প্রত্যক্ষীভূত হয়, জ্যোতির্বিদ্যায় তাহাদের সেই সংস্থান ও সেই সম্বন্ধই বর্ণিত হইয়া থাকে। দ্রষ্টার অন্তরের রসানুভূতির দ্বারা তাহাতে কোনও প্রকারের রং ফলিয়া উঠে না।

এই রং ফলানটা আমাদের দর্শনের বা জ্ঞানের কর্ম্ম নহে। আমাদের অন্তরের যে বৃত্তির দ্বারা আমরা বস্তু-সাক্ষাৎকারে সুখ বা দুঃখ, কিম্বা হাস্য, অদ্ভুত, করুণ, রুদ্র, বীর, বীভৎস, ভয়ানক প্রভৃতি রস আস্বাদন করিয়া থাকি, সেই বৃত্তিই এ সকল বস্তুতে এ সকল রসের রং ফলাইয়া থাকে। এই জন্য এই বৃত্তিকে রঞ্জিনী

বৃত্তি কহে। এই রঞ্জিনী বৃত্তির দ্বারাই যাবতীয় রসানুভব ও এই রসানুভূতির ফলে সমুদায় রস-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

আলোক-বিজ্ঞান বর্ণের ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, বিশ্বের অপূর্ব্ব বর্ণ-বৈচিত্র্যের নিদানাদির নির্ণয় করিয়া থাকে। যে বর্ণটি যেভাবে যেখানে প্রকাশিত হয়, কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসমাবেশে আকাশের মেঘমণ্ডলে নানাপ্রকারের রং-লীলা প্রকটিত হয়, অথবা কি সূত্রে বনস্থলীতে পত্র-পল্লব-পুষ্পাদিতে বিচিত্র বর্ণ সকল ফুটিয়া উঠে, আলোকবিজ্ঞান কেবল তাহাই ব্যক্ত করে। কিন্তু শারদীয় ঊষার উদ্ভিন্ন আলোকে হিমানী-মণ্ডিত অত্যুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের বর্ণবিলাস দেখিয়া কবির বা ভাবুকের প্রাণের মর্ম্মে মর্ম্মে যে আনন্দলহরী জাগিয়া উঠে, আলোকবিজ্ঞান তার খবর রাখে না।

সেইরূপ বিশ্বের বিচিত্র ধ্বনিসকলের অনুভূতিকে ধরিয়া, কিরূপে কোন সূত্রে কোন্ বাহন অবলম্বন করিয়া, এ সকল শব্দ দিঙ্মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে; শব্দের সহিত আমাদের শ্রুতিযুগলের কি সম্বন্ধ; আমরা যেসকল শব্দ বা ধ্বনি উচ্চারণ করি, তার সঙ্গে আমাদের কণ্ঠনালীর কি সম্বন্ধ; সংগীতের মূর্চ্ছনা অন্তরা প্রভৃতির মূল উৎপত্তি ও লক্ষণ কি,—ধ্বনি-বিজ্ঞান বা accoustics তাহারই সত্য ও তথ্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু এ সকল ধ্বনিসংযোগে মানুষ সংগীতের সৃষ্টি করিয়া কিরূপে যে আপনার অন্তরের বিবিধ রসানুভবকে ব্যক্ত ও সম্ভোগ করে, সে কথা শব্দ-বিজ্ঞান জানে না। কেন যে প্রত্যুষে ভৈরবীর আলাপ শুনিয়া, আমাদের মর্ম্মের স্তরে স্তরে জীবনের তরঙ্গ নাচিয়া উঠে; আবার কেনই বা মধ্যাহ্নে বেহাগের আলাপ শুনিয়া আমাদের চিত্তের উপরে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা আসিয়া ছাইয়া পড়ে; কিম্বা সায়াহ্নের প্রাক্কালে, সূর্য্য যখন পশ্চিম গগনে ডুবিতে থাকে, আসন্ন অন্ধকারের ভয়ভাবনায় পাখীরা যখন আপন আপন কুলায়ে প্রতিনিবৃত্ত হয়, পথশ্রান্ত পথিক যখন প্রান্তর-মধ্যে পথ চলিতে চলিতে গ্রামান্তে যাইয়া আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন পুরবীর আলাপ শুনিয়া আমাদের প্রাণ, ঘরে বসিয়াই, কেন উদাস হইয়া উঠে,—এ সকল খবর শব্দবিজ্ঞান বা accoustics কিছুই রাখে না।

সেইরূপ দেহ-বিজ্ঞান বা physiology অস্থিবিজ্ঞান বা anatomy জীবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের, পেশি ও অস্থিসমূহের, অস্থিসন্ধির সন্ধান করিয়া, কোথায় কি ভাবে কোন্ পেশী বা কোন্ অস্থি সমাবিষ্ট, তাহাই কেবল বলিয়া দেয়। কিন্তু এই রক্ত মাংসের, এই অস্থিপেশিময় দেহযষ্টি দেখিয়া, আমাদের অন্তরে যে সকল অনুরাগ বা বিরাগের সঞ্চার হয়, তার কথা দেহবিজ্ঞান বা অস্থি-বিজ্ঞান কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না। এই অনুরাগে বা এই বিরাগে আমাদের চক্ষেতে একই দেহ-যষ্টির যে সকল রূপান্তর ঘটে, তার কথা বিজ্ঞান বা দর্শন জানে না, বুঝে না, বলিতে

পারে না। এ রূপান্তর ঘটায় আমাদের অন্তরের রঞ্জিনী বৃত্তি। এই রূপান্তরের সংবাদ বহন করিয়া থাকে, রস-সাহিত্য বা কল্প-সাহিত্য।

বর্ণবিজ্ঞান জগতের রং মহলে যাহা দেখে না, চিত্রকর তাহা দেখেন। শব্দ-বিজ্ঞান আকাশের শব্দভাণ্ডারে যাহা শুনিতে পায় না, গায়ক এবং সংগীতজ্ঞ তাহা শোনেন। দেহবিজ্ঞান বা অস্থিবিজ্ঞান জীবদেহের মধ্যে যে বস্তুর কোনও সন্ধান পায় না, চিত্রকর ও ভাস্কর তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহাতেই মজিয়া যান। জ্যোতির্ব্বিদ্ গ্রহনক্ষত্র-খচিত, শতরঞ্জিত গগনপটে যে ছবি দেখেন না, কবি তাহা দেখিয়া বিভোর ও বিহ্বল হইয়া যান। এইরূপভাবে, এ সকল ক্ষেত্রে, চিত্রকর, গায়ক, ভাস্কর, ও কবির অন্তরের প্রস্ফুটরঞ্জিনী বৃত্তি, বর্ণের, স্বরের, জীবদেহের কিম্বা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যাহা কেবল বাহ্য ও বাহিরের পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তাহাকে আপনার রসের রং'এ রঞ্জিত করিয়া, তার অদ্ভুত রূপান্তর ঘটাইয়া থাকেন। এই বস্তুকেই সাহিত্যের রূপান্তর বলিতে পারা যায়।

আমাদের দেশের প্রাচীনেরা পঞ্চকোষের কথা কহিয়াছেন। প্রথম অন্নময় কোষ। আমরা আজি কালি যাহাকে জড়বিজ্ঞান বলি, ইংরাজিতে যাহাকে physico-chemical group of the sciences বলিতে পারা যায়, এই অন্নময়-কোষেই তার অধিকার। এই কোষের প্রতিষ্ঠা আমাদের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়েতে। তার উপরে বা ভিতরে প্রাণময় কোষ। এই প্রাণময় কোষেই আধুনিক জীববিজ্ঞান —ইংরাজীতে যাহাকে biological group of the sciences বলে, তার অধিকার। এই কোষের প্রতিষ্ঠা আমাদের প্রাণানুভূতিতে। তারপর মনোময় কোষ, এই কোষের প্রতিষ্ঠা আমাদের মনোবৃত্তিতে; মনস্তত্ত্ব বা psychological group of the sciences'এর অধিকার এই কোষেতে। তার উপরে বা অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ। আমাদের অন্তরের যে বৃত্তির দ্বারা আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বহুত্বের মধ্যে একত্বের, অঙ্গের মধ্যে অঙ্গীর, অংশের মধ্যে অংশীর, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি, যে বৃত্তির দ্বারা, এক কথায়, আমরা যাবতীয় বিজ্ঞানাদি গড়িয়া তুলি, সেই বৃত্তিতে এই বিজ্ঞানময় কোষের প্রতিষ্ঠা। দর্শনের বা তত্ত্বজ্ঞানের meta-physics বা philosophyর অধিকার এই কোষে।

এই কোষ-চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্নময়-কোষ একান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। রূপরসশব্দস্পর্শাদি এই কোষের উপাদান। পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রা ও পঞ্চমহাভূতের উপরে এই কোষ প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে ধরিয়া এই অন্নময়কোষের জ্ঞানলাভ সম্ভব। এই জন্য কোষ-পঞ্চকের মধ্যে এই অন্নময় কোষ সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল। ইহা জীবের বহিরতম আবরণ।

তার পর প্রাণময় কোষ। প্রাণাবস্তুর প্রমাণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সত্য; কিন্তু ইন্দ্রিয়-গ্রাম এই প্রাণ যে আছে, কেবল তাহাই বলিতে পারে; এই প্রাণের স্বরূপ কি, তাহা বলিতে পারে না। এই প্রাণ বস্তু ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রথম সোপান-স্বরূপ হইয়া আছে। এই প্রাণের একদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাম ও অন্যদিকে মন। প্রাণের এক প্রান্তে senses আর অন্যপ্রান্তে psyche; একদিকে বিষয়াপেক্ষী দর্শনাদি ইন্দ্রিয়, অন্যদিকে এ সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মন। ইন্দ্রিয়কে ধরিয়া যেমন প্রাণের জগতে যাইয়া পড়ি, এই প্রাণকে ধরিয়া সেইরূপ মনোময় জগতে যাইয়া উপস্থিত হই। এই জন্যই এই প্রাণময়-কোষ, অন্নময়-কোষ ও মনোময়-কোষের মধ্যে সেতু-স্বরূপ হইয়া আছে।

তার পর মনোময় কোষ। এই মনোময়-কোষেই আমরা সর্ব্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের সাড়া পাই। ইন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা একদিকে অন্নেতে, অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রায় ও পঞ্চ-মহাভূতেতে; আর অন্যদিকে প্রাণেতে। ইন্দ্রিয়ের আশ্রিত অন্নময় জগৎ, ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় প্রাণ। ইন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা প্রাণে, প্রাণের প্রামাণ্য ইন্দ্রিয়ে। ইন্দ্রিয় যেমন বিষয় ছাড়া নহে, প্রাণ সেইরূপ ইন্দ্রিয় ছাড়া নহে। কিন্তু মনের মধ্যে বিষয়ের অবর্ত্তমানেও ইন্দ্রিয়-রসের প্রত্যক্ষ ও অনুভব হয়। মন অনুপস্থিতকে উপস্থিত, অবর্ত্তমানকে বর্ত্তমান, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ বলিয়া ধারণ করিতে পারে। এই জন্য মন ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্মৃতি বা আভাযমাত্র গ্রহণ করিয়া, আপনার মধ্যে বিবিধ বিষয়ের সৃষ্টি করিতে পারে। এই জন্যই, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠযোগে আবদ্ধ হইলেও, মনের এমন শক্তি আছে, যাহাতে ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ বিষয়কে সে আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারে এবং পূর্ব্ব-প্রত্যক্ষ বিবিধ ইন্দ্রিয়ানুভবকে মিলাইয়া মিশাইয়া, অভূতপূর্ব্ব বস্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। নৃশৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম এই সকলই এই জাতীয় মানস-সৃষ্টি। ইংরাজিতে এ সকলকে fancy creation বলা যায়।

এই জাতীয় মানস-সৃষ্টিতেও এক প্রকারের রূপান্তর হয় বটে, কিন্তু এখানে যে রূপান্তরের কথা হইতেছে, যে রূপান্তর রস-সাহিত্যের প্রাণ-স্বরূপ, ইহা সে জাতীয় রূপান্তর নহে। ফলতঃ ইহাকে রূপান্তর না বলিয়া রূপমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। কেহ কখনও মানুষের শিং দেখে নাই, তবে অন্য জন্তুর শিং দেখিয়াছে। সে সকল জন্তুতে যে শিং দেখা গিয়াছিল, সেই শিংকে মানুষের মাথায় আনিয়া বসাইয়া নৃশৃঙ্গের সৃষ্টি হই-য়াছে। মানুষ এবং শৃঙ্গ দুই, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বস্তু। নৃশৃঙ্গে এই দুই ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বস্তুর নিজের বিশিষ্টরূপের কোনও বিপর্য্যয় বা পরিবর্ত্তন ঘটে না। মানুষ মানুষই থাকিয়া যায়, আর শৃঙ্গও শৃঙ্গই থাকিয়া যায়, মানুষও বদলায় না, শৃঙ্গও বদলায় না। কেবল যাহা ভিন্নস্থানে, ভিন্ন সম্বন্ধে ছিল, তাহাকে এক করিয়া এই নৃ-শৃঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে।

আকাশ-কুসুম সম্বন্ধেও তাহাই ঘটে। আকাশও প্রত্যক্ষ বস্তু,কুসুমও প্রত্যক্ষ বস্তু। কিন্তু আকাশেতে কুসুম ফোটে না, গাছে বা লতাতেই ফোটে। আকাশ-কুসুমে আকাশে ও কুসুমের মধ্যে যে সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব। এই সম্বন্ধ দুইটি পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর মিলনে রচিত। এই সম্বন্ধ বাস্তব নহে, কল্পিত। এই সম্বন্ধেতে আকাশের আকাশত্ব বা কুসুমের কুসুমত্ব, দু'য়ের কোনটাই বদ্‌লাইয়া যায় না, অথচ একটা নূতন কল্পিত বস্তুর সৃষ্টি হয়। এই কারণে এখানে রূপান্তর শব্দের প্রয়োগ সত্য হইবে না।

যেমন মনোময়-কোষেতে সত্য রূপান্তর ঘটে না, সেইরূপ বিজ্ঞানময় কোষেও ঘটে না। মন ইন্দ্রিয়ানুভূতি লইয়াই কারবার করে। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয় লইয়াই মন আপনার যাবতীয় মানস-সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করে। বিজ্ঞান সেইরূপ অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে বিহার করে। বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন করিতে গেলে, এই বহুত্বের প্রত্যক্ষ রূপ-রসাদির বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করিয়া, এ সকলের মধ্যে ও অন্তরালে অপ্রত্যক্ষ তত্ত্ববস্তুর ধ্যান করিতে হয়। মনোময় কোষের আশ্রয়—রূপ; বিজ্ঞানময় কোষের আশ্রয়—স্বরূপ। রূপ বৈচিত্র্যের প্রকাশ করে। জগতের বহুত্ব রূপ লইয়া। অরূপই কেবল এই বৈচিত্র্য ও এই বহুত্বকে নিরস্ত করিয়া, নিরাকার ও শূন্যেতে বিশিষ্টতা ও বিচিত্রতা-পূর্ণ এই বিশ্বের একত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। বিজ্ঞান যে একত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার উপলব্ধি করিতে হইলে,সকল রূপকে নিরস্ত করিতে হয়। অথচ রূপকে রাখিয়াই কেবল রূপান্তর ঘটাইতে পারা যায়, রূপকে বিনাশ করিয়া নহে। কিন্তু একত্বে, নিরাকারে, নির্ব্বিশেষে, কোনও রূপের প্রতিষ্ঠা হয় না, হইতেই পারে না। একত্বে যখন রূপের প্রতিষ্ঠা হয়, তখনই সে এক বহু হয়। নিরাকারে যখন রূপের প্রকাশ হয়, তখনই তাহা সাকার হইয়া যায়। নির্ব্বিশেষে যখন বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তাহা আর নির্ব্বিশেষ থাকে না। অতএব রূপের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়া, বিজ্ঞানময়-জগতে, যেখানে কেবল সত্ত্বা বা Being মাত্র আছে, কিন্তু প্রকাশ বা Doing নাই, সেখানে রূপান্তর হয় না, হইতে পারে না।

কিন্তু এখানেও কবি-কল্পনা নানা প্রকারের রূপের সৃষ্টি করিতে গিয়াছে। বেদের পুরুষ সূক্তে তার প্রমাণ পাই।

"পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন।

"যাহা হইয়াছে, অথবা যাহা হইবেক, সকলি সেই পুরুষ। তিনি অমরত্ব লাভে অধিকারী হয়েন, কেন না, তিনি অন্ন দ্বারা অতিরোহণ করেন।

"তাহার এতাদৃশ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্বজীবসমূহ তাঁহার একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাঁহার তিন পাদ।

"পুরুষ আপনার তিন পাদ লইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহার চতুর্থ অংশ এই স্থানে রহিল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজনরহিত (চেতন ও অচেতন) তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন।

"তাঁহা হইতে বিরাট জন্মিলেন, এবং বিরাট হইতে সেই পুরুষ। তিনি জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পশ্চাভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন।"—ইত্যাদি।

এখানে কবি এক অদ্ভুত পুরুষ কল্পনা করিয়াছেন। নিরাকার, সত্তামাত্র জ্ঞেয়, পরম-তত্ত্ব কি বস্তু, ইহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ না হইলেও, সমাধি-প্রত্যক্ষ বটে। এই বিচিত্রতা-ময় জগতের মূলে যে একটা একত্ব আছে, ইহা আমরা বুঝি। এই একত্বের উপলব্ধি-লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে মন হইতে, চিন্তা হইতে, ধ্যান ও জ্ঞান হইতে, জগতের যাবতীয় রূপরসাদির বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, ও বহুত্বকে দূর করিয়া দিতে হয়। রূপের অনুভবের সঙ্গে এই একের অপরোক্ষ উপলব্ধি সম্ভব নহে। "নেতি" "নেতি" বলিয়া ব্যতিরেকী পন্থার অনুসরণেই এই একত্বের উপলব্ধি করিতে হয়। আর যখন অন্বয়ী-পন্থাতে ইহার অনুভব লাভ করিতে হয়, তখন—"এই সকল রূপের মধ্যে সেই অরূপ আছেন", "এই সকল বিচিত্রতার অন্তরালে সেই মহান্ এক রহিয়াছেন" এই ভাবে; অথবা "তাঁহারই দ্বারা এই সকল রূপের প্রকাশ হইতেছে," "তাঁহারই শক্তিতে ও জ্ঞানেতে বিশ্বের অশেষ বৈচিত্র্য স্থিতি করিতেছে,—এই রূপে তাঁহার চিন্তা বা ধ্যান করিতে হয়।

এইরূপ ধ্যানেতেও বস্তুর রূপান্তর হয় বটে। কিন্তু হয়,—বিজ্ঞানময় কোষে নহে, কিন্তু আনন্দময় কোষেতে। এই ধ্যান করিতে করিতে চিত্তে যে সকল ভাব উৎসারিত হয়, সেই ভাবের রং পড়িয়া তখন বিশ্বের রূপ বদ্‌লাইয়া যায়। তখন, সেই ভাবের অঞ্জনে রঞ্জিত-চক্ষু সাধক—

স্থাবর জঙ্গম দেখে,
দেখে না তারা মূর্ত্তি,
যাহা নেত্র পড়ে,
হয় ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি।

নিরাকারের সাধকের অধিকার মুখ্যতঃ বিজ্ঞানময় কোষে। কিন্তু যদিও কোষপঞ্চকে আনন্দময় কোষ বলিয়া একটা পৃথক্ কোষের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আনন্দবস্তুসকল কোষকে ছাইয়া, সকল কোষকে ছাপিয়া আছে। অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান—সকলই আনন্দময়। জড়ে, জীবে, মননে, চিন্তনে, ধ্যানে, আনন্দ সর্ব্বত্র উৎসারিত, সর্ব্বত্র উচ্ছ্বসিত। এই জন্য, নিরাকারের ধ্যানে যখন এই আনন্দরস উথলিয়া

উঠে, তখন নিরাকারেরও "আকার" বদ্‌লাইয়া যায়; "অরূপে"—রূপ ফুটিয়া উঠে। তখন—

সর্ব্বজীবে হয়,
ব্রহ্মভাবোদয়,
চিদানন্দ জেগে উঠে।

কিন্তু এইটি হয়, আনন্দ-রস প্রভাবে। সকল ক্ষেত্রেই এই আনন্দ-বস্তু বা রসবস্তু, আপনার রসান মাথাইয়া, বস্তুর রূপান্তর ঘটায়। এই রূপান্তরকেই সাহিত্যের রূপান্তর বলা যায়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দোস্‌রা নম্বর

হে আমার অতীতের স্বামিন্‌!

আমি চল্‌লুম। আমার খোঁজ করো না; কর্‌লেও খুঁজে পাবে না, তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী, তা জানি। তা জেনেও আমি তোমায় ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি। কেন যে তোমায় ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি, তা স্পষ্ট ক'রে আমি বল্‌তে পাচ্ছি না। এজন্য তুমি হয় ত আশ্চর্য্য হবে! তা হবে। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি নিজেই আশ্চর্য্য হচ্ছি। অথচ তোমারে ছেড়ে না গেলেই নয়।

তুমি হয় ত অনেক রকম ভাব্‌বে। কিন্তু তার বেশীর ভাগই ভুল ক'রে ভাব্‌বে। প্রথমে তুমি ভাব্‌বে যে, এমন কি গুরুতর পাপ তুমি করেছ, যার জন্যে কোথাও কিছুই নেই, আমি তোমার স্ত্রী, হঠাৎ তোমাকে এক মুহূর্ত্তে এমনি ক'রে ছেড়ে চ'লে গেলাম, এ তুমি যতই ভাব্‌বে, কিছুতেই স্থির ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বে না। কেন না, আমিই খুঁজে পাই না যে, কি বিশেষ কারণে আমি তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে, তোমাকে আমায় ছেড়ে যেতে হবেই।

আমি হিন্দুর মেয়ে, বাঙ্গালীর মেয়ে, তা জানি। স্বামীকে যে কোন দোষেই ছেড়ে চ'লে আসা যায় না, বাঙ্গালীর ঘরের কোন্‌ মেয়ে তা না জানে? আমিও তা জানি, কিন্তু জান্‌লেও আমি আজ তা মান্‌বো না। তা মান্‌তে গেলে তোমায় যে আমার ছেড়ে যাওয়া হয় না।

তুমি ক্লাব নিয়ে বাইরের বৈঠকখানায় পড়ে থাকৃতে, আর ভাব্‌তে বুঝি যে, আমি তোমাদের জন্য দিন-রাত রান্নাঘরে ব'সে মাছের কচুরী আর আমড়ার চাট্‌নীই তৈরী ক'চ্ছি। না গো না, ঐ রান্নাঘরের বদ্ধ ধোঁয়াটে কারাগারের ছোট্ট জানালাটির ভিতর দিয়েই একদিন হঠাৎ আমি বাহিরের পৃথিবীটাকে দেখে ফেলেছিলাম। বাহিরের পৃথিবীটা জানি না কেন,—আমাকে যেন সেই থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকৃত। বল্‌ত, আয়, আয়, বেরিয়ে আয়! আমি স্পষ্ট অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লাম যে, বাহিরে আসার প্রয়োজন আছে। সে দিন তালপত্র মাসিক কাগজের একটা গল্পেই আমি আমার এই নতুন অনুভূতির একটা সাড়াও পেয়েছিলাম। সেই গল্প পড়েই ত আমার মনের জোর এত বেড়ে গেল। বাহিরের পৃথিবী আমাকে চায়। আমি এত দিন এই বাহিরকে—এই পৃথিবীকে—এই অসীম বিশ্বকে বঞ্চিত ক'রে

ঘরের কোণে অন্ধকারে আরসুলা-মাকড়সার মত দিনগুজরান কচ্ছিলাম। না, তা হ'তে পারে না। কখনই না। স্ত্রীজাতিও মনুষ্যজাতি,—তাহাদেরও স্বাধীন ইচ্ছা আছে,—দায়িত্ব আছে—কর্ত্তব্য আছে। সে দায়িত্ব আর কর্ত্তব্য শুধু ঘরের কোণে কাঁদিয়া মরিবার জন্য নহে। এ আমি বেশ বুঝে ফেল্‌লুম। বাহিরের একটা টান আমার মনের মধ্যে দিনরাত আন্‌চান্ কর্‌তে লাগ্‌লো। আমি নিজের মধ্যে কত খুঁজেছি, তা তুমি কিছুই জান না। তুমি ভাব্‌তে বুঝি, আমি তোমার পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছি। কিন্তু হায়, যদি জান্‌তে—

তবে তাও বলি শুন,—ঐ ১লা নংএর বাড়ীর দিকে তাকিয়ে প্রথমে আমার বাহিরের পৃথিবীর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, আমি পৃথিবীর—আমি সকলের—আমি বিশ্বের। এই বিশ্বের হাটে আমি একবার নিজেকে আগে যাচাই করিব। আমি ঝুটা কি সাচ্চা, তার ত পরখ হওয়া চাই? তবু যদি,—না,—তা হবে কেন—? ১লা নম্বর আমার কে? আমি আপনি আপন ইচ্ছাতেই বেরিয়ে যাচ্ছি।

তুমি এবং তোমার আর দশজন ইয়ার-বন্ধু, হয় ত আমাকে অসতী পর্য্যন্ত বল্‌তে সঙ্কোচ বোধ কর্‌বে না। কিন্তু সে দিন 'আন্তরিক বাণী' মাসিক পত্রের একটা সমালোচনায় সতীত্বের যে নূতন আদর্শের কথা পড়েছি, তাতে এ আর কি? এ ত—কিছুই না। পর-পুরুষের পায়ে লুটিয়ে পড়েও, স্ত্রীর সতীত্ব যায় না,—তা জান? তুমি হয় ত সে সমালোচনাটা পড় নাই? আমার দেরাজের ড্রয়ারের ভিতরে সে মাসিক পত্রটা আছে; খুঁজে বের ক'রে পড়ো, বুঝ্‌তে পার্‌বে। আর তাতেও যদি বুঝ্‌তে না পার, তবে বুঝ্‌তে হবে, তোমার বোঝার ক্ষমতার চেয়ে না বুঝ্‌বার ক্ষমতা ঢের বেশী। কাজেই বোঝ্‌বার আর বেশী চেষ্টা করো না। কেন না, তখন থেকে আমার যা কিছু হবে, তা বোঝা বাস্তবিক শক্ত।

তোমার অতীতের স্ত্রী—

শ্রীঅনিলা দেবী।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

নারায়ণ

মাসিক পত্র।

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা,

ভাদ্র, ১৩২৪ সাল

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা ...	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৭৩১
২।	নিধুগুপ্ত	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়	৭৪১
৩।	ভক্তিহীনা (কবিতা) ...	শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	৭৫৩
৪।	স্বামী	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭৫৫
৫।	জয়দেব (কবিতা) ...	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৭৮০
৬।	বঙ্গভাষা ও বাংলাভাষা ...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৭৮১
৭।	বুদ্ধিমানের কর্ম্ম ...	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	৭৮৯
৮।	কমলের দুঃখ ..	শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৮০৪
৯।	গান (কবিতা) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৮১৪

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"বসুমতী" প্রেসে—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা] [ভাদ্র ১৩২৪

মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা

আপনারা আমায় এখানকার বার্ষিক অধিবেশনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইহাতে আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি। এই সকল কাজে দুই প্রকার লোকের নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে; এক হোমরা-চোমরা লোক—হয় লাটসাহেব, না হয়, লাট-কাউন্সিলের মেম্বর, নিতান্ত না হয়, হাইকোর্টের জজ, কেননা, তাহা হইলে খুব সোর-গোল হয়, এবং অনেক জায়গায় তাহাই উদ্দেশ্য; আর এক বক্তা—যাঁহারা দাঁড়াইয়া উঠিয়াই, মুখ খুলিয়াই, লোকজনকে ইচ্ছামত হাসাইতে পারেন, কাঁদাইতে পারেন,—কেননা, তাহা হইলেও থিয়েটার দেখানর কাজটা হয়। আমার মত গরীব ব্রাহ্মণকে এরূপ স্থলে আনা, আমারও বিড়ম্বনা, আর যাঁহারা আনেন, তাঁদেরও বিড়ম্বনা। এ সকল কথা আমি আপনাদের মুরুব্বিপক্ষকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু যখন দেখিলাম, আপনারা আমার জন্য দুইবার দিন বদল করিলেন, তখন ভাবিলাম, না আসাটা নিতান্ত গোস্তাগি হইবে। আসিয়াছি—কিন্তু আমার কথা আপনাদের মনঃপূত হইবে কিনা বলিতে পারি না।

তাহার পর যখন আসিতেছি,—একটা কিছু বলিতে হইবে; কি বলিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, আপনারা গ্রামোফনের বক্তৃতা চান্—একজন বক্তৃতা লিখিয়া দিবে, রেকর্ড করিয়া দিবে, আর আমি সেই রেকর্ডখানি হাতে করিয়া আনিয়া গ্রামো-ফনে চড়াইয়া, চাবিটি ঘুরাইয়া দিয়া বসিয়া থাকিব, এরূপ গ্রামোফনের বক্তৃতা

করা আমার অভ্যাস নাই; আপনারা ইহা চাহিয়া থাকেন, আপনাদের আশা পূর্ণ হইবে না।

আপনারা যদি ফাঁকা দেওড়া চান্, শব্দের ঘটা, অলঙ্কারের ছটা, জলদগম্ভীর বক্তৃতা চান্,আমার দিয়া তাহা হইয়া উঠিবে না। আমি মাতৃভাষায় কথা কই; অতি শিশুকালে বাপ মা যে কথাগুলি শিখাইয়াছেন, সেই কথাগুলিই আমার মুখে আইসে, কলমে বাহির হয়। সংস্কৃতে পোরা সাধুভাষা আর সেই ভাষায় ইংরেজীভাবে ইংরেজী ইডিয়মের তর্জ্জমা দিয়া একটা জাঁকালো বক্তৃতা করিতে পারিব না। আর আপনারা যদি খুব গোলাগুলি চান্, অনেক বড় বড় লোকের কোটেসান চান্, বৈজ্ঞানিকরীতিতে ইতিহাস চান্, আমার মতের যাহারা বিরুদ্ধবাদী, তাহাদের উপর খুব গালিবর্ষণ চান্, তাহাও আমার দ্বারা হইয়া উঠিবে না, কারণ, আমি আর এই শেষবয়সে নূতন ধরণের নূতন রীতিতে লেখা শিখিয়া উঠিতে পারিব না।

তাহার পর আপনারা দুই বৎসর ধরিয়া কি ভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, তাহা বিশেষ করিয়া জানি না। আপনারা কি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস চান্? আলোআল কবি, পরাগলি মহাভারত, ছুটিখাঁর অশ্বমেধের কথা শুনিতে চান্,না বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, লোচনদাস, বাসুঘোষ, মাধব ঘোষ, গোবিন্দদাস, রামচন্দ্রদাসের কীর্ত্তন শুনিতে চান্? গোস্বামীমতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস প্রভৃতির লেখা চৈতন্যচরিত শুনিতে চান্, না গোস্বামীমতের বিরুদ্ধ চূড়ামণি দাস বা জয়ানন্দ দাসের চৈতন্যচরিত শুনিতে চান্? আপনারা হিন্দুর গান শুনিতে চান্, কর্ত্তাভজার গান শুনিতে চান্, শ্যামাবিষয় শুনিতে চান্, না বৌদ্ধদিগের গীতি, গাথা ও ছড়া শুনিতে চান্? আপনারা আধুনিক সাহিত্য চান্, না প্রাচীন সাহিত্য চান্, না প্রাচীনতম সাহিত্য চান্? আপনারা দর্শন শুনিতে চান্, না বিজ্ঞান শুনিতে চান্, না ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা শুনিতে চান্, না সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, মাধ্যমিক, যোগাচার শুনিতে চান্, না শ্বেতাম্বর আর্হত দর্শন শুনিতে চান্, না দিগম্বর আর্হত শুনিতে চান্? লাকুলিশ মত শুনিতে চান্, না পাশুমত মত শুনিতে চান্, না স্পন্দ শাস্ত্র শুনিতে চান্, না প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্র শুনিতে চান্? বিষ্ণুস্বামীর মত শুনিতে চান্, না রামানুজের মত শুনিতে চান্, না মাধ্বাচার্য্যের মত শুনিতে চান্, না নিম্বাদিত্যের মত শুনিতে চান্, বল্লভের মত শুনিতে চান্, না চৈতন্যের মত শুনিতে চান্? গোস্বামীদের মত শুনিতে চান্, না তন্ত্রের মত শুনিতে চান্? ত্রিক-পূজা শুনিতে চান্, না কুব্জিকামত শুনিতে চান্? ডাকের তন্ত্র শুনিতে চান্, না চণ্ড মহারোষণের তন্ত্র শুনিতে চান্? হেরুকের মত শুনিতে চান্, না হেবজ্র মত শুনিতে চান্? কাদিমত হাদিমত বা কহাদিমত চান্? বিজ্ঞানে আপনারা

কি চান্? প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোষ্ঠাস্তর শুনিতে চান্ বা নরকঙ্কাল দেখিতে চান্? কিছুই না বুঝিতে পারিয়া খানিকটা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিলাম, এমন সময়ে শুনিলাম, আপনারা মেদিনীপুরের ইতিহাস শুনিতে চান্।

আপনাদের সম্পাদক শ্রীমান্ মনষীনাথ বসু মহাশয় আমায় লিখিয়াছেন যে, আপনারা মেদিনীপুরের ইতিহাস শুনিতে চান্। তাঁহার ঐরূপ লেখায় আমি গোলে পড়িয়াছি। কারণ, মেদিনীপুরের ইতিহাস যতদূর জানা যায়, সবই ত বেঙ্গলডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের ২৬শ ভলুমে দেওয়া আছে। যিনি এই গেজেটিয়ার লিখিয়াছেন, তিনি একজন পাকা লোক, বহুকাল ইতিহাসের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন এবং বাঙ্গালার সমস্ত জেলারই ইতিহাস লিখিয়াছেন। তিনি মেদিনীপুরের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহার উপর কিছু বলা একপ্রকার অসম্ভব। তাই আমি ইতিহাস লেখার ব্যাপারটা ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম। কিন্তু একজন প্রধান ছাত্রের অনুরোধ রাখিতে না পারাও দোষ। তাই ভাবিতেছিলাম, কোনরূপ যদি নূতন কথা কিছু বলা যায়। শেষ স্থির করিলাম, চেষ্টাতো করা যাক, তাহাতে যতদূর হয়। আমার মনে হইল, সংস্কৃতে কতগুলি পুঁথি আছে, তাহাতে নানাদেশের কথা পাওয়া যায়; সেও একপ্রকার গেজেটিয়ার; যদি সেগুলি হইতে কিছু সংগ্রহ করিতে পারি।

আপনারা সকলেই জানেন যে, এ জেলার মধ্যে তাম্রলিপ্তি বা তমলুক সকলের অপেক্ষা প্রাচীন; মেদিনীপুর সদর হইলেও তত প্রাচীন নয়। প্রায় ২২০০ বৎসর পূর্ব্বে অশোকরাজার ছেলে ও মেয়ে যখন "বোধিদ্রুমে"র ডাল লইয়া সিংহলে যান, তখন তাঁহারা তমলুকেই জাহাজে উঠেন। ইহার পূর্ব্বে তমলুকের নাম পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেবের জাতকগুলিতে সমুদ্র-যাত্রার অনেক খবর থাকিলেও, তাহাতে তমলুকের নাম নাই। সেকালের জাহাজ যেন ভড়োচ দিয়াই যাইত; ভড়োচ ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে। কিন্তু তাই বলিয়া তখন যে তমলুক ছিল না, এ কথা বলা যায় না। কারণ, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য যে অর্থশাস্ত্রের পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়। আর, দশকুমার-চরিতেও তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, দশকুমার-চরিত খ্রীষ্টের ছয়শত বৎসর পরের লেখা। কিন্তু আমি মনে করি, খ্রীষ্টের দুইশত বৎসর পূর্ব্বের লেখা। যখনকারই লেখা হউক, উহাতে তাম্রলিপ্তির নাম দামলিপ্তি। তাম্রলিপ্তি শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে, এইখান হইতে অনেক তাঁবা রপ্তানি হইত; তাহা তাঁবার লেপ বলিয়া, উহার নাম হইয়াছে তাম্রলিপ্তি। কথাটা কিন্তু মনে ধরে না। তাম্রলিপ্তি দামলিপ্তির সংস্কৃত হওয়াই সম্ভব। দামলিপ্তি সুহ্ম দেশের নগর। দামলিপ্তি শব্দের অর্থ দামল জাতির নগর, অর্থাৎ তামিল জাতির নগর। চন্দ্রগুপ্তেরও বহুপূর্ব্বে তামিলেরা যে বঙ্গদেশে বাস করিত, তাহার প্রমাণ

আছে; উহারা আমাদের চেয়ে নৌকা-যাত্রায় পটু ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং দামলিপ্তি হইতে তাম্রলিপ্তি হওয়াই সম্ভব; যদি হয়, তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্তেরও বহুপূর্ব্বে তমলুক একটি বড় বন্দর ছিল।

ততকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত তমলুক সহর আছে এবং একটি বাণিজ্যের জায়গাও বটে। কিন্তু এখন সেখান হইতে সমুদ্রে যাওয়া যায় না। ওমেলি সাহেব বলেন যে, ইৎসিয়াং ও হয়্‌লুংএর পর তাম্রলিপ্তের নাম আর পাওয়া যায় না; অর্থাৎ খ্রীষ্টের পর ৭০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত মাত্র উহার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু পেগুদেশে কল্যাণীগ্রামে যে শিলালিপি আছে, তাহাতে বলে যে, খ্রীষ্টের পর বারশ, এমন কি, তেরশ বৎসর পরেও তাম্রলিপ্তি হইতে বৌদ্ধভিক্ষুগণ পেগুতে যাইয়া তথায় ধর্ম্মসংস্কার করেন। তমলুকের সামনে চড়া পড়িয়া যাওয়ায় ক্রমে এখান হইতে সমুদ্র-যাত্রা বন্ধ হয়। খ্রীষ্টের পর চৌদ্দশ পনরশ বৎসরের যে সকল মনসার ও চণ্ডীর গান পাওয়া যায়, তাহাতে তমলুকের নাম নাই। সেকালের লোকে পিছলদা ও ছত্রভোগ হইয়া সমুদ্রে যাইত। বৈষ্ণবদের পুঁথিতেও ঐ কথা শুনা যায়।

তমলুক বাঙ্গালার প্রধান বন্দর না থাকিলেও, উহা যে একটি প্রধান নগর ও বাণিজ্যের স্থান ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আইন-ই-আক্‌বরীর সরকার ও মহলবিভাগে উহার নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু পাট্‌নার জায়গীরদার বা সুবাদার বিজ্জল চৌহানের আজ্ঞায় জগমোহন পণ্ডিত যে 'দেশাবলী-বিবৃতি' নামে পুঁথি লিখেন, তাহাতে দেখা যায়, আদিগঙ্গার পশ্চিমে সমস্ত দেশকেই তমলুক দেশ বলিত। বেহালা, বঁড়িশা, মহিষাদল, মণ্ডলঘাট, এ সমস্তই তমলুক দেশ। জগমোহন পণ্ডিত খ্রীঃ অঃ ১৬৪৮এর কিছু পূর্ব্বে এই পুঁথিখানি লিখেন। তাহার পর আর একখানি পুঁথিতে আছে:—

"মণ্ডলঘট্টদক্ষিণে চ হৈজলস্য চ স্থান্তরে।
তাম্রলিপ্তো হি দেশশ্চ বণিজাং চ নিবাসভূঃ॥ ৪৮॥
দ্বাদশযোজনৈর্যুক্তরূপানস্থাঃ সমীপতঃ।
মৎস্যা গব্যানি যত্রৈব সম্পশ্যন্তে ভৃশং নৃপঃ॥ ৪৯॥
কেচিদামলকো দেশং গায়ন্তি দেশবাসিনঃ।
লবণানামাকরশ্চ যত্র তিষ্ঠতি ভূরিশঃ॥ ৫০॥
প্রণালী দ্বিত্রিকা তত্র সদা বহতি ভূমিপ।
মালংগানাং মনুষ্যাণাং নীচানাং বসতিঃ কিল॥ ৫১॥
প্রায়ঃ সমুদ্রবেগশ্চ তাম্রলিপ্তনদীষু চ।
দিবানিশং কদাচিন্ন বিশ্রাম্যতি মহীপতে॥ ৫২॥"

তমলুক অঞ্চলে নুণের কারবার সেকালে কিরূপ ছিল, ঐ পুথিতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

"বিশাখিলাখ্যবিষয়াদাদিগুপ্তির্মহীপতিঃ।
সর্ব্বেষাং বণিজাং মধ্যে ধনধান্যাধিকো মতঃ॥ ৮৯৭॥
নদীপোতং সমারুহ্য লবণক্রয়হেতবে।
ঔৎকলোদধিকূলে চ মালরংগিকদেশতঃ॥ ৮৯৮॥
গতবানাদিগুপ্তিশ্চ পঞ্চপোতসমন্বিতঃ।
দেশব্যবহারমালোক্য সদাশ্চর্য্যসমন্বিতঃ॥ ৮৯৯॥
বরাটিকাকরং তত্র শুল্কং বরাটকাদিকম্।
তালপত্রে চ লিখনং বিপরীতং ভিন্নভিন্নকম্॥ ৯০০॥
দ্বিপোতং লবণানাং চ পূরিতং মালরংগিকে।
ভাস্কর্‌ভূমের্হি বণিজা লাদত্তেন সমং খলু॥ ৯০১॥
বিহারিদত্তস্য পুত্রেণ তাম্রলিপ্তাংতরস্য চ।
মিত্রতা চাদিগুপ্তেন জাতা হি লবণিকেন চ॥ ৯০২॥
আলাদত্তেন চোক্তং চ হ্যাদিগুপ্তে শৃণুষ্ব তৎ।
যেন সপ্তগুণা লাভাঃ তং বদামি হিতং তব॥ ৯০৩॥
মালবর্ণিকদেশাচ্চ দ্বাবিংশযোজনাত্যয়ে।
পাংগাভূমিমধ্যভাগে লবণং বহু জায়তে॥ ৯০৪॥
ময়া সহ প্রগন্তব্যং বাণিজ্যং যদি রোচতে।
আলাদত্তবচঃ শ্রুত্বা চাদিগুপ্তির্বণিক্‌পতিঃ॥ ৯০৫॥
নৌকামারুহ্য গতবান্ তেন সাকং জগাম হ।
গত্বা তত্র পাংগাভূমৌ একয়া মুদ্রয়া নৃপ॥ ৯০৬॥
ভারদ্বয়পরিমিতং লবণং নাভিপূরিতম্।
নাগপুরং চ গতবান্ তুঙ্গানস্যাশ্চ স্রোতসি॥ ৯০৭॥
মুদ্রৈকামূল্যলবণৈরেকবিংশতিমুদ্রকান্।
কৃত্বা চাদিগুপ্তিবণিক্ ধনাদিপূরিতপ্লবঃ॥ ৯০৮॥
দদ্ধারকেঽপি নদীতীরে গতবান্ নাগপুরতঃ।
কদলিপাতাসংজ্ঞকঞ্চ গ্রামং গত্বা বণিগ্‌বরঃ॥ ৯০৯॥"

এই পুস্তকের মতে ব্রহ্মশাপেই তাম্রলিপ্তের অধঃপতন হয়। এখানে গোপীচন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছত্রেশ্বরী দেবীর সম্মুখে ক্রোধে এক ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। সেই অবধি ছত্রেশ্বরী অধোমুখী হইয়া থাকেন। কিছুদিন পরে

রাজা গোপীচন্দ্র পাংগাভূমিতে গিয়া গঙ্গাসাগরপ্রান্তে মংতেশ্বরের কাছে সপরিবারে জলে ডুবিয়া যান। সেই সময়ে কাঁথির পশ্চিমে কাঁকড়দেশের কৈবর্ত্তরাজা, হাজার কৈবর্ত্ত সেনা সঙ্গে লইয়া তিন দিন রাজধানী লুঠ করেন এবং পুড়াইয়া দিয়া যান। ব্রহ্মশাপে তাম্রলিপ্তের অধঃপতন সম্বন্ধে ঐ পুথিতে আরও একটি গল্প আছে।

"দেবদত্তাদয়ঃ প্রায়া ভাগ্যবন্তো হি তত্র বৈ।
তাম্রলিপ্তে মহীপত্বং প্রাপুর্ভীমাপ্রসাদতঃ॥ ৭৪॥
দেবীদত্তস্য পুত্রোঽভূদ্ধনদত্তো মহীপতিঃ।
দশকোটিপতির্ভূত্বা ননন্দ তাম্রলিপ্তকে॥ ৭৫॥
ধনদত্তস্ত ভার্য্যায়াং শিবাখ্যাং তাম্রলিপ্তকে।
জাতঃ কুলিশদত্তস্ত ত্রীন্ দেশান্ স প্রশশাস হ॥ ৭৬॥
হলংদিদেশং স্বর্ণরেখাতটিনীপার্শ্বতো নৃপ।
কলিভূমিং মহীপালশাসনং কৃতবান্ স চ॥ ৭৭॥
যমবাই-তটিনীপার্শ্বে বালিশগ্রাম এব হি॥ ৭৮॥
কাসজোষশ্চ দেশশ্চ পালিতস্তেন ভূভৃতা॥ ৭৯॥
কুলিশদত্তস্ত বংশেষু একত্রিংশচ্চ পুরুষাঃ।
তাম্রলিপ্তং চ ভুক্ত্বা হি জগ্মুস্তে যমমন্দিরম্॥ ৮০॥
ততঃপরং চিত্রগুপ্তবংশে পরশুধারাখ্যসংজ্ঞকম্।
জাতঃ কায়স্থকুলে মতিমান্ চারুবিদ্যাবিশারদঃ॥ ৮১॥
কাসজোষাদিদেশাংশ্চ পরশুধারো মহীপতিঃ।
শাসনং সংযতশ্চক্রে তাম্রলিপ্তিস্থিতঃ স চ॥ ৮২॥"

এই পরশুধার নামে কায়স্থ রাজা তাম্রলিপ্তে অনেক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি সমস্থল হইতে অনেক যাজ্ঞিকব্রাহ্মণ আনাইয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলেন। অনেক যজ্ঞডুম্বুরের শাখাচ্ছেদ করাইয়াছিলেন। ভীমাদেবী তাঁহার উপর সর্ব্বদা প্রসন্ন ছিলেন। তিনি যজ্ঞ করিতেছেন, এমন সময়ে কৌশিকী নদীর তীরস্থ মাতবপুর হইতে একজন কন্যাদায়গ্রস্ত সনাঢ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আসিয়াই তাঁহাকে কন্যাদায় জানাইয়া লক্ষমুদ্রা প্রার্থনা করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন; বলিলেন :—

"কন্যানাং চ সুখেনৈব ত্বয়া চোৎপাদনং কৃতম্।
তাসাং বিবাহে লক্ষমুদ্রাঃ কথং দাস্যাম্যহং দ্বিজ॥"

ব্রাহ্মণ, ইহার পরও পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে, রাজা মহাশয় তাঁহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া দেশ হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন :—

"অন্ত প্রভৃতি তাম্রলিপ্তে সমুদ্রো হি মমাজ্ঞয়া।
মধ্যে মধ্যে স্রোতসা চ পূরয়িষ্যতি ভূমিকাম্ ॥ ৯৭ ॥
শস্যহীনা বসুমতী ভবিষ্যতি হি দুর্মতে।
ক্ষারভূমিঃ ক্রিয়াহীনা নরাণাং শ্রীপদপ্রদা ॥ ৯৮ ॥
বিবৃদ্ধশ্বয়থুর্নিত্যং মুষ্কবদ্ধং চ তে গলে।
মহান্ হ্রস্বশ্চ পংক্তিশ্চ সর্ব্বজন্তুষু জায়তে ॥ ৯৯ ॥
স্কন্ধাবারং রূপা চেয়ং কুভৃপস্য সরিদ্বরা।
ভঞ্জনং নাগপঞ্চম্যাং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১০০ ॥
কলের্ব্বর্ষাণি যাস্যন্তি সহস্রাণি চ বৈ যদা।
বেদাসংখ্যকানি বাণসংখ্যকানি শতানি চ ॥ ১০১ ॥
তদা ম্লেচ্ছমুখা দেশে তাম্রলিপ্তে হি ভাবিনঃ ॥
তব বংশা হি নির্ব্বংশা ভবিষ্যন্তি তদা খলু ॥ ১০২ ॥
ভীমাদেবী তদৈবাপি নিজধাম গমিষ্যতি।
অর্থহীনা বলৈর্হীনা ভাবিনো মানবাঃ সদা ॥ ১০৩ ॥"

এইবার মেদিনীপুরের কথা বলি। আইন-ই-আক্‌বরীতে মেদিনীপুর একটি মহলের নাম আছে। উহা সরকার জলেশ্বরের অন্তর্গত ছিল। উহাতে দুইটি কেল্লা ছিল; একটি পুরাতন, আর একটি নূতন। ইহার পূর্ব্বে মেদিনীপুরের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবগ্রন্থেও মেদিনীপুরের নাম নাই। আমরা পুরাণপুঁথিতে উহার আদি পাইয়াছি। কথাটি বিশ্বাসযোগ্য কি না, শুনুন, পরে বিচার করিবেন। রাজা চন্দ্রদীপ্তি হিমালয় হইতে ওড্রদেশে যাইতেছিলেন; তিনি পথের মধ্যে আলমোড়া, শরপুর, উত্তরকোশলা, অযোধ্যা, প্রতিষ্ঠানপুর (এলাহাবাদ), বিন্ধ্যাচল, পৌণ্ড্রদেশ, কুশাবতী, কীকট, পঞ্চকোট, ছত্রভূমি, রাজহাট, মল্লদেশ, বকদ্বীপ, বেতগাঁও, চন্দ্রকোণা ছাড়াইয়া গাণ্ডিচা দেশ পাইলেন। গাণ্ডিচা দেশেই আমনপুর কায়স্থের বাস।

"আমনপুরঞ্চ তত্রৈব কায়স্থানাং সুখাস্পদম্।
শালিধান্যস্য চোৎপাদো গাণ্ডিচাদেশে প্রজায়তে ॥ ১৫২ ॥
কৃষকাণাং ভূরিবাসো যত্র নাস্তি চ কাননম্।
প্রাণকরাখ্যো নৃপতির্গাণ্ডিচাদেশশাসকঃ ॥ ১৫৩ ॥
মেদিনীকোষকারশ্চ যস্য পুত্রো মহানভূৎ।
বিহায় গাণ্ডিচাদেশং মেদিনীপুরং জগাম সঃ ॥ ১৫৪ ॥"

মেদিনীকর নিজেও বলিয়াছেন যে, তিনি প্রাণকরের পুত্র। তিনি যে সকল পুথির

অনুসরণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিশ্বপ্রকাশকোষের নাম আছে। আমরা জানি, বিশ্বপ্রকাশকোষ ১১১১ খ্রীঃ অঃ লেখা হয়। সুতরাং মেদিনীকর ১১১১ খ্রীঃ অঃ পরেই হইবেন। খ্রীঃ ১৪৩১ সালে বৃহস্পতি মতিলাল নামে একজন রাঢ়িশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ রাজা গণেশ ও তাঁহার মুসলমান পুত্রগণের রাজসভায় থাকিয়া অমরকোষের এক টীকা লিখেন। এই টীকায় তিনি মেদিনীকোষ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন; সুতরাং ১১১১ হইতে ১৪৩১ এর মধ্যে তাঁহার সময়। ইহার মধ্য হইতেও আবার কিছু কম করা যাইতে পারে। কারণ, মেদিনীকর হলায়ুধ ও গোবর্দ্ধন এই দুই জন পণ্ডিতের নাম করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ ছিলেন এবং খ্রীঃ ১২০০ বৎসরের কিছু পূর্ব্বে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ১২০০—১৪৩১ এর মধ্যে মেদিনীকরের সময় ধরিলে বিশেষ হানি হয় না। তিনিই যদি নিজ নামে মেদিনীপুর স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে খ্রীঃ ১৩শ বা ১৪শতকে মেদিনীপুর সহর বসিয়াছিল বলা যাইতে পারে।

পিতা গাণ্ডিচা দেশে রাজত্ব করিতেন, পুত্র মেদিনীকর রাজ্যের সীমা বাড়াইয়া গাণ্ডিচা দেশের পাশেই নিজ নামে মেদিনীপুর নাম দিয়া সহর বসান—ইহা অনায়াসেই মনে করা যাইতে পারে।

উইলসন সাহেব বলিয়াছেন, করেরা কায়স্থ। সোমনাথ পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছেন, বৈদ্যও হইতে পারে। কিন্তু করেরা বৌদ্ধও হইতে পারে। কারণ, নিধান কর নামে একজন বৌদ্ধ একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। বৈদ্যদিগের মধ্যে করবংশ নিকৃষ্ট। সম্প্রতি বেহার রিসার্চ্চ সোসাইটীর জার্ণালে করবংশের একখানি তাম্রলিপি বাহির হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, করেরা এক সময়ে ভুবনেশ্বর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। কেশরি, গয়াড়, উন্মট্ট প্রভৃতি বংশ ধ্বংস হইয়া গেলে করবংশ রাজত্ব লাভ করেন। পরে গঙ্গদের হাতে করবংশের নাশ হয়; তাঁহার সময় খ্রীঃ অঃ ১১০০ এর কাছাকাছি হইবে। মূলবংশ ধ্বংস হইলে তাহার কোন শাখা উত্তরাঞ্চলে আসিয়া রাজত্ব করা সম্ভব। এ সকল কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মেদিনীপুরের বড়ই গৌরব। অন্য অন্য নগরে গ্রন্থকারের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের গৌরব হয়। কিন্তু মেদিনীপুর গ্রন্থকর্ত্তারই স্থাপিত, আবার সে গ্রন্থকর্ত্তা যেমন তেমন গ্রন্থ-কর্ত্তা নন; তাঁহার গ্রন্থ অমরকোষের ন্যায় প্রামাণিক ও সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তিনি নিজেই বলিতেছেন, তিনি আরও একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম আরও ছড়াইয়া পড়ে; তাহার নাম ষট্‌শতগাথাকোষ। এখানি অভিধান নহে, কাব্য-সংগ্রহ।

সেকালে মেদিনীপুর জেলার অনেকটা লইয়া ভানদেশ হইয়াছিল।

কংসবত্যা হি সরিতঃ শিলাবত্যা হি ভূমিতঃ।
উভয়োর্মধ্যবর্ত্তী চ ভানকো বিশ্রুতো ভুবি ॥ ১ ॥
বকদ্বীপাৎ পূর্ব্বভাগে মণ্ডলঘট্টস্য পশ্চিমে।
ত্রয়োদশযোজনৈশ্চ মিতো হি ভানদেশকঃ ॥ ২ ॥
কেচিদ্‌বদন্তি ভূপাল ভানকং ক্ষৌমভূমিকম্‌।
কদলীপট্টসূত্রাণামাকরো হি স্থলে স্থলে ॥ ৩ ॥
পট্টসূত্রস্য জননাৎ ক্ষৌমভূমিশ্চ বিশ্রুতা।
ধীবরাণাঞ্চ নিবাসো বর্ত্ততে যত্র ভূরিশঃ ॥ ৪ ॥
মধ্যদেশিব্রাহ্মণানাং বসতিরেব পুরা কৃতা।
বল্লালসেনেন ভূপাল রাজাদিশূরসূনুনা ॥ ৫ ॥
অকুলীনকুলীনত্বং ব্রাহ্মণানাং বিভাগশঃ।
স্থানং ত্রিষু হি দেশেষু কৃতং বৈ নৃপসূনুনা ॥ ৬ ॥

ভানদেশে মধ্যদেশী ব্রাহ্মণদিগের নিবাস। এই পুথিতে বলে, বল্লালসেন মধ্যদেশী ব্রাহ্মণদিগের এই স্থানে বাস করাইয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, রাঢ়ি, বারেন্দ্র, বৈদিক ভিন্ন অনেক ব্রাহ্মণ বল্লালের পূর্ব্বেও মধ্যদেশ হইতে আসিয়া দক্ষিণ-রাঢ়ে ও উড়িষ্যায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ইঁহারাই আমাদের মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ। মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণের আদিবৃত্তান্ত লইয়া অনেকরূপ কল্পনা-জল্পনা শুনা যায়, সে সব ঠিক নয়। রাঢ়িশ্রেণীদের সঙ্গে ইঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। রাঢ়ে ও বরেন্দ্রে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরা বসতি করার পর মধ্যদেশ হইতে আসিয়া যে সকল ব্রাহ্মণ এ দেশে বাস করেন, তাম্রপট্টে ও শিলালিপিতে ইঁহাদিগকে "মধ্যদেশবিনির্গত" লেখা আছে। একঘর মধ্যদেশী ব্রাহ্মণ সিদ্ধল গ্রামে বাস করেন; তাঁহারা যজুর্ব্বেদী ছিলেন, অথচ, সিদ্ধলগ্রামী রাঢ়ীরা সামবেদী। এই "মধ্যদেশবিনির্গত" ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্ববঙ্গের রাজা ভোজবর্ম্মার নিকট অনেক জমিজমা পাইয়াছিলেন।

ভানদেশে তিনটি সুন্দর নগর ছিল :—একটির নাম চন্দ্রকোণা, ইহার চারিদিকে বাঁশের বন ছিল; একটির নাম বলিয়ার, তাহার চারিদিকে নারিকেলগাছ; আর একটির নাম ভূরিশ্রেষ্ঠী, ইহা এখন মেদিনীপুর জেলায় নাই, হুগলী জেলায় গিয়াছে।

ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রামে অনেক সজ্জনের বাস ছিল। কিন্তু বুনা মহিষের বড়ই উপদ্রব ছিল। এখন ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভুরসুট মেদিনীপুর জেলায় না থাকিলেও, এখানে দুই চারি কথা তাহার সম্বন্ধে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এককালে ইহা দক্ষিণ-রাঢ়ের রাজধানী ছিল। ৯১৩ শাকে ভুরসুটে পাণ্ডুদাস নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে শ্রীধর পণ্ডিত বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদভাষ্যের এক টীকা

লিখেন; টীকার নাম স্তায়কন্দলী। উহা এখনও বৈশেষিক দর্শনের একখানি প্রধান পুস্তক বলিয়া গণ্য। খ্রীঃ ১০৯২ সালে যখন কৃষ্ণমিশ্র চণ্ডেসরাজের প্রধান সেনাপতি গোপাল রায়ের অভ্যর্থনার জন্য নাটক লিখেন, তখন ভূরিশ্রেষ্ঠে নানাশাস্ত্রের আলোচনা ছিল; সেখানকার ব্রাহ্মণেরা কুমারিলের মত মানিতেন না; প্রভাকর-মতের শালিকনাথী পুথি পাঠ করিতেন; এবং আপনাদিগকে অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। বাংলার মহাকবি ভারতচন্দ্রও এই ভূরিশ্রেষ্ঠে জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ভূরিশ্রেষ্ঠের আর সে দিন নাই। এখন তামাকের জন্যই লোকে ভূরসুটের নাম করে।

মেদিনীপুর জেলার এবং হাবড়া ও হুগলী জেলার অধিকাংশ লইয়া উড়িষ্যার হিন্দু রাজাদের সহিত গৌড়ের মুসলমান সুলতানদিগের সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ হইত। বঙ্গের এই প্রান্তদেশে অনেক হিন্দু রাজাদের বংশধরেরা ছোট ছোট রাজ্য লইয়া শাসন করিতেন। ময়না, কর্ণগড়, নারায়ণগড়, দাঁতন, এই সকল স্থানে মুসলমান-বিজয়ের পরও শত শত বৎসর ধরিয়া হিন্দু সভ্যতার ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাওয়া যাইত। যাঁহারা বাংলার প্রাচীনতত্ত্ব অন্বেষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে মেদিনীপুরের মত জায়গা আর নাই। ময়না, বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ যে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা, তাহার একটি প্রধান জায়গা। এখানকার ধর্ম্মঘরেযুগীরা বোধ হয় হীনযানী বৌদ্ধদিগের বংশধর। মেদিনীপুরে এখনও প্রাচীনতত্ত্বের বিশেষ আলোচনা হয় নাই। এখানকার শাখা-পরিষদ যদি তাহার আলোচনা করেন, তবে অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

নিধু গুপ্ত

[৩]

চাকরীতে জবাব দিয়া, ছাপরা ছাড়িয়া, নিধুবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ছাপরা ছাড়িলেন বটে, কিন্তু ছাপরার স্মৃতি তাঁহাকে ছাড়িল না। যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, তত দিন কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে সেখানকার কথা স্মরণ করিতেন। সুবিধা পাইলেই সেখানে যাইয়া বন্ধুবান্ধবদের সহিত দেখা-শুনা করিয়া আসিতেন। সেখানকার কথা উঠিলে তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিত।—সে গল্প বলিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্র শেষ করিতে চাহিতেন না।—ছাপরার উপর মায়া তাঁহার এতই বেশী জন্মিয়াছিল।

মায়া জন্মিবারই কথা। কারণ, ছাপরায় যাওয়া না হইলে তাঁহার নাম আজ বাঙ্গালীর মুখে-মুখে ফিরিত কি না সন্দেহ! সঙ্গীত-শিক্ষা তাঁহার এই দেশে হইয়াছিল। দীক্ষা-গুরুও তাঁহার এই স্থানে মিলিয়াছিল। এমন কি, চির-জীবনের অন্ন-সংস্থানের উপায়ও তিনি এই ছাপরা হইতে করিয়াছিলেন।—যে দেশের নিকট এত ঋণ, তাহার কথা কি কখনও মন হইতে মুছিয়া ফেলা যায়?

তবে কথা এই যে, ছাপরাকে অত্যন্ত ভালবাসিলেও সেটা ছিল তাঁহার প্রবাস। তাঁহার সুখ-দুঃখের ভাগী হয়, এমন মানুষ সেখানে কেহ ছিল না। তাই যখন সেখানকার আপিসের সঙ্গে তাঁহার বনিল না, তখন তাঁহার—"মনে পড়িল রে ব্রজভূমি।"—তখন তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া গৃহপানে ছুটিয়া আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া, জননীর স্নেহ-শীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইয়া, পুত্র-পরিজনের হাসিমুখ দেখিয়া, পুরাতন বন্ধু-বান্ধবের সহিত গল্প-গুজব করিয়া তাঁহার মনের সকল অসুখ সারিয়া গেল। গৃহে আসিলেন—মনে হইল যেন স্বর্গে আসিয়াছেন। এত সুখ—এত শান্তি জীবনে তিনি আরও কখনও লাভ করেন নাই।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সুখ-ভোগ—এ শান্তি-ভোগ তাঁহার কপালে বেশী দিন টিকিল না। বৎসর দুই যাইতে না যাইতে তাঁহার একমাত্র শিশু-পুত্রটিকে নিষ্ঠুর কাল কাড়িয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শোকাতুরা সহধর্ম্মিণীও পুত্রের অনুসরণ করিলেন। উপর্য্যুপরি এই দুই শোকের আঘাতে নিধুবাবুর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার বয়স তখন অল্প—২৭।২৮ বৎসরের বেশী হইবে না। সেই স্বল্প বয়সে—নূতন সুখ-ভোগের সময়ে, সহসা শোকের আঘাতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখাশুনা করা—আমোদ-আহ্লাদে যোগদান করা সমস্তই বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঘরে বসিয়া নির্জ্জনে শোক-সঙ্গীত রচনা করিতেন, এবং আপন মনে তাহাই গায়িতেন।—শোকে বোধ করি ইহাই তাঁহার কতকটা সান্ত্বনা ছিল।

সে সময়ে কত গান তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার এখন উপায় নাই। তবে ঈশ্বর গুপ্ত বলেন যে, সেই সব গানের মধ্যে একটি গান হইতেছে এই ;—

"মন-পুর হোতে আমার হারায়েছে মন।
কাহারে কহিব, কার দোষ দিব, নিলে কোন্ জন।
না বোলে কেমনে রব, বোলে বল কি করিব,
তোমা বিনে আর, সেখানে কাহার গমনাগমন।
অন্যের অগমনীয়, জান সে স্থান নিশ্চয়
ইথে অনুমান, এই হয় প্রাণ, তুমি সে কারণ।
যদি তাহে থাকে ফল, লোয়েছ কোরেছ ভাল,
নাহি চাহি আমি, যদি প্রাণ তুমি, করহ যতন।"

অনেকের মতে এই তিনটি গানও তাঁহার শোকের সময় রচিত ;—

(১)

"না হ'তে পতন তনু দাহন হইল আগে।
আমার এ মনস্তাপ তাহারে তো নাহি লাগে।
চিতে চিত সাজাইয়ে, তাহে দুঃখ-তৃণ দিয়ে,
আপনু হইনু দগ্ধ, আপনারি মনস্তাপে।"

(২)

"এমন যে হবে প্রেম যাবে এ কভু মনে ছিল না।
এ চিতে নিশ্চিত ছিল, এ প্রেমে বিচ্ছেদ হবে না॥
ভেবেছিলাম নিরন্তর, হয়ে রব একান্তর,
যদি হয় প্রাণান্তর, মনান্তর তায় হবে না॥"

(৩)

"বিরহেতে মরি হে বিধি অনুকূল হইয়ো।
পঞ্চভূত পঞ্চস্থানে নিযুক্ত করিয়ো॥
যে আকাশ বাস তার, আকাশের ভাগ মোর—
এবে সে এই বাসনা তাহাতে মিলায়ো॥

পবন তার ব্যজনে, তেজ মিশুক্ দর্পণে,
জলে সেই জলে রাখ তার ব্যাভারিয়ো ॥
পদ-বিহরণ যথা, পৃথ্বী-অংশ রাখ তথা,
ইহার অধিক আর যে হয় বুঝিয়ো ॥”

যাহা হউক, বৎসর কয়েক পরে, শোকের মাত্রা একটু কমিলে, ১১৭৮ সালে নিধুবাবু পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ পত্নীকে লইয়াও তিনি সংসার করিতে পারিলেন না। বিবাহের এক বৎসর যাইতে না যাইতে এ স্ত্রীরও মৃত্যু ঘটিল। নিধুবাবু তখন সঙ্কল্প করিলেন, আর বিবাহ করিব না। অনেক দিন পর্য্যন্ত এ সঙ্কল্প তিনি বজায় রাখিতেও পারিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা জননীর অনুরোধ-আতিশয্যে তাঁহার সে সঙ্কল্পের বাঁধ অবশেষে ভাঙ্গিয়া যায়। সংসারে তিনি এবং তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ছাড়া আর কেহ তখন ছিলেন না। যে দুইটি পিতৃ-মাতৃহীন ভাগিনেয়কে বুকে করিয়া তিনি মানুষ করিয়াছিলেন, তাহারাও তাঁহাকে একে একে ছাড়িয়া সংসার হইতে অকালে বিদায় গ্রহণ করে। এই সব উপর্য্যুপরি শোকের আঘাতে তিনি সংসারের প্রতি একান্ত অনুরাগ-শূন্য হইয়া উঠেন। তাঁহার জন্য তাঁহার মাতা অত্যন্ত চিন্তিতা—অত্যন্ত ভীতা হইলেন। সন্তানের মন মা যত শীঘ্র, যত ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন, এমন বোধ করি, সংসারে আর কেহ পারেন না। নিধুবাবুর মাতাও নিধুবাবুর মন বুঝিলেন। তাঁহাকে সংসারী করিবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই চেষ্টার ফলে, ১২০১ সালে বরিজহাটি চণ্ডীতলা গ্রামে হরিনারায়ণ সেন মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। এই সংসারে তাঁহার চারিটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। নিধুবাবুর মাতার আশা ফলবতী হইয়াছিল। তিনি পুত্রকে সংসারী করিয়া, পৌত্রের মুখ দেখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন।

নিধুবাবু তেমন সুখ-স্বস্তিতে জীবন কাটাইতে পারেন নাই বটে, তবে সম্মান ও যশ জীবিতকালেই যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। বৎসর চল্লিশ বয়স হইতে তাঁহার সঙ্গীত-শক্তি সর্ব্বসাধারণের সম্ভ্রম ও আদর আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার গান শুনিবার জন্য সকলে উৎসুক হইত। সে গান শুনিতে পাইলে নিজেকে অনেকে কৃতার্থ মনে করিত। স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখিয়া গিয়াছেন,—“তিনি ইচ্ছামত, নিজ হৃদয়ের আবেগে গীত রচনা করিতেন। কেহ তাঁহাকে গান গাইতে বলিতে সাহসীই হইত না! যিনি যত বড় মানুষই হউন না, নিধুবাবু—নিধুবাবু; নিজের ইচ্ছামত না গাইলে, কেহ তাঁহার গান শুনিতে পাইতেন না। নিধুবাবু আখড়ার

আটচালায় বসিয়া সায়ংকালে স্বেচ্ছামত গান গাইতেন; লোকে আসিয়া তাহা শুনিত ও শিখিত। শোভা-বাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি কলিকাতার বড় বড় ধনাঢ্য লোকেরা সে গান শুনিবার জন্য আটচালায় উপস্থিত হইতেন। নিধুবাবুর গান শুনিবার জন্য বৰ্দ্ধমানাধিপ মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর একবার নিধুবাবুকে বর্দ্ধমান আহ্বান করেন। নিধুবাবু শিষ্টাচার-সম্মানের সহিত সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এরূপ ঘটনা বিরল ছিল না। ইহাতেই বুঝুন, নিধুবাবুর স্বভাবের এবং সঙ্গীতের স্বাধীনতা! কবি-হৃদয় আপন মনে আপন বেগেই গাইত; কখনও কাহারও মোসাহেবী করিত না; কবি কীর্ত্তি ও সুখ্যাতির জন্য শশব্যস্ত ছিলেন না।"
—কথাগুলি অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় না। ঈশ্বর গুপ্তও ঐ ধরণের কথাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, নিধুবাবু বৰ্দ্ধমান যাইতে অসম্মত হইলে, মহারাজ তেজশ্চন্দ্র মুর্শিদাবাদের মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুরের কলিকাতার বাগান-বাটীতে একদিন বেড়াইবার ছলে আসিয়া তাঁহার গান শুনিয়া চলিয়া যান। এই সব কারণে, অনেকে অনেক সময় তাঁহাকে অহঙ্কারী বলিয়া মনে করিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি তাহা ছিলেন না। পাছে কেহ মোসাহেব মনে করে, এই ভয়ে তিনি বড় লোকদের সহিত একটু সাবধান হইয়া চলিতেন।—আত্মসম্মান-জ্ঞান তাঁহার অত্যন্ত:প্রবল ছিল।

ঠাকুরদাস বাবুর উপরি-উদ্ধৃত লেখার মধ্যে যে আটচালার উল্লেখ আছে, সেইটি ছিল নিধুবাবুর এক প্রধান আড্ডাস্থান। শোভা-বাজারের বটতলা-নিবাসী ৺রামচন্দ্র মিত্র, যিনি 'আমেরিকান্ কাপ্তেনে'র মুচ্ছুদ্দি ছিলেন, তাঁহারই বাটীর উত্তরাংশে এই প্রসিদ্ধ আটচালাখানি ছিল; নিধুবাবু প্রায় প্রত্যহ রাত্রে এখানে আসিয়া গান-বাজনা করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, 'ঐ স্থলে এই নগরস্থ প্রায় সমস্ত সৌখীন ধনী ও গুণী লোক উপস্থিত হইয়া নিধুবাবুর সুধাময় কণ্ঠ-বিনির্গত সুমধুর সঙ্গীত-স্বরে মুগ্ধ হইতেন। বাবু নারায়ণ মিশ্র মহাশয় পক্ষীর দল করিয়া এই প্রসিদ্ধ আটচালায় সর্ব্বদাই উল্লাস করিতেন। পক্ষীর দলের পক্ষী সকলেই ভদ্র-সন্তান, পাখীর দলেরা নিধুবাবুকে কর্ত্তা বলিয়া অত্যন্ত মান্য করিত।'

ঐ আটচালা ছাড়া, আরও একটি স্থান ছিল, যেখানে নিধুবাবু দিনান্তে একবার না যাইয়া থাকিতে পারিতেন না। সে স্থানটি—মুর্শিদাবাদের মহারাজা মহানন্দ রায় বাহাদুরের বাগান-বাটী। এই বাগান বাড়ীতে আসিয়াই মহারাজা তেজশ্চন্দ্র নিধুবাবুর গান শুনিয়া গিয়াছিলেন। এ বাড়ীতে মহারাজ মহানন্দের শ্রীমতী নামে এক বারাঙ্গনা বাস করিত। বারাঙ্গনা থাকিলেও তখনকার কালে এরূপ স্থানে বৈঠক করা কোনও দোষের বলিয়া পরিগণিত হইত না। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, একজন

অশীতিবৎসর বয়সের বৃদ্ধ এ সম্বন্ধে 'ভারতীতে' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িলেই আমাদের কথা সকলে বুঝিতে পারিবেন। তিনি প্রথম বর্ষের 'ভারতীর' ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"তখনকার অধিকাংশ লোকেই বেশ্যালয়ে গমন করিতেন। যাইবার কোন কদর্য্য অভিপ্রায় ছিল না। কেবল দশজন ভদ্রলোকে একত্র হইয়া গান-বাদন, ক্রীড়া বা সদালাপ করা মাত্র।...কুটীয়ালেরা আফিস হইতে আসিয়া, হস্ত-পদাদি ধৌত করিয়া, বৃদ্ধ ও আধ-বৃদ্ধেরা হরি-নামের ঝুলি লইয়া, বেশ্যালয়ে উপস্থিত হইতেন; বয়সের তারতম্য ছিল না, সকল বয়সের লোকই সমবেত হইতেন।...দুই এক ঘণ্টা আমোদ করিয়া চলিয়া যাইতেন। তখনকার বড় মানুষেরা এই প্রকার সবান্ধবে আমোদ করিবার নিমিত্ত বেশ্যা রাখিতেন। বেশ্যার সংখ্যা তখন অত্যন্ত অল্প ছিল।"

উপরে ঐ যে দুইটি আড্ডার পরিচয় দিলাম, পাঠক উহা হইতেই আশা করি, বুঝিতে পারিতেছেন যে, তখনকার কালের বাঙ্গালী-সমাজে কতটা সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করিত। ঐ জন্য আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, তাঁহারা কি বলিতেছেন, তাহা তাঁহারা নিজেরাই জানেন না, যাঁহারা নিধুবাবুকে ও কবিওয়ালাদিগকে সাহিত্যের আসর হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য এই যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন যে, 'বাঙ্গালাদেশ তখন অরাজকতা-পূর্ণ—তখন সাহিত্য-সৃষ্টি হইতেই পারে না।' ঐ তার্কিকেরা বাঙ্গালা-রাজ্যের কাড়াকাড়ির ইতিহাসটুকু জানিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালীর ইতিহাস আদৌ জানেন না। তাঁহারা রসানুভূতির সাহায্যে নিধুবাবু প্রভৃতির আলোচনা করেন না;—কেবল বিলাতী সমালোচকের বাঁধা বুলি কপচাইয়াই নিধুবাবু প্রভৃতিকে উড়াইয়া দিতে চাহেন!

মহারাজ মহানন্দের বাগান-বাটীর কথা এখানে আরও একটু বলিব। কারণ, এই স্থানে নিধুবাবুর অধিকাংশ সঙ্গীতই রচিত হইয়াছিল। রবিবাবু বলিয়াছেন বটে,—

"আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমারে দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে যেথায় খুঁজিছ সেথা সে নাহি রে!"

কিন্তু নিধুবাবুর পক্ষে এ কথা খাটে না। কোনও কবির পক্ষে উহা সুখ্যাতির কথা বলিয়া মনেও করি না। নিধুবাবুর সুখ-দুঃখ, বেদনা-সান্ত্বনা সমস্তই তাঁহার কাব্যে আমরা প্রতিফলিত দেখিতে পাই। চণ্ডীদাসের কবিত্বের উৎস যেমন

রজকিনী রামীর প্রেম, নিধুবাবুর গানের উৎসও তেমনই এই বাগানবাড়ীর শ্রীমতীর প্রেম। শ্রীমতী নিধুবাবুকে যেরূপ ভালবাসিত, নিধুবাবুও তাহাকে সেইরূপ ভালবাসিতেন। এই দু'জনের সম্বন্ধে যে দুই একটি গল্প প্রচলিত আছে. পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য এখানে তাহা বিবৃত করিতেছি।

নিধুবাবুর উপর শ্রীমতী এমন একটা দাবী করিত যে, তিনি যদি দুই চারি দিন তাহার কাছে না যাইতেন, তাহা হইলে সেটা যেন তাঁহার এক মস্ত অপরাধ বলিয়া শ্রীমতীর মনে হইত। একবার দুই চারি দিন অনুপস্থিতির পর হঠাৎ একদিন নিধুবাবুর ইচ্ছা হইল, শ্রীমতীকে গিয়া দেখিয়া আসি। ইচ্ছা হইবামাত্র তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই দিনই—দুপুর বেলায় শ্রীমতীর বাটীতে তিনি উপস্থিত হইলেন। এ দিকে, শ্রীমতীও তাঁহার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় নিধুবাবুকে সহসা আসিতে দেখিয়া শ্রীমতী বলিল,—"অসময়ে বড় যে, কি মনে ক'রে—দেখা দিতে নাকি?" নিধুবাবু তাহার কথার মধ্যে, কথার সুরে, তাহার দুই চোখে একটা চাপা ভৎ'সনা লক্ষ্য করিলেন। তিনি কোনও কথা না বলিয়া, নিকটবর্ত্তী আসনে উপবিষ্ট হইয়া গান ধরিলেন,—

"ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
শ্রীমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই দেখিবারে আসি, 'দেখা দিতে' আসিনে॥"

শ্রীমতী নিধুবাবুর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া একটু রাগ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল,—"দেখ, আমরা অবলা, বুদ্ধিহীনা। আমাদের প্রবঞ্চনা করাটা বিশেষ বাহাদুরী নয়।"—ইহাতেও নিধুবাবু কোনও কথা না কহিয়া আবার গান ধরিলেন,—

"কে বলে 'অবলা' তোমায়—মহাবল ধর প্রিয়ে,
ধরাধর ধর হৃদে, ঢেকেছ বসন দিয়ে।
স্মরহর শর সম, কটাক্ষ তব বিষম,
নিরুপমা নিগুর্ণ, নর বধ নারী হ'য়ে।"

এই গানটি শুনিবামাত্র শ্রীমতী হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—"মনে করিয়াছিলাম, তোমার সঙ্গে আজ ঝগড়া করিব। কিন্তু কি যে তোমার গানের গুণ—শুনিলেই সব ভুলিয়া যাই।" উভয়ের চক্ষে তখন প্রীতির হাসি ফুটিয়া উঠিল। নিধুবাবু পুনরায় গাহিতে আরম্ভ করিলেন,—

"এমন নয়ন-বাণ কে তোমায় করেছে দান,
দর্পণে হেরিলে আঁখি আপনি হবে সন্ধান।
নয়ন অক্ষয় তূণ, তাহে কটাক্ষ নিপুণ
বিধি যদি দিত গুণ, বধিতে অনেকেরই প্রাণ।"

নিধুবাবুর অধিকাংশ সঙ্গীতই এই ভাবে রচিত। মনে ভাব উদয় হইলেই তিনি তাহা গানে প্রকাশ করিতেন। এ সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি গল্প প্রচলিত আছে। আমরা যাহা জানি, একে একে তাহা পাঠকবর্গকে এখানে উপঢৌকন দিতেছি।

একদিন নিধুবাবু দুই-একটি বন্ধুর সহিত গঙ্গাস্নান করিতেছেন, এমন সময় পাশের ঘাট হইতে তাঁহাদের কানে আসিয়া পৌঁছিল যে, একটি স্ত্রীলোক আর একটি স্ত্রীলোককে বলিতেছেন,—"দেখ ভাই, চোখই যতই অনর্থের মূল।" কথাটা শুনিবা-মাত্র নিধুর এক বন্ধু বলিলেন, "কথাটা ঠিক বটে।' নিধুবাবু বলিলেন,—"কথাটা খুবই ভুল।' বন্ধু ইহার উত্তরে বলিলেন, "তবে ঠিক কথা কি শুনি!" নিধুবাবু তখন অতি চাপা কণ্ঠে বন্ধুর কানের কাছে গায়িলেন,—

"নয়নেরে দোষ কেন,
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন!
আঁখি কি মজাতে পারে না হোলে মন-মিলন।
আঁখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
যে যাকে মনে করে, সেই তার মনোরঞ্জন।"

"বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ছিল, বাজারে এখন তাহা পাওয়া যায় না, তাহারই একস্থানে নিধুবাবু-সংক্রান্ত এই গল্পটি আছে যে, "একদিন নিধুবাবু বাটীতে বসিয়া মৃদুস্বরে গান করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে রাম, তুই নাকি বড় গায়ক হয়েছিস্? আমরা সে দিন রাজবাটীতে (শোভাবাজার) কথা শুনিতে গিয়াছিলাম, কথকের গান শুনিয়া আপোষের মধ্যে বলিলাম,—কথকটি বেশ গান গায়। একটি সুন্দরী বউ, কাহাদের জানি না, যেন ভগবতী, আমার পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'আপনি কি আপনার ছেলের গান কখনও শুনেন নাই!' আমি বলিলাম,—'কৈ না।' সেই বউটি বলিল—'তবে একবার শুনিবেন।' এমন সময় কথা সাঙ্গ হইল আর সেই বউটির পরিচয় লওয়া হইল না। তা বাছা, তুই আজ একটা গান গা—আমি শুনি। নিধুবাবুর একজন প্রতিবেশিনী ঠাকরুণ-দিদি সেই সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন, "দেখ ভাই, নাত্‌বউএর পায়ে

ধরার গানটা যেন হয়।" নিধুবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।"—এই বলিয়া নিম্নলিখিত গানটি গাহিলেন—

"আমি সাধ ক'রে কি ধরি তারই পায়।
সে ধন সহজে কি পাওয়া যায়।
সে যে জগদ্‌গুরু কল্পতরু,—মন দিতে হয় যে তারই পায়,
সে যে সাধনের ধন অমূল্য রতন, তারে সাধন বিনা কেবা পায়!
সে যে অধম-তারিণী, দুঃখ-নিস্তারিণী, তারে প্রেম বিনা বাঁধা দায়।"

এই পুস্তকেই আর একটি গল্প আছে যে, একদিন নিধুবাবুর কোনও এক বন্ধু তাঁহাকে রহস্য করিয়া বলেন—"নিধু! প্রেম, পীরিতি, গেয়ে-গেয়েই ত দিন কাটালে —ভাব কিছু বুঝিতে পারিলে?"—নিধুবাবু ইহার উত্তরে তখন তাঁহাকে এই গানটি শুনাইলেন,—

"প্রেম-সিন্ধুনীরে—বহে নানা তরঙ্গ,
রসিকে পার হ'তে পারে—অরসিকের আতঙ্ক।
চাতুরী-তরী একে, তাহে কর্ণধার অনঙ্গ,
বিচ্ছেদ প্রবল বায়ু, কখন্ করে কি রঙ্গ॥"

তাঁহার সম্বন্ধে আর একটি গল্প আছে যে, একবার তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে দুঃখ করিয়া বলেন,—"নিধু, চিরকালটাই একভাবে কাটাইলে—আর ভাল দেখায় না! আড্ডা দেওয়া বন্ধ কর!"—নিধু ইহাতে হাসিয়া এই গানটি বলেন—

"কা'র দোষ দিব বল, দোষী কব কায়।
আমার মন, আমার নয়ন, আমারে মজাতে চায়।
মন যদি হতো মনের মতন, তবে কি দুঃখ পেতাম এমন;—
আমি মনেরে বুঝাব কত,—সতত বিপথে ধায়॥"

নিধুবাবুর যে সঙ্গীতটি সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত, তাহার সম্বন্ধেও একটি গল্প প্রচলিত আছে। সে গল্পটি এই যে, নিধুবাবু দুই দিন বাটী আসেন নাই, তৃতীয় দিবসে বাটী আসিলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী অভিমান করিয়া বলেন "কাল-কুৎসিত ব'লে কি আমাকে এতই ঘৃণা করিতে হয়?"—নিধুবাবু এই কথার উত্তরে তখন এই গানটি রচনা করেন,—

"তোমারই উপমা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে,
আকাশের পূর্ণশশী সেও কাঁদে কলঙ্ক-ছলে।

সৌরভে গৌরবে, কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গা-পূজা গঙ্গাজলে।"

উপরি-উক্ত গল্পগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারি না; তবে কথাগুলা যখন চলিয়া আসিতেছে, তখন উহা চাপিয়া রাখাটা ঠিক মনে করি না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় আর কিছু না হউক, তাহা হইতে মানুষটা যে কেমন, তাহা বুঝা যায়। উপরের গল্পগুলিতেও আর কিছু না হউক, উহার দ্বারা কিন্তু আমরা নিধুবাবুর কবি-প্রকৃতি দেখিতে পাই।

টপ্পা ছাড়া নিধুবাবুর নিকট বাঙ্গালী আরও একটি জিনিষের জন্য ঋণী।—তাহা আখড়াই। আখ্ড়াইএর তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারই হাতে এ জিনিষটার বিস্তর উন্নতি হইয়াছিল। কবিওয়ালা ভোলা ময়রার এক গানে আছে —"আখড়ায়ের সৃষ্টি কোল্লে কুলুইচন্দ্র সেন।"—এই কুলুইচন্দ্র রামনিধি গুপ্তের অতি নিকট সম্পর্কীয় ভ্রাতা ছিলেন। এক ভ্রাতার হস্তে যাহার সৃষ্টি হইয়াছিল, অন্য ভ্রাতার হস্তে তাহা শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্ত বলেন,—"৺রামনিধি গুপ্ত মহাশয় এই আখ্ড়ায়ের বিস্তর শ্রীবৃদ্ধি করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার প্রণীত সংশোধিত পদ্ধতিই প্রচলিত হইয়াছিল।"

মোহনচাঁদের আখ্ড়ায়ের যে নাম আমরা শুনিতে পাই, তাহা নিধুবাবুরই হাতে-গড়া জিনিস ছিল। স্বর্গীয় মোহনচাঁদ বসু নিধুবাবুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য ছিলেন। লোকে মোহনচাঁদকে নিধুবাবুর "খাস ভাণ্ডার" বলিত। ঈশ্বর গুপ্ত ইঁহার সম্বন্ধে তাঁহার 'প্রভাকরে' লিখিয়া গিয়াছেন,—'বাঙ্গালীর মধ্যে এই বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় বাঙ্গালা গাহনা বিষয়ে ইদানীং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্য ব্যক্তি দ্বিতীয় আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। নিধুবাবু ইঁহাকে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করিতেন, তাঁহার কৃত কি 'আখ্ড়াই' কি 'টপ্পা' ইনি যখন যাহা গাহিতেন, তখন তাহাতেই মধুবৃষ্টি করিতেন।"

শেষ-জীবনে নিধুবাবু বাগবাজারের ৺রসিকচাঁদ গোস্বামীর বাটী ছাড়া আর কোথাও বড় একটা যাইতেন না। শোভাবাজারের রামচন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার আট-চালার আড্ডায় নিধুবাবু বড় যাইতে চাহিতেন না;—কাজেই সে আড্ডা বন্ধ হইয়া যায়। তখন নিধুবাবুর পরমভক্ত বাগবাজার-নিবাসী দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে ও সাহায্যে রসিকচাঁদের বাটীতে বৈঠক বসিতে আরম্ভ হয়। নিধু-বাবু প্রায় প্রত্যহই এখানে আসিতেন। গান-বাজনা, আমোদ-আহ্লাদ এখানে খুবই হইত।

নিধুবাবু এক বিষয়ে বিশেষ সুখী ছিলেন। তাঁহার যেমন স্বাস্থ্য ছিল, তেমন স্বাস্থ্য সকলে পায় না। ১২৬১ সালের 'সংবাদ-প্রভাকরে' লিখিত আছে যে, তিনি "শারীরিক নিদান এমন বুঝিতেন যে, সময়ে স্নান, সময়ে ভোজন, সময়ে শয়ন করাতে কথনো কোনরূপ রোগ ভোগ করেন নাই। তিনি এত যে প্রাচীন হইয়াছিলেন, তথাচ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, এবং বুদ্ধিরও ভ্রম হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে কেবল এক বৎসর কাল দুর্ব্বলতা জন্য গতিশক্তির ব্যাঘাত হইয়াছিল। এ কারণ বাটীর বাহির হইয়া কুত্রাপি গমন করিতে পারেন নাই। এই এক বৎসর যে যে মহাশয় দেখা করিতে আসিতেন, তাঁহাদিগের সহিত হাস্যবদনে আলাপাদি করিয়া পরিশিষ্ট সময় 'হস্তামল' 'কবীর' ও 'তুলসীদাস' কৃত গ্রন্থ অথবা ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিতেন। রামনিধিবাবু ৯৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এবম্ভূত সুখ-সম্ভোগ করণানন্তর ১২৪৫ সালের ২১শে চৈত্র দিবসে পুত্র-কন্যা পৌত্র দৌহিত্রাদি রাখিয়া জাহ্নবীতীরে নীরে জ্ঞানপূর্ব্বক জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এতন্মায়াময় সংসার পরিহার করত যোগ্যধামে যাত্রা করেন।"

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, নিধুবাবু নিজের গানগুলি সংগ্রহ করিয়া "গীতরত্ন" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থখানি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার পুত্র জয়গোপাল গুপ্ত ১২৬১ সালে এই পুস্তকথানি পুনরায় মুদ্রিত করেন। "গীতরত্নে"র এ সংস্করণও দুর্ল্লভ। তবে আমাদের নিকট ইহা আছে। ইহাতে নিধুবাবুর যে একটু জীবন-কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরগুপ্ত কর্ত্তৃক লিখিত জীবনীরই কতকটা সঙ্কলন মাত্র। তাহাতে নিধুবাবুর জীবনী-সংক্রান্ত যে দুইটি বেশী ঘটনার উল্লেখ আছে, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম ঘটনাটি এই,—"১২১২ কিংবা ১৩ অব্দে নিধুবাবুর উদ্যোগে এতন্নগরে দুইটি সংশোধিত সখের আথ্‌ড়াই দলের সৃষ্টি হয়, তাহার একপক্ষে বাগবাজার ও শোভা-বাজারস্থ সমুদায় ভদ্রসন্তান, এবং আর একপক্ষে মনসাতলা অথবা পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী ৺নীলমণি মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ব্রতী হইলেন। এই উভয়দলে 'বাদী' হইলে নিধুবাবু বাগবাজারের পক্ষ হইয়া গীত ও সুর প্রদান করিলেন; এবং মল্লিকবাবুর পক্ষে শ্রীদাম দাস এবং ৺কুলুইচন্দ্র সেনের পুত্র ৺গোকুলচন্দ্র সেন প্রভৃতি কয়েকজন গীত ও সুর প্রস্তুত করণার্থে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে শ্রীদাম দাস প্রভৃতি ভবানী-বিষয় এবং খেউড় প্রস্তুত করিলেন। প্রভাতি প্রস্তুত করিতে গোকুলচন্দ্র সেনের উপর ভারার্পণ হইল। তাহাতে তিনি এই মোহাড়া রচনা করিলেন যথা,—

'ওইরে অরুণ আলো কামিনী দহিতে।'

কিন্তু ইহার চিতেন, পড়েন এবং অন্তরা প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হওয়াতে নিধুবাবুকে কহিলেন, 'খুড়া মহাশয়, এই মোহাড়া প্রস্তুত করিয়াছি. কালবিলম্ব হয়, অতএব অনুগ্রহ করিয়া ইহার চিতেন প্রভৃতি রচনা করিয়া দিউন।' তাহাতে নিধুবাবু এই নিম্নলিখিত চিতেন, পড়েন এবং পর চিতেন রচনা করিয়া দিলেন, যথা,—

'নিবারি শশীর শোভা কুমুদী সহিতে।
না হ'তে সুখের লেশ, রজনী হইল শেষ;
চকোরী চাঁদের আশা তেজিল দুঃখেতে॥'

এই সঙ্গীত-সংগ্রাম শ্রবণ ও দর্শন করত নগরস্থ সমস্ত বিশিষ্ট লোক অপর্য্যাপ্ত আনন্দ-সাগরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ সখের আখ্ড়াই স্থাপিত হইলে ব্যবসায়ী-দিগের আখড়ায়ের দল একেবারে উঠিয়া গেল।"

দ্বিতীয় গল্পটি এইঃ—তাঁহার "বার্দ্ধক্য সময়ে একদিবস রাজা বরদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর নিধুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন—'মহাশয়, আমি একটি টপ্পার মোহাড়া রচনা করিয়াছি, কিন্তু অনেক দিবস ইহার অবশিষ্ট অংশ কিছুই হয় নাই।'—ইহাতে নিধুবাবু কহিলেন,—'সে মোহাড়া কি?' তখন রাজাকৃত মোহাড়া পাঠ হইল, যথা,—

'মনে করি পিরীতি না করি'

নিধুবাবুর অবশিষ্ট অংশ—

'সকল দুঃখের মূল প্রণয়ে চাতুরী।
শ্যাম-অদর্শনে যত ব্রজপুর-নারী,
জ্বলিত বিরহানলে দিবা-বিভাবরী॥
বরদা বিধান এই বুঝহ বিচারি
প্রেমসুখ যত দুঃখ হরি হরি হরি'॥"

নিধুবাবুর এই গানের পুস্তকে নিধুবাবুর লিখিত একটি ভূমিকাও আছে। এই 'ভূমিকা' পড়িয়া তাঁহার পুস্তকখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও পুস্তক-প্রকাশের উদ্দেশ্য জানিতে পারা যায়। বাঙ্গালা পুস্তকে বাঙ্গালীর লিখিত ভূমিকা—এই দেড় শত বৎসর পরেও, আধুনিক 'ভূমিকা' লেখকগণের প্রণিধানযোগ্য। কারণ, সে 'ভূমিকা' প্রকৃত ভূমিকাই বটে,—তাহাতে বিজ্ঞাপনের গন্ধ বা বিদ্যা-জাহিরের বিকট চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা নিধু-লিখিত সেই ভূমিকাটি পাঠক-বর্গকে এখানে উপহার দিয়া তাঁহার জীবন-কথা এইখানে শেষ করিলাম। আগামী বারে তাঁহার সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণের প্রয়াস পাইব।

'গীতরত্নে'র ভূমিকা।

"এই পশ্চাতের লিখিত গীত সকল বহু দিবসাবধি স্থন্দররূপ ব্যক্ত থাকাতে কোন মত প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে আমার বাসনা ছিল না, এক্ষণে সময়ক্রমে এই কারণবশতঃ সর্ব্বসাধারণ গুণগ্রাহিগণের অবগতির জন্ত মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল। এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহা হইতেও অধিকাংশ ভূরি ভূরি বর্ণাশুদ্ধি এবং অশুদ্ধ পদে পূর্ণিত করিয়া প্রচার করিল, এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম, মৎকৃত সঙ্গীত সকল এক্ষণেও যত্তপি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপ প্রকাশিত না হয়, তবে হানি আছে। এই আশঙ্কা-প্রযুক্ত প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকান্তর্গত গীত সকল আত্মীয়-বন্ধুগণের এবং গানে-আমোদিত ব্যক্তিদিগের তুষ্টির কারণ রচনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে প্রচারকরণের সেই আর এক মানসও রহিল। বঙ্গভাষায় এতাদৃশ গানের পুস্তক যত্তপি সম্পূর্ণরূপে অভিনব নহে, তথাপি এ ভাষায় এমত গ্রন্থ অন্তের পুস্তকের দৃষ্টান্তমত কহা যাইতে পারে না, এবং এই গীত সকলে আলাপচারি-দ্বারা যে সকল তান্ বসিয়াছে, তাহা কোন হিন্দু-স্থানি খ্যাল ও টপ্পার স্থরে গীত রচনা করিয়া দেওয়া এমত নহে; অথচ গান করণ-মাত্রেই রাগ-রাগিণীর রূপ অবিকল বুঝাইতেছে। সঙ্গীত-বিস্তার সমুদায় রাগ ও রাগিণী অতি বিস্তর। কালে কালে তাহার অনেক লোপ হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে যাহা আছে, তাহাও অনেকে জ্ঞাত নহে। যাহাই হউক, এই পুস্তকে সঙ্গীতশাস্ত্রসম্মত এবং সঙ্গীতে পণ্ডিতগণের কল্পিত নানা প্রকার রাগ-রাগিণীতে গান সকল প্রকাশিত হইল, এতদ্ভিন্ন রাগদ্বয়ে এবং রাগিণীদ্বয়ে মিলাইয়া কতক গীত প্রকাশ করিলাম, আর নির্ঘন্ট-পত্রিকাতে ঐ রাগ এবং রাগিণীর সময় নিরূপণ করিয়া অকারাদি রীতিক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করিলাম, অনুমান করি যে, ইহাতে পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিতে পারিবেক।"

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

ভক্তিহীনা

সবে তুলিয়ে অঙ্গুলি, করে বলাবলি
হের, ভক্তিহীনা ঐ
ওহে করে লয়ে মালা—সংসারের জ্বালা
গণিতে নিপুণা নই।

গঠিত মুরতি বসায়ে আসনে
ফুল জল অরপিয়া
তুমি জান শুধু হে আমার বঁধু
তাহে পরিতৃপ্ত নহে হিয়া।

কোথা সে কল্পনা অন্তরে-বাহিরে
ঢুঁরিলাম পাতি পাতি
যাহে নিরমিব ও মুরতি তব
পাষাণে সুষমা গাঁথি।

কোথায় সে গান ?—যাহা-গাহি, প্রাণ
—করিব প্রতিষ্ঠা তোর
এমনি অধম এমনি অক্ষম
—মোরে করেছ হে মন-চোর।

সে কি মম দোষ ? কিসে পরিতোষ
—তোমারে করিব বল।
যা, দিয়াছ নিয়ে রহেছি বসিয়ে
আঁখি-পাতে ভরি জল।

তোমারি সে দান ক্ষুদ্র হৃদয়-উদ্যান
দেহ' এক নিরিবিলি
তুলি বনফুল সরম আকুল
ওহে তাহা দিয়ে ভরি ডালি।

বসি সারা বেলা গাঁথি শত মালা
পুনঃ ফেলে দিই খুলে ধূলে—
না হয় চিক্কণ মনের মতন
হেরে ভাসি আঁখিজলে।

মোরে, সৃজি পুষ্পনারী মানাইলে হারি
দাঁড়ায়ে আঁখির আগে
সব ভুলে যাই আপনা হারাই
বঁধু, নেহারি শ্রীঅঙ্গরাগে!

আছে বটে জবা, মন-বন-প্রভা
হৃদি রক্তরাগে ভরা!
আছে সুকোমল-প্রেম-বিল্বদল
সুশ্যামল মনোহরা!

আছে আকুলতা-সূতে সখা গাঁথা
ভাবের প্রসূনহার।
কিন্তু মনোমত হয় না'ক সে ত,
কি সে দিব উপহার।

ওহে স'বার উপর আছে মনোহর
মুগধ এ হিয়া মোর।
তব অনুরাগে তব রূপরাগে
যাহা নিশি দিশি সদা ভোর!

সদা সর্ব্বক্ষণ এ রূপে নয়ন
যদি হে ভরিয়ে রাখ।
শুধু—হাস, সুধাহাসি হেরি রূপরাশি!—
আমি, পূজিতে পারিব না'ক।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

স্বামী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

হাত দিয়ে পাখাটা ধ'রে ফেলে বল্লুম, "এ তুমি কি কর্‌চ ?"

তিনি বল্লেন, "কথা কইতে হবে না, ঘুমোও; জেগে থাক্‌লে মাথাধরা ছাড়্‌বে না।"

আমি বল্লুম, "আমার মাথা ধরেছে, কে তোমাকে বল্লে ?"

তিনি একটু হেসে জবাব দিলেন, "কেউ বলেনি, আমি হাত গুণ্‌তে জানি। কারো মাথা ধর্‌লেই টের পাই।"

বল্লুম, "তা' হ'লে ত অন্য দিনও পেয়েছ বল ? মাথা ত শুধু আমার আজই ধরেনি।"

তিনি আবার একটু হেসে বল্লেন, "রোজই পেয়েছি। কিন্তু এখন একটু ঘুমোবে, না, কথা কবে ?"

বল্লুম, "মাথা আমার ছেড়ে গেছে, আর ঘুমোবো না।"

তিনি বল্লেন, "তবে সবুর কর, তোমার ওষুধটা কপালে লাগিয়ে দিই", ব'লে উঠে গিয়ে কি একটা নিয়ে এসে ধীরে ধীরে আমার কপালে ঘষে দিতে লাগ্‌লেন। আমি ঠিক ইচ্ছে করেই যে কর্‌লুম, তা নয়, কিন্তু আমার ডান হাতটা কেমন ক'রে তাঁর কোলের ওপর গিয়ে পড়্‌তেই তিনি একটা হাত দিয়ে সেটা চেপে ধ'রে রাখ্‌লেন। হয় ত, একবার একটু জোর করেও ছিলুম। কিন্তু সে জোর আপনিই কোথায় মিলিয়ে গেল। দুরন্ত ছেলেকে মা যখন কোলে টেনে নিয়ে জোর ক'রে ধ'রে রাখেন, তখন, বাইরে থেকে হয় ত সেটাকে একটুখানি অত্যাচারের মতও দেখায়, কিন্তু সে অত্যাচারের মধ্যে শিশুর ঘুমিয়ে পড়্‌তে বাধে না।

বাইরের লোক যাই বলুক, শিশু বোঝে, ওইটেই তার সব চেয়ে নিরাপদ্ স্থান। আমার এই জড়পিণ্ড হাতটারও বোধ করি সেই জ্ঞানই ছিল, নইলে কি কোরে সে টের পেলে, নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে প'ড়ে থাক্‌বার এমন আশ্রয় তার আর নেই।

তার পরে তিনি আস্তে আস্তে আমার কপালে হাত বুলোতে লাগ্‌লেন, আমি চুপ ক'রে পড়ে রইলুম। আমি এর বেশী আর বোল্‌ব না। আমার সেই প্রথম রাত্রির আনন্দস্মৃতি—সে আমার, একেবারে আমারই থাক্। আমি কাউকে প্রাণ ধ'রে তার ভাগ দিতে পার্‌ব না।

কিন্তু আমি ত জান্‌তুম, ভালবাসার যা' কিছু, সে আমি শিখে এবং শেষ ক'রে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী এসেছি। কিন্তু সে শেখা যে ডাঙায় হাত-পা ছুড়ে সাঁতার শেখার মত ভুল শেখা, এই সোজা কথাটা সে দিন যদি টের পেতুম! স্বামীর কোলের ওপর থেকে আমার হাতখানা যে তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে শোষণ করে, এই কথাটাই আমার বুকের ভেতর পৌঁছে দেবার চেষ্টা কর্‌ছিল, এই খবরটা যদি সে দিন আমার কাছে ধরা পড়্‌ত!

সকালে ঘুম ভেঙে দেখ্‌লুম, স্বামী ঘরে নেই, কখন্ উঠে গেছেন। হঠাৎ মনে হ'ল, স্বপন দেখিনি ত? কিন্তু চেয়ে দেখি, সেই ওষুধের শিশিটা তখনও শিয়রের কাছে রয়েছে। কি যে মনে হ'ল, সেটা বার বার মাথায় ঠেকিয়ে তবে কুলুঙ্গিতে তুলে রেখে বাইরে এলুম।

শাশুড়ী ঠাকরুণ সেই দিন থেকে আমার ওপর যে কড়া নজর রাখ্‌ছিলেন, সে আমি টের পেতুম। আমিও ভেবেছিলুম, মরুক্ গে, আমি কোন কথায় আর থাক্‌ব না। তা'ছাড়া দুদিন আস্‌তে-না-আস্‌তে স্বামীর খাওয়া-পরা নিয়ে ঝগড়া,—ছি ছি, লোকে শুন্‌লেই বা বল্‌বে কি?

কিন্তু কবে যে এর মধ্যেই আমার মনের ওপর দাগ প'ড়ে গিয়েছিল, কবে যে তাঁর খাওয়া-পরা নিয়ে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে উঠেছিলুম, সে আমি নিজেই জান্‌তুম না। তাই, দুটো দিন যেতে-না-যেতেই আবার একদিন ঝগড়া ক'রে ফেল্‌লুম।

আমার স্বামীর কে একজন আড়ৎদার বন্ধু সে দিন সকালে মস্ত একটা রুইমাছ পাঠিয়েছিলেন। স্নান কর্‌তে পুকুরে যাচ্চি, দেখি, বারান্দার ওপর সবাই জড় হয়ে কথাবার্ত্তা হচ্চে। কাছে এসে দাঁড়ালুম। মাছ কোটা হয়ে গেছে। মেজ জা' তরকারি কুট্‌চেন, শাশুড়ী ব'লে ব'লে দিচ্চেন;—এটা মাছের ঝোলের কুট্‌নো, ওটা মাছের ডালনার কুট্‌নো, ওটা মাছের অম্বলের কুট্‌নো,—এম্‌নি সমস্তই প্রায় আঁশ রান্না। আজ একাদশী—তাঁর এবং বিধবা মেয়ের খাবার হাঙ্গামা নেই, কিন্তু আমার স্বামীর জন্যে কোন ব্যবস্থাই দেখ্‌লুম না। তিনি বৈষ্ণব মানুষ, মাছ-মাংস ছুঁতেন না। একটু ডাল, দুটো ভাজাভুজি, একটুখানি অম্বল হলেই তাঁর খাওয়া হ'ত। অথচ, ভাল খেতেও তিনি ভালবাস্‌তেন। এক আধদিন একটু ভাল তরকারি হ'লে তাঁর আহ্লাদের সীমা থাকৃত না, তাও দেখেচি।

বল্‌লুম, "ওঁর জন্যে কি হচ্চে মা?"

শাশুড়ী বল্‌লেন, "আজ আর সময় কৈ বউমা? তার জন্যে দুটো আলু-উচ্ছে ভাতে দিতে ব'লে দিয়েচি,—তার পরে একটু দুধ দেব'খন।"

বল্‌লুম, "সময় নেই কেন মা?"

শাশুড়ী বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন, "দেখ্‌তেই ত পাচ্ছ বউমা। এতগুলো আঁশ রান্না, হতেই ত দশটা—এগারোটা বেজে যাবে। আজ আমার অখিলের (মেজ দেবর) দু'চার জন বন্ধুবান্ধব খাবে, তারা হ'ল সব অপিসার মানুষ, দশটার মধ্যে খাওয়া না হ'লে পিত্তি প'ড়ে সারাদিন আর খাওয়াই হবে না। এর ওপর আবার নিরিমিষ রান্না কর্‌তে গেলে ত রাঁধুনী বাঁচে না। তার প্রাণটাও ত দেখ্‌তে হবে বাছা!"

রাগে সর্ব্বাঙ্গ রি-রি ক'রে জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। তবু কোনমতে আত্মসংবরণ ক'রে বল্‌লুম, "শুধু আলু-উচ্ছে ভাতে দিয়ে কি কেউ খেতে পারে মা? একটুখানি ডাল রাঁধ্‌বারও কি সময় হ'ত না?"

তিনি আমার মুখপানে কট্‌মট্‌ ক'রে চেয়ে বল্‌লেন, "তোমার সঙ্গে তর্ক কর্‌তে পারিনে বাছা, আমার কাজ আছে।"

এতক্ষণ রাগ সাম্‌লেছিলুম, আর পার্‌লুম না। ব'লে ফেল্‌লুম, "কাজ সকলেরি আছে মা! তিনি তিরিশ টাকার কেরাণী-গিরী করেন না ব'লে কুলি-মজুর ব'লে তোমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কর্‌তে পারো, কিন্তু আমি ত পারিনে! আমি ওই দিয়ে তাঁকে খেতে দেব না। রাঁধুনী রাঁধ্‌তে না পারে, আমি যাচ্ছি।"

শাশুড়ী খানিকক্ষণ অবাক্‌ হয়ে আমার পানে চেয়ে থেকে বল্‌লেন, "তুমি ত কাল এলে বউমা, এতদিন তার কি ক'রে খাওয়া হ'ত শুনি?"

বল্‌লুম, "সে খোঁজে আমার দরকার নেই। কিন্তু কাল এলেও আমি কচি খুকী নই মা। এখন থেকে সে সব হ'তে দিতে পার্‌বে না।" রান্না-ঘরে ঢুকে রাঁধুনীকে বল্‌লুম, "বড়বাবুর জন্যে নিরামিষ ডাল-ডালনা, অম্বল হবে। তুমি না পারো, একটা উনুন ছেড়ে দাও, আমি এসে রাঁধ্‌চি," ব'লে আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না ক'রে স্নান কর্‌তে চ'লে গেলুম।

স্বামীর বিছানা আমি রোজ নিজের হাতেই কর্‌তুম। এই ধপ্‌ধপে শাদা বিছানাটির উপর ভেতরে ভেতরে আমার যে একটা লোভ জন্মাচ্ছিল, হঠাৎ, এত দিনের পর আজ বিছানা কর্‌বার সময় সে কথা জান্‌তে পেরে নিজের কাছেই যেন লজ্জায় ম'রে গেলুম।

ঘড়ীতে বারোটা বাজ্‌তে তিনি শুতে এলেন। কেন যে এত রাত পর্য্যন্ত জেগে ব'সে বই পড়্‌ছিলুম, তাঁর পায়ের শব্দ সে খবর আজ এমনি স্পষ্ট ক'রে আমার কানে কানে ব'লে দিলে যে, লজ্জায় মুখ তুলে চাইতেও পার্‌লুম না।

স্বামী বল্‌লেন, "এখনো শোওনি যে?"

আমি বই থেকে মুখ তুলে ঘড়ীর পানে তাকিয়ে যেন চম্‌কে উঠ্‌লুম—তাইত, বারোটা বেজে গেছে!

কিন্তু, অন্তর্যামী দেখ্‌ছিলেন, আমি পাঁচ মিনিট অন্তর ঘড়ী দেখেচি।

স্বামী শয্যায় ব'সে একটু হেসে বল্‌লেন, "আজ আবার কি হাঙ্গামা বাধিয়েছিলে?"

বল্‌লুম, "কে বল্‌লে?"

তিনি বল্‌লেন, "সে দিন তোমাকে ত বলেছি, আমি হাত গুণ্‌তে জানি।"

বল্‌লুম, "জান্‌লে ভালই। কিন্তু, তোমার গোয়েন্দার নাম না বল, তিনি কি কি দোষ আমার দিলেন শুনি?"

তিনি বল্‌লেন, "গোয়েন্দা দোষ দেয়নি, আমি দিচ্চি। আচ্ছা, জিজ্ঞেসা করি, এত অল্পে তোমার এত রাগ হয় কেন?"

বল্‌লুম, "অল্প? তুমি কি ভাবো, তোমাদের ন্যায়-অন্যায়ের বাটখারা দিয়েই সকলের ওজন চল্‌বে? কিন্তু তা'ও বল্‌চি; তুমি যে এত বল্‌চ, এ অত্যাচার চোখে দেখ্‌লে তোমারও রাগ হ'ত।"

তিনি আবার একটু হাস্‌লেন; বল্‌লেন, "আমি বোষ্টম, আমার ত নিজের উপর অত্যাচারে রাগ কর্‌তে নেই। মহাপ্রভু আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হ'তে বলেছেন, আর, তোমাকেও এখন থেকে তাই হ'তে হবে।"

"কেন, আমার অপরাধ?"

"বৈষ্ণবের স্ত্রী, এই মাত্র তোমার অপরাধ।"

বল্‌লুম, "তা' হ'তে পারে, কিন্তু, গাছের মত অন্যায় সহ্য করা আমার কাজ নয়, তা সে যে প্রভুই আদেশ করুন। তা ছাড়া যে লোক্ ভগবান্ পর্য্যন্ত মানে না, তার কাছে আবার মহাপ্রভু কি?"

স্বামী হঠাৎ যেন চমকে উঠ্‌লেন; বল্‌লেন, "কে ভগবান্ মানে না? তুমি?"

বল্‌লুম, "হাঁ, আমি।"

তিনি বল্‌লেন, "ভগবান্ মান না কেন?"

বল্‌লুম, "নেই ব'লে মানিনে। মিথ্যে ব'লে মানিনে।"

আমি লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌ছিলুম, আমার স্বামীর হাসিমুখখানি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আস্‌ছিল, এই কথার পরে সে মুখ একেবারে যেন ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন, "শুনেছিলুম, তোমার মামা না কি নিজেকে নাস্তিক বল্‌তেন—"

আমি মাঝখানেই ভুল শুধ্‌রে দিয়ে বল্‌লুম, "না, তিনি নিজেকে নাস্তিক বল্‌তেন না, agnostic বল্‌তেন।"

স্বামী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেসা কর্‌লেন, "সে আবার কি?"

আমি বল্‌লুম, "agnostic তারা, যারা ঈশ্বর আছেন বা নেই—কোন কথাই বলে না।

কথাটা শেষ না হতেই স্বামী ব'লে উঠলেন, "থাক্ এ সব আলোচনা। আমার সামনে তুমি কোন দিন আর এ কথা মুখে এনো না।"

তবুও তর্ক করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখপানে চেয়ে আর আমার মুখে কথা যোগালো না। ভগবানের ওপর তাঁর অচলা বিশ্বাস আমি জানতুম, কিন্তু, কোন মানুষ যে আর এক জনের মুখ থেকে তাঁর অস্বীকার শুনলে এত ব্যথা পেতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না। এই নিয়ে মামার বস্‌বার ঘরে অনেক তর্ক নিজেও করেচি, অপরকেও করতে শুনেচি, রাগা-রাগি হয়ে যেতে বহুবার দেখেচি, কিন্তু এমন বেদনায় বিবর্ণ হয়ে যেতে কাউকে দেখিনি। আমি নিজেও ব্যথা বড় কম পেলুম না, কিন্তু কোন তর্ক না ক'রে এ ভাবে আমার মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়ায় অপমানে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কিন্তু ভাবি অপমানের পালাটা এর ওপর দিয়েই কেন সে দিন শেষ হ'ল না।

যে মাদুরটা পেতে আমি নীচে শুতুম, সেটা ঘরের কোণে গুটোনো থাকত; আজ কে যে সরিয়ে রেখেছিল, বলতে পারিনে। খুঁজে পাচ্চিনে দেখে তিনি নিজে বিছানা থেকে একটা তোষক তুলে বললেন, "আজ এইটে পেতে শোও। এত রাত্রে কোথা আর খুঁজে বেড়াবে বল!"

তাঁর কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের লেশমাত্র ছিল না। তবুও কথাটা যেন অপমানের শূল হয়ে আমার বুকে বিঁধল। রোজ ত আমি নীচেই শুই। সামান্য একখানা মাদুর পেতে যেমন তেমন ভাবে রাত্রিযাপন করাটাই ত ছিল আমার সব চেয়ে বড় গর্ব্ব। কিন্তু স্বামীর ছোট্ট দুটি কথায় যে আজ আমার সেই গর্ব্ব ঠিক তত বড় লাঞ্ছনায় রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেবে, এ কে ভেবেছিল?

অন্যত্র শোবার উপকরণ স্বামীর হাত থেকেই হাত পেতে নিলুম, কিন্তু, শোবামাত্রই কান্নার ঢেউ যেন আমার গলা পর্য্যন্ত ফেনিয়ে উঠল। জানিনে, তিনি শুনতে পেয়েছিলেন কি না। সকাল হতে না হতেই তাড়াতাড়ি বিছানা তুলে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করচি, তিনি ডেকে বললেন, "আজ এত ভোরে উঠলে যে?"

বললুম, "ঘুম ভেঙে গেল, তাই বাইরে যাচ্চি।"

বললেন, "একটা কথা আমার শুনবে?"

রাগে, অভিমানে সর্ব্বাঙ্গ ভরে গেল, বললুম, "তোমার কথা কি আমি শুনিনে?"

আমার মুখপানে চেয়ে তিনি একটু হেসে বললেন, "শোন; আচ্ছা, তা'হলে কাছে এস, বলি।"

বললুম, "আমি ত কালা নই, এখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পাব।"

"পাবে না গো, পাবে না," ব'লেই তিনি হঠাৎ সুমুখে ঝুঁকে পড়ে আমার

হাতটা ধ'রে ফেল্‌লেন। আমি জোর ক'রে ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পার্‌ব কেন, একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হাত দিয়ে জোর ক'রে আমার মুখ তুলে ধ'রে বল্‌লেন, "যারা ভগবান্ মানে, তারা কি বলে জানো? তারা বলে, স্বামীর কাছে কিছুতে মিথ্যে বল্‌তে নেই।"

আমি বল্‌লুম, "কিন্তু যারা ভগবান্ মানে না, তারা বলে, কারও কাছেই মিথ্যে বল্‌তে নেই।"

স্বামী হেসে বল্‌লেন, "বটে! কিন্তু তাই যদি হয়, অত বড় মিথ্যে কথাটা কাল কি ক'রে মুখে আন্‌লে বল ত? কি ক'রে বল্‌লে, ভগবান্ তুমি মানো না?"

হঠাৎ মনে হ'ল, এত আশা ক'রে বুঝি কেউ কখনো কারও সঙ্গে কথা কয়নি। তাই, বল্‌তে মুখে বাধ্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু, তবু ত পোড়া অহঙ্কার গেল না, ব'লে ফেল্‌লুম, "ভগবান্ মানি বল্‌লেই বুঝি সত্যি কথা বলা হ'ত? আমাকে আট্‌কে রাখ্‌লে কেন? আর কোন কথা আছে?"

তিনি ম্লানমুখে আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "আর একটা কথা—মায়ের কাছে আজ মাপ চেয়ো।"

আমার সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলে উঠ্‌ল; বল্‌লুম, "মাপ চাওয়াটা কি ছেলেখেলা, না, তার কোন অর্থ আছে?"

স্বামী বল্‌লেন, "অর্থ তার এই যে, সেটা তোমার কর্ত্তব্য।"

বল্‌লুম, "তোমাদের ভগবান্ বুঝি বলেন, যে নিরপরাধ, সে গিয়ে অপরাধীর নিকট ক্ষমা চেয়ে কর্ত্তব্য করুক্?"

স্বামী আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার মুখের পানে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে চেয়ে রই-লেন। তার পরে ধীরে ধীরে বল্‌লেন, "ভগবানের নাম নিয়ে তামাসা করতে নেই, এ কথা ভবিষ্যতে কোন দিন আর যেন মনে ক'রে দিতে আমায় না হয়। আমি তর্ক করতে ভালবাসিনে,—মায়ের কাছে মাপ চাইতে না পারো, তাঁর সঙ্গে আর কখনও বিবাদ করতে যেয়ো না।"

বল্‌লুম, "কেন শুন্‌তে পাইনে?"

তিনি বল্‌লেন, "না। নিষেধ করা আমার কর্ত্তব্য, তাই নিষেধ ক'রে দিলুম।" এই ব'লে তিনি বাইরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। আমি আর সইতে পার্‌লুম না, বল্‌লুম, "কর্ত্তব্যজ্ঞানটা তোমাদেরই যদি এত বেশী, সে কি আর কারও নেই? আমিও ত মানুষ, বাড়ীর মধ্যে আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে? তা যদি তোমাদের ভাল না লাগে, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। থাক্‌লেই বিবাদ হবে, এ নিশ্চয় ব'লে দিচ্ছি।"

তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "তা'হলে গুরুজনের সঙ্গে বিবাদ করাই বুঝি তোমার কর্ত্তব্য? সে যদি হয়, যে দিন ইচ্ছে বাপের বাড়ী যাও, আমাদের কোন আপত্তি নেই।"

স্বামী চ'লে গেলেন, আমি সেইখানেই ধপ্‌ ক'রে ব'সে পড়্‌লুম। মুখ দিয়ে শুধু আমার বার হ'ল, 'হায় রে! যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!'

সমস্ত সকালটা যে আমার কি ক'রে কাট্‌ল, সে আমিই জানি। কিন্তু দুপুর বেলা স্বামীর মুখ থেকেই যে কথা শুন্‌লুম, তাতে বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

খেতে বসিয়ে শাশুড়ী বল্‌লেন, "কাল তোমাকে বলিনি বাছা, কিন্তু এ বউ নিয়ে ত আর আমি ঘর কর্‌তে পারিনে ঘনশ্যাম। কাল্‌কের কাণ্ড ত শুনেচ?"

স্বামী বল্‌লেন, "শুনেচি মা!"

শাশুড়ী বল্‌লেন, "তা হ'লে যা হোক, এর একটা ব্যবস্থা কর।"

স্বামী একটুখানি হেসে বল্‌লেন, "ব্যবস্থা করার মালিক ত তুমি নিজেই মা।"

শাশুড়ী বল্‌লেন, "তা কি আর পারিনে বাছা, একদিনেই পারি। এত বড় ধাড়ি মেয়ে আমার ত বিয়ে দিতেই ইচ্ছে ছিল না। শুধু—"

স্বামী বল্‌লেন, "সে কথা ভেবে আর লাভ কি মা? আর ভালমন্দ যাই হোক্‌, বাড়ীর বড় বৌকে ত আর ফেল্‌তে পার্‌বে না! ও চায় আমি একটু ভালো খাই-দাই। তা, সে ব্যবস্থাই কেন ক'রে দাও না মা!"

শাশুড়ী বল্‌লেন, "অবাক্‌ কর্‌লি ঘনশ্যাম। আমি কি ভালমন্দ খেতে দিতে জানিনে যে, আজ ও এসে আমাকে শিখিয়ে দেবে? আর তোমারই বা দোষ কি বাবা? অত বড় বৌ যে দিন ঘরে এসেচে, সেই দিনই জান্‌তে পেরেচি, সংসার এবার ভাঙ্‌ল। তা বাছা, আমার গিন্নীপনায় আর না যদি চলে, ওঁর হাতেই না হয় ভাঁড়ারের চাবি দিচ্চি। কৈ গো, বড় বউমা, বেরিয়ে এসো গো, চাবি নিয়ে যাও—" ব'লে শাশুড়ী ঝনাৎ ক'রে চাবির গোছাটা রান্নাঘরের দাওয়ার ওপর ফেলে দিলেন।

স্বামী আর একটি কথাও কইলেন না; মুখ বুজে ভাত খেয়ে বাইরে যাবার সময় বল্‌তে বল্‌তে গেলেন, "সব মেয়েমানুষেরই ঐ এক রোগ, কাকেই বা কি বলি!"

আমার বুকের মধ্যে যেন আহ্লাদের জোয়ার ডেকে উঠ্‌ল। আমি কেন যে ঝগড়া করেচি, তা' উনি জান্‌তে পেরেছেন, এই কথাটা শতবার মুখে আবৃত্তি ক'রে সহস্র রকমে মনের মধ্যে অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লুম। সকালের সমস্ত ব্যথা আমার যেন ধুয়ে মুছে গেল।

এখন কতবার মনে হয়, ছেলেবেলা থেকে কাজের অকাজের কত বই প'ড়ে কত কথাই ত শিখেছিলুম, কিন্তু এ কথাটা কোথাও যদি শিখ্‌তে পেতুম, পৃথিবীতে তুচ্ছ

একটি কথা গুছিয়ে না বল্‌বার দোষে, ছোট্ট একটি কথা মুখ ফুটে না বলবার অপরাধে, কত শত ঘর-সংসারই না ছার-খার হয়ে যায়। হয় ত, তা'হলে এ কাহিনী লেখ্‌বার আজ আবশ্যকই হ'ত না।

তাই ত বলি ওরে হতভাগী! এত শিখেছিলি, এটা শুধু শিখিস্‌নি, মেয়েমানুষের কার মানে মান! কার হতাদরে তোদের মানের অট্টালিকা তাসের অট্টালিকার মতই এক নিমিষে একটা ফুঁয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায়!

তবে, তোর কপাল পুড়্‌বে না ত আর পুড়্‌বে কার! সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা ঘরে খিল দিয়ে যদি সাজ-সজ্জাই কর্‌লি, অসময়ে ঘুমের ভান ক'রে যদি স্বামীর পালঙ্কের একধারে গিয়ে শুতেই পার্‌লি, তাঁকে একটা সাড়া দিতেই কি তোর এমন কণ্ঠরোধ হ'ল? তিনি ঘরে ঢুকে দ্বিধায়, সঙ্কোচে বার বার ইতস্ততঃ ক'রে যখন বেরিয়ে গেলেন, একটা হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতটা ধ'রে ফেল্‌তেই কি তোর হাতে পক্ষাঘাত হ'ল? সেই ত সারারাত্রি ধ'রে মাটীতে প'ড়ে প'ড়ে কাঁদ্‌লি, একবার মুখ ফুটে বল্‌তেই কি শুধু এত বাধা হ'ল যে, আচ্ছা, তুমি তোমার বিছানাতে এসে শোও, আমি আমার ভূমি-শয্যাতেই না হয় ফিরে যাচ্চি।

অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, মনে হ'ল যেন জ্বর হয়েচে। উঠে বাইরে যাচ্চি, স্বামী এসে ঘরে ঢুক্‌লেন। আমি মুখ নীচু ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম, তিনি বল্‌লেন, "তোমাদের গ্রামের নরেন বাবু এসেছেন।"

বুকের ভেতরটায় ধক্‌ ক'রে উঠ্‌ল।

স্বামী বল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমাদের নিখিলের তিনি কলেজের বন্ধু। চিতোর বিলে হাঁস শীকার কর্‌বার জন্যে কলকাতায় থাক্‌তে সে বুঝি কবে নেমন্তন্ন ক'রে এসেছিল, তাই এসেছেন। তুমিও ত তাঁকে বেশ চেনো, না?"

উঃ—মানুষের স্পর্দ্ধার কি একটা সীমা থাক্‌তেও নেই!

ঘাড় নেড়ে জানালুম, আছে। কিন্তু, ঘৃণায় লজ্জায় নখ থেকে চুল পর্য্যন্ত আমার তেতো হয়ে গেল।

স্বামী বল্‌লেন, "তোমার প্রতিবেশীর আদর-যত্নের ভার তোমাকেই নিতে হবে।"

শুনে এম্‌নি চম্‌কে উঠ্‌লুম যে, ভয় হ'ল, হয় ত আমার চমকটা তাঁর চোখে পড়েচে। কিন্তু এদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। বল্‌লেন, "কাল রাত্রি থেকেই মায়ের বাতটা ভয়ানক বেড়েচে। এ দিকে নিখিলও বাড়ী নেই, অখিলকেও তার আফিস কর্‌তে হবে।"

মুখ নীচু কোরে কোন মতে বল্‌লুম, "তুমি?"

"আমার কিছুতে থাক্‌বার জো নেই। রায়গঞ্জে পাট কিন্‌তে না গেলেই নয়।"

"কখন্ ফিরবে ?"

"ফিরতে আবার কা'ল এই সময়। রাত্রিটা সেখানেই থাকতে হবে।"

"তা হ'লে আর কোথাও তাঁকে যেতে বল। আমি বউ-মানুষ, শ্বশুরবাড়ীতে তাঁর সাম্‌নে বা'র হ'তে পারব না।"

স্বামী বল্লেন, "ছি, তা কি হয়! আমি সমস্ত ঠিক ক'রে দিয়ে যাচ্চি, তুমি সাম্‌নে না বা'র হও, আড়াল থেকে গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ো।" এই ব'লে তিনি বাইরে চ'লে গেলেন।

সেই দিন পাঁচমাস পরে আবার নরেনকে দেখ্‌লুম। দুপুরবেলা সে খেতে বসেছিল, আমি রান্নাঘরের দোরের আড়ালে ব'সে কিছুতেই চোখের কৌতূহল থামাতে পারলুম না। কিন্তু চাইবামাত্রই আমার সমস্ত মনটা এমন একপ্রকার বিতৃষ্ণায় ভ'রে গেল যে, সে পরকে বোঝানো শক্ত। মস্ত একটা তেঁতুলবিছে এঁকে-বেঁকে চ'লে যেতে দেখ্‌লে সর্ব্বাঙ্গ যেমন কোরে ওঠে, অথচ যতক্ষণ সেটা দেখা যায়, চোখ ফিরুতে পারা যায় না, ঠিক তেম্‌নি কোরেই আমি নরেনের পানে চেয়ে রইলুম। ছি ছি, ওর ওই দেহটাকে কি কোরে যে একদিন ছুঁয়েচি, মনে পড়্‌তেই সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়ে মাথার চুল পর্য্যন্ত আমার খাড়া হয়ে উঠ্‌ল।

খেতে খেতে সে মাঝে মাঝে চোখ তুলে চারিদিকে কি খুঁজ্‌ছিল, সে আমি জানি। আমাদের রাঁধুনী কি একটা তরকারি দিতে গেলে, সে হঠাৎ যেন ভারি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেসা কর্‌লে, "হাঁ গা, তোমাদের বড় বৌ যে বড় বেরুলো না ?"

রাঁধুনী জান্‌ত যে, ইনি আমাদের বাপের বাড়ীর লোক—গ্রামের জমিদার। তাই বোধ করি খুসী কর্‌বার জন্মই হাসির ভঙ্গীতে একঝুড়ি মিথ্যে কথা ব'লে তার মন জোগালে। বল্‌লে, "কি জানি বাবু, বড় বৌমার ভারি লজ্জা—নইলে, তিনিই ত আপনার জন্যে আজ নিজে রাঁধ্‌লেন। রান্নাঘরে ব'সে তিনিই ত আপনার সব খাবার এগিয়ে গুছিয়ে দিচ্চেন। লজ্জা কোরে কিন্তু কম-যম খাবেন না বাবু, তা'হলে তিনি বড্ড রাগ কর্‌বেন, আমাকে ব'লে দিলেন।"

মানুষের সয়তানীর অন্ত নেই, দুঃসাহসেরও অবধি নেই। সে স্বচ্ছন্দে স্নেহের হাসিতে মুখখানা রান্নাঘরের দিকে তুলে চেঁচিয়ে বল্‌লে, "আমার কাছে তোর আবার লজ্জা কি রে সদু ? আয় আয়, বেরিয়ে আয়। অনেক দিন দেখিনি, একবার দেখি।"

কাঠ হয়ে সেই দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার মেজ জা'ও রান্নাঘরে ছিল, ঠাট্টা ক'রে বল্‌লে, "দিদির সবতাতেই বাড়াবাড়ি। পাড়ার লোক, ভাইয়ের মত— বিয়ের দিন পর্য্যন্ত সাম্‌নে বেরিয়েচ, কথা কয়েচ, আর আজই যত লজ্জা ? একবার দেখ্‌তে চাচ্চেন, যাও না।"

এর আর জবাব দেব কি ?

বেলা তখন দুটো আড়াইটে, বাড়ীর সবাই যে যার ঘরে শুয়েচে, চাকরটা এসে বাইরে থেকে বললে, "বাবু পান চাইলেন মা।"

"কে বাবু ?"

"নরেন বাবু।"

"তিনি শীকার করতে যান্‌নি ?"

"কই না, বৈঠকখানায় শুয়ে আছেন যে।"

তা'হলে শীকারের ছলটাও মিথ্যে !

পান পাঠিয়ে দিয়ে জানালায় এসে বস্‌লুম। এ বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত এই জানালাটিই ছিল আমার সব চেয়ে প্রিয়। নীচেই ফুল বাগান, এক ঝাড় চামেলী ফুলের গাছ দিয়ে সম্মুখটা ঢাকা; এখানে বস্‌লে বাইরের সমস্ত দেখা যায়; কিন্তু বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।

আমি মানুষের মনের এই বড় একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখি, যে বিপদটা হঠাৎ তার ঘাড়ে এসে পোড়ে তাকে একান্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন ক'রে দিয়ে যায়, অনেক সময়ে সে তাকেই একপাশে ঠেলে দিয়ে একটা তুচ্ছ কথা চিন্তা করতে ব'সে যায়। বাইরে পান পাঠিয়ে দিয়ে আমি নরেনের কথাই ভাব্‌তে বসেছিলুম সত্যি, কিন্তু, কখন্ কোন্ ফাঁকে যে আমার স্বামী এসে আমার সমস্ত মন জুড়ে ব'সে গিয়েছিলেন, সে আমি টেরও পাইনি।

আমার স্বামীকে আমি যত দেখ্‌ছিলুম, ততই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিলুম। সব চেয়ে আশ্চর্য্য হতুম—তাঁর ক্ষমা কর্‌বার ক্ষমতা দে'খে। আগে আগে মনে হ'ত, এ তাঁর দুর্ব্বলতা, পুরুষত্বের অভাব। শাসন কর্‌বার সাধ্য নেই ব'লেই ক্ষমা করেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল, ততই টের পাচ্ছিলেম, যেমন বুদ্ধিমান্, তেমনি দৃঢ়। আমাকে যে তিনি ভেতরে ভেতরে কত ভালবেসেচেন, সে'ত আমি অসংশয়ে অনুভব কর্‌তে পারি, কিন্তু, সে ভালবাসার ওপর এতটুকু জোর খাটাবার সাহস আমার ত হয় না।

একদিন কথায় কথায় বলেছিলুম, "আচ্ছা, তুমিই ত বাড়ীর সর্ব্বস্ব, কিন্তু, তোমাকে যে বাড়ীশুদ্ধ সবাই অযত্ন অবহেলা করে, এমন কি, অত্যাচার করে, এ কি তুমি ইচ্ছে কর্‌লে শাসন ক'রে দিতে পার না ?" তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "কৈ, কেউ ত অযত্ন করে না।" কিন্তু আমি নিশ্চয় জানতুম, কিছুই তাঁর অবিদিত ছিল না।

বললুম, "আচ্ছা, যত বড় দোষই হোক্, তুমি কি সব মাপ করতে পারো ?"

তিনি তেম্‌নি হাসিমুখে বল্‌লেন, "যে সত্যি ক্ষমা চায়, তাকে কর্‌তেই হবে—এ যে আমাদের মহাপ্রভুর আদেশ গো।"

তাই এক একদিন চুপ ক'রে ব'সে ভাব্‌তুম, ভগবান্‌ যদি সত্যিই নেই, তা'হলে এত শক্তি, এত শান্তি ইনি পেলেন কোথায়? এই যে আমি স্ত্রীর কর্ত্তব্য এক-দিনের জন্যে করিনে, তবু ত তিনি কোন দিন স্বামীর জোর নিয়ে আমার অমর্য্যাদা অপমান করেন না!

আমাদের ঘরের কুলুঙ্গিতে একটি শ্বেত-পাথরের গৌরাঙ্গমূর্ত্তি ছিল, আমি কত রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখেছি, স্বামী বিছানার উপর স্তব্ধ হয়ে ব'সে একদৃষ্টে তাঁর পানে চেয়ে আছেন, আর দুচক্ষু বয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে যাচ্চে। সময়ে সময়ে তাঁর মুখ দেখে আমারও যেন কান্না আস্‌ত, মনে হ'ত, অম্‌নি ক'রে একটা দিনও কাঁদ্‌তে পার্‌লে বুঝি মনের অর্দ্ধেক বেদনা ক'মে যাবে। পাশের কুলুঙ্গিতে তাঁর খানকয়েক বড় আদরের বই ছিল, তাঁর দেখাদেখি আমিও মাঝে মাঝে পড়্‌তুম। লেখাগুলো যে আমি সত্যি ব'লে বিশ্বাস কর্‌তুম, তা নয়, তবুও, এমন কত দিন হয়েছে, কখন পড়ায় মন লেগে গেছে, কখন্‌ বেলা বয়ে গেছে, কখন্‌ দু ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে গালের ওপর শুকিয়ে আছে, কিছুই ঠাওর পাই নি। কত দিন হিংসে পর্য্যন্ত হয়েচে, তাঁর মত আমিও যদি এগুলি সমস্ত সত্যি ব'লেই ভাব্‌তে পার্‌তুম!

কিছু দিন থেকে আমি বেশ টের পেতুম, কি একটা ব্যথা যেন প্রতিদিনই আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে উঠ্‌ছিল। কিন্তু কেন, কিসের জন্তে, তা' কিছুতে হাত্‌ড়ে পেতুম না। শুধু মনে হ'ত, আমার যেন কেউ কোথাও নেই। ভাব্‌তুম, মায়ের জন্তেই বুঝি ভেতরে ভেতরে মন কেমন করে, তাই কত দিন ঠিক করেচি, কালই পাঠিয়ে দিতে বোল্‌ব, কিন্তু যাই মনে হ'ত, এই ঘরটি ছেড়ে আর কোথাও যাচ্চি, অম্‌নি সমস্ত সংকল্প কোথায় যে ভেসে যেত, তাঁকে মুখ ফুটে বলাও হ'ত না।

মনে কর্‌লুম, যাই, কুলুঙ্গি থেকে বইখানা এনে একটু পড়ি। আজকাল এই বইখানি হয়েছিল আমার অনেক দুঃখের সান্ত্বনা। কিন্তু, উঠ্‌তে গিয়ে হঠাৎ আঁচলে একটা টান পড়্‌তেই ফিরে চেয়ে নিজের চক্ষুকেই যেন বিশ্বাস হ'ল না। দেখি, আমার আঁচল ধ'রে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে নরেন। একটু হলেই চেঁচিয়ে ফেলে-ছিলুম আর কি! সে কখন্‌ এসেচে, কতক্ষণ এ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই জান্‌তে পারিনি। কিন্তু কি ক'রে যে সে দিন আপনাকে সাম্‌লে ফেলেছিলুম, আমি আজও ভেবে পাইনে। ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেসা কর্‌লুম, "এখানে এসেচ কেন? শীকার কর্‌তে?"

নরেন বল্‌লে, "বোস, বল্‌চি।"

আমি জানালার ওপর ব'সে প'ড়ে বল্‌লুম, "শীকার কর্‌তে যাওনি কেন?"

নরেন বল্‌লে, "ঘনশ্যাম বাবুর হুকুম পাইনি। যাবার সময় ব'লে গেলেন, আমরা বৈষ্ণব, আমাদের বাড়ী থেকে জীবহত্যা করা নিষেধ।"

চক্ষের নিমিষে স্বামি-গর্ব্বে আমার বুকখানা ফুলে উঠ্‌ল। তিনি কোন কর্ত্তব্যই ভোলেন না, সে দিকে তাঁর একবিন্দু দুর্ব্বলতা নেই। মনে মনে ভাব্‌লুম, এ লোকটা দেখে যাক্‌, আমার স্বামী কত বড়!

বল্‌লুম, "তা হ'লে বাড়ী ফিরে গেলে না কেন?"

সে লোকটা গরাদের ফাঁক দিয়ে থপ ক'রে আমার হাতটা চেপে ধ'রে বল্‌লে, "সদু, টাইফয়েড জ্বরে মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে উঠে যখন শুন্‌লাম, তুমি পরের হয়েচ, আর আমার নেই, তখন বার বার ক'রে বল্‌লুম, ভগবান্‌, আমাকে বাঁচালে কেন? তোমার কাছে আমি এইটুকু বয়সের মধ্যে এমন কি পাপ করেচি—যার শাস্তি দেবার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌লে?"

বল্‌লুম, "তুমি ভগবান্‌ মানো?"

নরেন থতমত খেয়ে বল্‌তে লাগল্‌, "না—হাঁ—না, মানিনে—কিন্তু, সে সময়ে কি জানো—"

"থাক্‌ গে,—তার পরে?"

নরেন ব'লে উঠ্‌ল, "উঃ—সে আমার কি দিন, যে দিন শুন্‌লুম, তুমি আমারই আছো,—শুধু নামেই অন্যের, নইলে আমারই চিরকাল, শুধু আমারই। আজও একদিনের জন্যে আর কারও শয্যায় রাত্রি—"

"ছি ছি, চুপ করো, চুপ করো! কিন্তু, কে তোমাকে এ খবর দিলে? কার কাছে শুন্‌লে?"

"তোমাদের যে দাসী ৩/৪ দিন হ'ল বাড়ী যাবার নাম ক'রে চ'লে গেছে, যে—"

"মুক্ত কি তোমার লোক ছিল?" ব'লে জোর ক'রে তা'র হাত ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু, এবারেও সে তেমনি সজোরে ধ'রে রাখ্‌লে। তার চোখ দিয়ে ফোঁটা দুই জলও গড়িয়ে পড়্‌ল। বল্‌লে, "সদু, এম্‌নি কোরেই কি আমাদের জীবনের শেষ হবে? অমন অসুখে না পড়্‌লে আজ কেউ ত আমাদের আলাদা ক'রে রাখ্‌তে পার্‌ত না! যে অপরাধ আমার নিজের নয়, তার জন্যে কেন এত বড় শাস্তি ভোগ কোর্‌ব? লোকে ভগবান্‌, ভগবান্‌ করে, কিন্তু, তিনি সত্যি থাক্‌লে কি বিনাদোষে এত বড় সাজা আমাদের দিতেন? কখনও না। তুমিই বা কিসের জন্যে একজন অজানা-অচেনা, মুখ্যু লোকের—"

"থাক্‌, থাক্‌, ও কথা থাক্‌।"

নরেন চমকে উঠে বল্‌লে, "আচ্ছা থাক্‌। কিন্তু, যদি জান্‌তুম, তুমি সুখে আছ, সুখী হয়েচ, তা হ'লেও হয় ত একদিন মনকে সান্ত্বনা দিতে পার্‌তুম, কিন্তু কোন সম্বলই যে আমার হাতে নেই—আমি বাঁচ্‌ব কি কোরে?"

আবার তার চোখে জল এসে পড়ল। এবার সে আমার হাতটাই টেনে নিয়ে তার চোখের জল মুছে বল্‌লে, "এমন কোন সভ্যদেশ পৃথিবীতে আছে—যেখানে এত বড় অন্যায় হ'তে পারত! মেয়েমানুষ ব'লে কি তার প্রাণ নেই, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে এমন ক'রে তাকে সারাজীবন দগ্ধ করবার সংসারে কার অধিকার আছে? কোন্ দেশের মেয়েরা ইচ্ছে করলে এমন মিথ্যে বিয়ে লাথি মেরে ভেঙে দিয়ে যেখানে খুসী চ'লে যেতে না পারে?"

এ সব কথা আমি সমস্তই জানতুম। আমার মামার ঘরে নব্য যুগের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কোন আলোচনাই বাকি ছিল না। আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন দুল্‌তে লাগ্‌ল। বল্লুম, "তুমি আমাকে কি করতে বল?"

নরেন বল্‌লে, "আমি তোমাকে কোন কথাই বলব না। এইটুকু শুধু জানিয়ে যাবো যে, মরণের গ্রাস থেকে উঠে পর্য্যন্ত আমি এই আজকের দিনের প্রতীক্ষা করেই পথ চেয়ে ছিলুম। তার পরে হয় ত একদিন শুনতে পাবে, যেখান থেকে উঠে এসেচি, তার কাছেই ফিরে চ'লে গেছি। কিন্তু তোমার কাছে এই আমার শেষ নিবেদন রইল, সদু, বেঁচে থাকতে যখন কিছুই পেলুম না, মরণের পরে যেন ঐ চোখের দু ফোঁটা জল পাই। আত্মা ব'লে যদি কিছু থাকে, তার তাতেই তৃপ্তি হবে।"

আমার হাতটা তার হাতের মধ্যেই রইল,—চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। এখন ভাবি, সে দিন যদি ঘুণাগ্রেও জানতুম, মানুষের মনের দাম এই, একে একেবারে উল্টো ধারায় বইয়ে দিতে এইটুকু মাত্র সময়, এতটুকু মাত্র মাল-মসলার প্রয়োজন, তা হ'লে যেমন কোরে হোক্, সে দিন তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমি জানালা বন্ধ ক'রে দিতুম, কিছুতে তার একটা কথাও কানে ঢুক্‌তে দিতুম না। কটা কথা, ক ফোঁটা চোখের জলই বা তার খরচ হয়েছিল? কিন্তু নদীর প্রচণ্ড স্রোতে পাতা শুদ্ধ শর-গাছ যেমন কোরে কাঁপ্‌তে থাকে, তেম্‌নি কোরে আমার সমগ্র দেহটা কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। মনে হ'তে লাগ্‌ল, নরেন যেন কোন অদ্ভুত কৌশলে আমার পাঁচ আঙুলের ভেতর দিয়ে পাঁচশ বিদ্যুতের ধারা আমার সর্ব্বাঙ্গে বইয়ে দিয়ে আমার পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্য্যন্ত অবশ ক'রে আন্‌চে। সে দিন মাঝখানের সেই লোহার গরাদেগুলো যদি না থাকত, আর সে যদি আমাকে কোলে তুলে নিয়ে পালাতো, হয় ত আমি একবার চেঁচাতে পর্য্যন্ত পারতুম না—'ওগো, কে আছ আমায় রক্ষে কর।' দুজনে কতক্ষণ এমন স্তব্ধ হয়ে ছিলুম জানিনে, সে হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল, "সদু?"

"কেন?"

"তুমি ত বেশ জানো, আমাদের মিথ্যে শাস্ত্রগুলো শুধু মেয়েমানুষকে বেঁধে

রাখ্‌বার শেকল মাত্র! যেমন কোরে হোক্, আট্‌কে রেখে তাদের সেবা নেবার ফন্দি! সতীর মহিমা কেবল মেয়েমানুষের বেলা,—পুরুষের বেলায় সব ফাঁকি! আত্মা, আত্মা যে করে, সে কি মেয়েমানুষের দেহে নেই? তার কি স্বাধীন সত্তা নেই? সে কি শুধু এসেছিল পুরুষের সেবাদাসী হবার জন্যে?"

"বউমা, বলি, কথা কি তোমাদের শেষ হবে না বাছা?"

মাথার ওপর বাজ ভেঙে পড়্‌লেও বোধ করি মানুষে এমন কোরে চম্‌কে ওঠে না, আমরা দুজনে যেমন ক'রে চম্‌কে উঠ্‌লুম। নরেন হাত ছেড়ে দিয়ে ব'সে পড়্‌ল, আমি মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লুম, বারান্দায় খোলা জানালার ঠিক সুমুখে দাঁড়িয়ে আমার শাশুড়ী।

বল্‌লেন, "বাছা, এ পাড়ার লোকগুলো ত তেমন সভ্য-ভব্য নয়, অমন কোরে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কান্না-কাটি করতে দেখ্‌লে হয় ত বা দোষের ভেবে নেবে। বলি, বাবুটিকে ঘরে ডেকে পাঠালেই ত দেখ্‌তে শুন্‌তে সব দিকে বেশ হ'ত!"

কি একটা জবাব দিতে গেলুম, কিন্তু মুখের মধ্যে জিভ্‌টা আমার আড়ষ্ট হয়ে রইল—একটা কথাও ফুট্‌ল না।

তিনি একটুখানি হেসে বল্‌লেন, "বল্‌তে ত পারিনে, বাছা, শুধু ভেবেই মরি, বউমাটি কেন আমার এত কষ্ট সয়ে মাটীতে শুয়ে থাকেন! তা' বেশ! বাবুটি নাকি দুপুরবেলা চা খান। চা তৈরিও হয়েচে—একবার মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেসা কর দেখি, বউমা, চায়ের পেয়েলাটা বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দেব, না, ঐ বাগানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খাবেন?"

উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল চেষ্টায় তবে কথা কইতে পার্‌লুম, বল্‌লুম, "তুমি কি রোজ এম্‌নি কোরে আমার ঘরে আড়ি পাতো মা?"

শাশুড়ী মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "না মা, সময় পাই কোথা? সংসারের কাজ ক'রেই ত সার্‌তে পারিনে। এই দেখ না, বাছা, বাতে মর্‌চি, তবু চা তৈরি করতে রান্নাঘরে ঢুক্‌তে হয়েছিল। তা এই ঘরেই না হয় পাঠিয়ে দিচ্চি,—বাবুটির আবার ভারি লজ্জার শরীর, আমি থাক্‌লে হয় ত খাবেন না। তা, যাচ্চি আমি—" ব'লে তিনি ফিক্ ক'রে একটু মুচ্‌কে হেসে চ'লে গেলেন। এম্‌নি মেয়েমানুষের বিদ্বেষ! প্রতিশোধ নেবার বেলায় শাশুড়ী-বধূর মান্য সম্বন্ধের কোন উঁচুনীচুর ব্যবধানই রাখ্‌লেন না।

সেইখানে মেঝের ওপর চোখ বুজে শুয়ে পড়্‌লুম—সর্ব্বাঙ্গ বয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে ঘাম ঝ'রে সমস্ত মাটীটা ভিজে গেল।

শুধু একটা সান্ত্বনা ছিল, আজ তিনি আস্‌বেন না,—আজকার রাত্রিটা অন্ততঃ চুপ্ ক'রে প'ড়ে থাক্‌তে পাবো, তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।

কতবার ভাব্লুম উঠে বসি, কাজকর্ম্ম করি—যেন কিছুই হয় নি,—কিন্তু কিছুতেই পার্লুম না, সমস্ত শরীর যেন থর্ থর্ কর্তে লাগ্লো।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, এ ঘরে কেউ আলো দিতে এল না।

রাত্রি তখন প্রায় আট্টা, সহসা তাঁর গলা বাইরে থেকে কানে আস্তেই বুকের সমস্ত রক্ত-চলাচল যেন একেবারে থেমে গেল। তিনি চাকরকে জিজ্ঞেসা কর্ছিলেন, "বঙ্কু, নরেনবাবু হঠাৎ চ'লে গেলেন কেন রে?" চাকরের জবাব শোনা গেল না। তখন তিনি নিজেই বল্লেন, "খুব সম্ভব শীকার কর্তে বারণ করেছিলুম ব'লে। তা' উপায় কি!" অন্দরে ঢুকতেই, শাশুড়ী ঠাকরুণ ডেকে বল্লেন, "একবার আমার ঘরে এসো ত বাবা!"

তাঁর যে এক মুহূর্ত্ত দেরী সইবে না, সে আমি জান্তুম। তিনি যখন আমার ঘরে এলেন, আমি কিসের একটা প্রচণ্ড নিষ্ঠুর আঘাত প্রতীক্ষা ক'রেই যেন সর্ব্বাঙ্গ কাঠের মত শক্ত ক'রে পড়ে রইলুম, কিন্তু তিনি একটা কথাও বল্লেন না। কাপড়-চোপড় ছেড়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক কর্তে বেরিয়ে গেলেন, যেন কিছুই হয়নি—শাশুড়ী তাঁকে যেন এইমাত্র একটা কথাও বলেন নি। তার পরে যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে তিনি ঘরে শুতে এলেন।

সারা-রাত্রির মধ্যে আমার সঙ্গে একটা কথাও হ'ল না। সকালবেলা সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ প্রাণপণে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুক্তে যাচ্চি, মেজ-জা বল্লেন, "হেঁসেলে তোমার আর এসে কাজ নেই দিদি, আজ আমিই আছি।"

বল্লুম, "তুমি থাক্লে কি আমাকে থাক্তে নেই মেজ্দি?"

"কাজ কি, মা কি জন্যে বারণ ক'রে গেলেন," ব'লে তিনি যে ঘাড় ফিরিয়ে টিপে হাস্তে লাগ্লেন, সে আমি স্পষ্ট টের পেলুম। মুখ দিয়ে আমার একটা কথাও বা'র হ'ল না—আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ফিরে এলুম।

দেখ্লুম, বাড়ীশুদ্ধ সকলের মুখই ঘোর অন্ধকার, শুধু যাঁর মুখ সব চেয়ে অন্ধকার হবার কথা, তাঁর মুখেই কোন বিকার নেই। স্বামীর নিত্য প্রসন্ন-মুখ, আজও তেমনি প্রসন্ন।

হায় রে, শুধু একবার গিয়ে যদি বলি, প্রভু, এই পাপিষ্ঠার মুখ থেকে তার অপরাধের বিবরণ শুনে তাকে নিজের হাতে দণ্ড দাও, কিন্তু, সমস্ত লোকের এই বিচার হীন শাস্তি আর যে সহ্য হয় না! 'কিন্তু সে তো কোন মতেই পার্লুম না। তবুও এই বাড়ীতে এই ঘরের মধ্যেই আমার দিন কাট্তে লাগ্ল।

এ কেমন কোরে আমার দ্বারা সম্ভব হ'তে পেরেছিল, তা আজ আমি জানি। যে কাল মায়ের বুক থেকে পুত্রশোকের ভার পর্য্যন্ত হাল্কা ক'রে দেয়, সে যে এই পাপি-

ঠার মাথা থেকে তার অপরাধের বোঝা লঘু ক'রে দেবে, সে আর বিচিত্র কি ? যে দণ্ড একদিন মানুষ অকাতরে মাথায় তুলে নেয়, আর একদিন তাকেই সে মাথা থেকে ফেল্‌তে পার্‌লে বাঁচে ! কালের ব্যবধানে অপরাধের খোঁচা যত অস্পষ্ট যত লঘু হয়ে আস্‌তে থাকে, দণ্ডের ভার ততই গুরুতর, ততই অসহ্য হয়ে উঠ্‌তে থাকে ! এই ত মানুষের মন ! এই ত তার গঠন ! তাকে অনিশ্চিত সংশয়ে মরিয়া কোরে তোলে। একদিন দুদিন ক'রে যখন সাতদিন কেটে গেল,তখন কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌ল, এতই কি দোষ করেচি যে, স্বামী একটা মুখের কথাও জিজ্ঞেসা না কোরে নির্ব্বিচারে দণ্ড দিয়ে যাবেন ! কিন্তু তিনি যে সকলের সঙ্গে মিলে নিঃশব্দে আমাকে পীড়ন ক'রে যাচ্চেন, এ বুদ্ধি যে কোথায় পেয়েছিলুম, এখন তাই শুধু ভাবি ।

সে দিন সকালে শুন্‌লুম, শাশুড়ী বল্‌চেন, "ফিরে এলি মা মুক্ত ? পাঁচদিন ব'লে কত দিন দেরি কর্‌লি বল্ ত বাছা ?"

সে যে কেন ফিরে এসেচে, তা মনে মনে বুঝ্‌লুম।

নাইতে যাচ্চি, দেখা হ'ল। সে মুচ্‌কে হেসে হাতের মধ্যে একটা কাগজ গুঁজে দিলে। হঠাৎ মনে হ'ল, সে যেন এক টুক্‌রো জ্বলন্ত কয়লা আমার হাতের তেলোয় টিপে ধরেচে। ইচ্ছে হ ল, তখ্‌খুনি কুটি-কুটি কোরে ছিঁড়ে ফেলে দিই। কিন্তু সে যে নরেনের চিঠি ! না পড়েই যদি ছিঁড়ে ফেল্‌তে পার্‌ব, তা হ'লে মেয়েমানুষের মনের মধ্যে বিশ্বের সেই অফুরন্ত চিরন্তন কৌতূহল জমা হয়ে রয়েচে কিসের জন্যে ? নির্জ্জন পুকুরঘাটে জলে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিঠি খুলে বস্‌লুম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কথাও পড়্‌তে পার্‌লুম না। চিঠি লাল কালীতে লেখা। মনে হ'তে লাগ্‌ল, তার রাঙা অক্ষর-গুলো যেন একপাল কেন্নোর বাচ্চার মত গায়ে গায়ে জড়িয়ে কিল্‌-বিল্ ক'রে ন'ড়ে ন'ড়ে বেড়াচ্চে। তার পরে পড়্‌লুম—একবার—দুবার—তিনবার পড়্‌লুম। তার পরে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে স্নান ক'রে ঘরে ফিরে এলুম। কি ছিল তাতে ? সংসারে যা সব চেয়ে বড় অপরাধ, তাই লেখা ছিল।

ধোপা এসে বল্‌লে, "মা ঠাক্‌রুণ, বাবুর ময়লা কাপড় দাও।" জামার পকেটগুলো সব দে'খে দিতে গিয়ে একখানা পোষ্টকার্ড বেরিয়ে এল, হাতে তুলে দেখি, আমার চিঠি, মা লিখেচেন। তারিখ দেখ্‌লুম, পাঁচ দিন আগের, কিন্তু, আজও আমি পাইনি।

প'ড়ে দেখি সর্ব্বনাশ ! মা লিখেচেন, শুধু রান্না ঘরটি ছাড়া আর সমস্তই পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। এই ঘরটির মধ্যে কোন মতে সবাই মাথা গুঁজে আছেন।

দুচোখ জ্বালা কর্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু এক ফোঁটা জল বেরুল না। কতক্ষণ যে এ ভাবে ব'সে ছিলুম জানিনে, ধোপার চীৎকারে আবার সজাগ হয়ে উঠ্‌লুম। তাড়াতাড়ি তাকে কাপড়গুলো ফেলে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়্‌লুম। এইবার

চোখের জলে বালিস ভিজে গেল। কিন্তু এই কি তাঁর ঈশ্বরপরায়ণতা! আমার মা গরীব, একবিন্দু সাহায্য করতে অনুরোধ করি, এই ভয়ে চিঠিখানা পর্য্যন্ত আমাকে দেওয়া হয়নি। এত বড় ক্ষুদ্রতা আমার নাস্তিক মামার দ্বারা কি কখনো সম্ভব হ'তে পারত!

আজ তিনি ঘরে আসতেই কথা কইলুম। বললুম, "আমাদের বাড়ী পুড়ে গেছে?"

তিনি মুখপানে চেয়ে বললেন, "কোথায় শুনলে?"

গায়ের ওপর পোষ্টকার্ডখানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে জবাব দিলুম, "ধোপাকে কাপড় দিতে তোমারই পকেট থেকে পেলুম। দেখ, আমাকে নাস্তিক ব'লে তুমি ঘৃণা কর জানি, কিন্তু যারা লুকিয়ে পরের চিঠি পড়ে, আড়ালে গোয়েন্দাগিরি ক'রে বেড়ায়, তাদের আমরাও ঘৃণা করি। তোমার বাড়ীশুদ্ধ লোকেরই কি এই ব্যবসা?"

যে লোক নিজে অপরাধে মগ্ন হয়ে আছে, তার মুখের এই কথা! কিন্তু আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি, এত বড় আঘাত আমার স্বামী ছাড়া আর কেউ সহ্য করতে পারত না। মহাপ্রভুর শাসন কি অক্ষয়-কবচের মতই যে, তাঁর মনটিকে অহর্নিশ ঘিরে রক্ষে করত, আমার এমন তীক্ষ্ণ শূলও খান্ খান্ হয়ে চূর্ণ হয়ে প'ড়ে গেল।

একটুখানি ম্লান হেসে বললেন, "কেমন অন্যমনস্ক হয়ে প'ড়ে ফেলেছিলুম, সদু, আমাকে মাপ কর।"

এই প্রথম তিনি আমার নাম ধ'রে ডাকলেন।

বললুম, "মিথ্যে কথা। তা' হলে আমার চিঠি আমাকে দিতে। কেন এ খবর লুকিয়েচ, তাও জানি।"

তিনি বললেন, "শুধু দুঃখ পেতে বই ত না। তাই ভেবেছিলুম, কিছুদিন পরে তোমাকে জানাবো।"

বললুম, "কেমন ক'রে তুমি হাত গোণো, সে আমার জানতে বাকি নেই। তুমিই কি বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে আমার পেছুনে গোয়েন্দা লাগিয়েচ? স্পাই! ইংরেজ মহিলারা এমন স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখে না, তা জানো?"

ওরে হতভাগী! বল্, বল্, যা' মুখে আসে, ব'লে নে। শাস্তি তোর গেছে কোথায়, সবই যে তোলা রইল।

স্বামী স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন,—একটা কথারও জবাব দিলেন না। এখন ভাবি, এত ক্ষমা করতেও মানুষে পারে!

কিন্তু আমার ভেতরে যত গ্লানি, যত অপমান এত দিন ধীরে ধীরে জমা হয়ে উঠেছিল, একবার মুক্তি পেয়ে তারা কোন মতেই আর ফিরতে চাইলে না।

একটু থেমে আবার বললুম, "আমি হেঁসেলে ঢুকতে—"

তিনি একটুখানি যেন চমকে উঠে মাঝখানেই ব'লে উঠ্‌লেন, "উঃ, তাই বটে! তাই আমার খাবার ব্যবস্থাটা আবার—"

বল্লুম, "সে নালিশ আমার নয়। বাঙালীর ঘরে জন্মেচি ব'লেই যে তোমরা খুঁচে খুঁচে আমাকে তিল তিল ক'রে মার্‌বে, সে অধিকার তোমাদের আমি কিছুতে দেব না, তা' নিশ্চয় জেনো। আমার মামার বাড়ীতে এখনো ত রান্না-ঘরটা বাকী আছে, আমি তার মধ্যেই আবার ফিরে যাবো। কাল আমি যাচ্ছি।"

স্বামী অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে বল্লেন, "যাওয়াই উচিত বটে। কিন্তু, তোমার গয়নাগুলো রেখে যেয়ো।"

শুনে অবাক্ হয়ে গেলুম। এত হীন, এত ছোট স্বামীর স্ত্রী আমি! পোড়া মুখে হঠাৎ হাসি এলো। বল্লুম, "সেগুলো কেড়ে নিতে চাও ত? বেশ, আমি রেখেই যাবো।"

প্রদীপের ক্ষীণ আলোতেও স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম, তাঁর মুখখানি যেন শাদা হয়ে গেল। বল্লেন, "না না, তোমার কিছু গয়না আমি ভিক্ষে চাচ্ছি। আমার টাকার বড় অনাটন, তাই বাঁধা দেবো।"

কিন্তু এম্‌নি পোড়াকপালী আমি যে, ও-মুখ দেখে ও কথাটা বিশ্বেস কর্‌তে পার্‌লুম না। বল্লুম, "বাঁধা দাও, বেচে ফ্যালো, যা' ইচ্ছে কোরো; তোমাদের গয়নার ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই।" ব'লে, তখুনি বাক্স খুলে আমার সমস্ত গয়না বিছানার ওপর ছুড়ে ফেলে দিলুম। যে দুগাছি বালা মা দিয়েছিলেন, সেই দুটি ছাড়া গায়ের সমস্ত গয়নাও খুলে ফেলে দিলুম। তাতেও তৃপ্তি হ'ল না, বেনারসী কাপড়, জামা প্রভৃতি যা কিছু এঁরা দিয়েছিলেন, সমস্ত বার ক'রে ফেলে দিলুম।

স্বামী পাথরের মত স্থির নির্ব্বাক্ হয়ে ব'সে রইলেন। ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা এম্‌নি বিষিয়ে উঠ্‌ল যে, এক ঘরের মধ্যে থাকাও যেন অসহ্য হয়ে পড়্‌ল। বেরিয়ে এসে অন্ধকার বারান্দার একধারে আঁচল পেতে শুয়ে পড়্‌লুম। মনে হ'ল, দোরের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে গেল।

কান্নায় বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল, তবু প্রাণপণে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে মান বাঁচালুম।

কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানিনে, উঠে দেখি ভোর হয়। ঘরে গিয়ে দেখি, বিছানা খালি, দু'একখানি ছাড়া প্রায় সমস্ত গয়নাই নিয়ে তিনি কখন্ বেরিয়ে গেছেন।

সারাদিন তিনি বাড়ী এলেন না। রাত্রি বারোটা বেজে গেল, তাঁর দেখা নেই।

তন্দ্রার মধ্যেও বোধ করি সজাগ ছিলুম। রাত্রি দুটোর পর বাগানের দিকের

সেই জানালাটার গায়ে খট্‌-খট্‌ শব্দ শুনেই বুঝ্‌লুম, এ নরেন। কেমন ক'রে যেন আমি নিশ্চয় জানতুম, আজ রাত্রে সে আস্‌বে। স্বামী ঘরে নেই, এ খবর মুক্ত দেবেই, এবং এ সুযোগ সে কিছুতে ছাড়্‌বে না। কোথাও কাছা-কাছি সে যে আছেই, এ যেন আমি ভাবী অমঙ্গলের মত অনুভব করতুম! নরেন এত নিঃসংশয় ছিল যে, সে অনায়াসে বল্‌লে—"দেরি কোরো না, যেমন আছ বেরিয়ে এসো, মুক্ত খিড়কি খুলে দাঁড়িয়ে আছে।"

বাগান পার হয়ে রাস্তা দিয়ে অনেকখানি অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বস্‌লুম। মা বসুমতী! গাড়ী শুদ্ধ হতভাগীকে সে দিন গ্রাস করনি কেন!

কলকাতায় বউবাজারের একটা ছোট্ট বাসায় গিয়ে যখন উঠ্‌লুম, তখন বেলা সাড়ে আটটা। আমাকে পৌঁছে দিয়েই নরেন তার নিজের বাসায় কিছুক্ষণের জন্য চ'লে গেল। দাসী উপরের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছিল, টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে শুয়ে পড়্‌লুম। আশ্চর্য্য যে, যে কথা কখনও ভাবিনি, সমস্ত ভাবনা ছেয়ে সেই কথাই আমার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। আমি ন'বছর বয়সে একবার জলে ডুবে যাই, অনেক যত্ন-চেষ্টার পরে জ্ঞান হ'লে মায়ের হাত ধ'রে ঘরের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। মা শিয়রে ব'সে একহাতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, একহাতে পাখার বাতাস করেছিলেন,—মায়ের মুখ আর তাঁর সেই পাখা নিয়ে হাতনাড়াটা ছাড়া সংসারে আর যেন আমার কিছু রইল না।

দাসী এসে বল্‌লে, "বউমা, কলের জল চ'লে যাবে, উঠে চান ক'রে নাও।"

স্নান ক'রে এলুম, উড়ে বামুন ভাত দিয়ে গেল। মনে হয় কিছু খেয়েও ছিলুম, কিন্তু, উঠ্‌তে না উঠ্‌তে সমস্ত বমি হয়ে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে নির্জ্জীবের মত বিছানায় এসে শুয়ে পড়্‌বামাত্রই বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

স্বপ্ন দেখ্‌লুম, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করচি। তিনি তেম্‌নি নীরবে ব'সে আছেন, আর আমি গায়ের গয়না খুলে খুলে তাঁর গায়ে ছুড়ে ফেল্‌চি; কিন্তু সে গয়নাও আর ফুরোয় না, আমার ছুড়ে ফেলাও থামে না। যত ফেলি, ততই যেন কোথা থেকে গয়নায় সর্ব্বাঙ্গ ভরে ওঠে।

এমন ক'রে কতক্ষণ যে কেটেছিল, আর কতক্ষণ যে কাট্‌তে পার্‌ত, বল্‌তে পারিনে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল নিজের কান্নার শব্দে।

হাতের ভারি অনন্তটা ছুড়ে ফেল্‌তেই সেটা সজোরে গিয়ে তাঁর কপালে লাগ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ বুজে শুয়ে পড়্‌লেন, আর সেই কাটা কপাল থেকে রক্তের ধারা ফিন্‌কি দিয়ে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেক্‌তে লাগ্‌ল।

চেয়ে দেখ্‌লুম, তখনও অনেক বেলা আছে, নরেন পাশে ব'সে আমাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছে।

সে বল্‌লে, "স্বপন দেখ্‌ছিলে? ইস্, চোখের জলে বালিস ভিজে গেছে যে!" বোলে কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছিয়ে দিলে।

স্বপন? এক মুহূর্ত্তে মনটা যেন স্বস্তিতে ভ'রে গেল।

চোখ রোগ্‌ড়ে উঠে ব'সে দেখ্‌লুম, সুমুখেই মস্ত একটা কাগজে মোড়া পার্শ্বেল।

"ও কি?"

"তোমার জামা-কাপড় সব কিনে আন্‌লুম।"

"তুমি কিন্‌তে গেলে কেন?"

নরেন একটু হেসে বল্‌লে, "আমি ছাড়া আর কে কিন্‌বে?"

* * * * * *

* * * * * *

"আচ্ছা, পা ছেড়ে উঠে বোস্ বোন, আমি দিব্যি করচি, আমরা এক মায়ের পেটের ভাই বোন্। তোকে আমি যত ভালই বাসিনে কেন, তবু তোকে আমি আমার কাছ থেকে চিরকাল রক্ষে করব।"

"চিরকাল! না না, তাঁর পায়ের ওপর আমাকে তোমরা ফেলে দিয়ে চ'লে এসো, নরেন দাদা, আমার অদৃষ্টে যা হবার তা' হোক্। কাল সমস্ত রাত্রি তাঁকে চোখে দেখিনি, আজ আবার সমস্ত রাত্রি দেখ্‌তে না পেলে যে আমি ম'রে যাবো ভাই!"

দাসী ঘরে প্রদীপ দিয়ে গেল। নরেন উঠে গিয়ে একটা মোড়ার ওপর ব'সে বল্‌লে, "মুকুর কাছে আমি সমস্তই শুনেচি। কিন্তু তাঁকে যদি এতই ভালবাস্‌তে, কোন দিন এক সঙ্গে ত'—"

তাড়াতাড়ি বল্‌লুম, "তুমি আমার বড় ভাই, এ সব কথা আমাকে তুমি জিজ্ঞেসা কোরো না।"

নরেন খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে বল্‌লে, "আমি আজই তোমাকে তোমাদের বাগানের কাছে রেখে আস্‌তে পারি বোন্, কিন্তু, তিনি কি তোমাকে নেবেন? তখন গ্রামের মধ্যে তোমার কি দুর্গতি হবে বল ত?"

বুকের ভেতরটা কে যেন দুহাতে পাকিয়ে মুচ্‌ড়ে দিলে, কিন্তু, তখ্‌খুনি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লুম, "ঘরে নেবেন না, সে জানি, কিন্তু, তিনি যে আমাকে মাপ কর্‌বেন, তাতে ত কোন সন্দেহ নেই। যত বড় অপরাধ হোক্, সত্যি সত্যি

মাপ চাইলে তাঁর না বল্‌বার জো নেই, এ যে আমি তাঁর মুখেই শুনেচি, ভাই! আমাকে তুমি তাঁর পায়ের তলায় রেখে এসো, নরেন দা, ভগবান্ তোমাকে রাজ্যেশ্বর কর্‌বেন, আমি কায়মনে বল্‌চি।"

মনে করেছিলুম, আর চোখের জল ফেল্‌বো না, কিন্তু কিছুতে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লুম না, ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল। নরেন মিনিটখানেক চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "সদু, তুমি কি সত্যিই ভগবান্ মানো?"

আজ চরম দুঃখে মুখ দিয়ে পরম সত্য বার হয়ে গেল; বল্‌লুম, "মানি। তিনি আছেন বলেই ত এত ক'রেও ফিরে যেতে চাইচি। নইলে, এইখানে গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌তুম, নরেন দাদা, ফিরে যাবার কথা মুখে আন্‌তুম না।"

নরেন বল্‌লে, "কিন্তু, আমি ত মানিনে।"

তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌লুম, "আমি বল্‌চি, আমার মত তুমিও একদিন নিশ্চয় মান্‌বে।"

"সে তখন বোঝা যাবে" ব'লে নরেন গম্ভীর মুখে ব'সে রইল। মনে মনে কি যেন ভাব্‌চে বুঝ্‌তে পেরে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লুম। আমার এক মিনিট দেরী সইছিল না, বল্‌লুম, "আমাকে কখন্ রেখে আস্‌বে নরেন দাদা?"

নরেন মুখ তুলে ধীরে ধীরে বল্‌লে, "সে কখ্‌খনো তোমাকে নেবে না।"

"সে চিন্তা কেন কর্‌চ ভাই? নিন্ না নিন্, সে তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু, আমাকে তিনি ক্ষমা কর্‌বেন, এ কথা নিশ্চয় বল্‌তে পারি।"

"ক্ষমা! না নিলে ক্ষমা করা, না করা দুই-ই সমান। তখন তুমি কোথায় যাবে বল ত? সমস্ত পাড়ার মধ্যে কত বড় একটা বিশ্রী হৈ-চৈ গণ্ডগোল প'ড়ে যাবে, একবার ভেবে দেখ দিকি!"

ভয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্‌লুম, "সে ভাব্‌না তুমি এতটুকু কোরো না নরেন দাদা! তখন তিনিই আমার উপায় কোরে দেবেন।"

নরেন আবার কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বল্‌লে, "আর তোমারই না হয় একটা উপায় কর্‌বেন, কিন্তু আমার ত কর্‌বেন না! তখন?"

এ কথার কি যে জবাব দেব, ভেবে পেলুম না। বল্‌লুম, "তাতেই বা তোমার ভয় কি?"

নরেন ম্লানমুখে জোর ক'রে একটু হেসে বল্‌লে, "ভয়? এমন কিছু নয়, ৫।৭ বছরের জন্তে জেল খাট্‌তে হবে। শেষকালে এমন কোরে তুমি আমাকে ডোবাবে জান্‌লে আমি এতে হাতই দিতুম না। মনের এতটুকু স্থির নেই, এ কি ছেলেখেলা?"

আমি কেঁদে ফেলে বল্লুম, "তবে আমার উপায় কি হবে ভাই? আমার সমস্ত অপরাধ তাঁর পায়ে নিবেদন না কোরে ত আমি কিছুতে বাঁচ্‌ব না!"

নরেন দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, "তুমি শুধু নিজের কথাই ভাব্‌চ, আমার বিপদ্‌ ত ভাবচ না? এখন সব দিক্‌ না বুঝে আমি কোন কাজ করতে পারব না।"

"ও কি, তুমি কি বাসায় যাচ্চ না কি?"

"হুঁ।"

রাগে, দুঃখে, হতাশ্বাসে আমি মাটীতে লুটিয়ে প'ড়ে মাথা কুটে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লুম, "তুমি সঙ্গে না যাও, এইখান থেকে আমার যাবার উপায় ক'রে দাও,আমি একলা ফিরে যাবো। ওগো, আমি তাঁর দিব্যি কোরে বল্‌চি, আমি কারুর নাম করব না—কাউকে বিপদে জড়াবো না, সমস্ত শাস্তি একা মাথা পেতে নেব। তোমার দুটি পায়ে পড়ি নরেন দা, আমাকে আটকে রেখে আমার আর সর্ব্বনাশ কোরো না।"

মুখ তুলে দেখি, ঘরে সে নেই—পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে সদর-দরজায় দেখি, তালা বন্ধ। উড়ে বামুন বল্লে, "বাবু চাবি নিয়ে চ'লে গেছেন, কাল সকালে এসে খুলে দেবেন।"

ঘরে ফিরে এসে আর একবার মাটীর ওপর লুটিয়ে প'ড়ে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লুম, "ভগবান্‌! কখনো তোমাকে ডাকিনি, আজ ডাক্‌চি, তোমার এই একান্ত নিরুপায় মহাপাপিষ্ঠা সন্তানের গতি ক'রে দাও!"

আমার সে ডাক যে কত প্রচণ্ড, তার শক্তি যে কি দুর্নিবার, আজ সে শুধু আমিই জানি।

তবু সাত দিন কেটে গেল। কিন্তু, কেমন কোরে যে কাট্‌ল, সে ইতিহাস বল্‌বার আমার সামর্থ্যও নেই, ধৈর্য্যও নেই। সে যাক্‌।

বিকেলবেলায় আমার ওপরের ঘরের জানালায় ব'সে নীচে গলির পানে তাকিয়ে ছিলুম। আফিসের ছুটি হয়ে গেছে—সারাদিনের খাটুনির পর বাবুরা বাড়ীমুখো—হন্‌ হন্‌ কোরে চলেচে। অধিকাংশই সামান্য গৃহস্থ। তাদের বাড়ীর ছবি আমার চোখের ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠ্‌ল। বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে এখন সব চেয়ে কারা যে বেশি ব্যস্ত, জলখাবার সাজাতে, চা তৈরি করতে সব চেয়ে যারা বেশি ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্চে, সেটা মনে হতেই বুকের ভেতরটা ধক্‌ কোরে উঠ্‌ল। মনে পড়্‌ল, তিনিও সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরে এলেন। কোথায় কাপড়, কোথায় গামছা, কোথায় জল! ডাকা-ডাকির পর কেউ হয় ত সাড়াও দিলে না। তার পরে, হয়ত, মেজ দেওরের খাবারের সঙ্গে তাঁরও একটুখানি জল-খাবারের জোগাড় মেজ বৌ ক'রে রেখেচে, না হয় ভুলেই গেছে! আমি ত আর নেই,—ভুলতে ভয়ই বা কি!

হয় ত বা শুধু এক গেলাস জল চেয়ে খেয়ে ময়লা বিছানাটা কোঁচা দিয়ে একটু ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেন! তার পরে রাত দুপুরে ছুটো শুক্‌নো— ঝর্‌ঝরে ভাত, আর একটু ভাতে পোড়া। ও-বেলার একটুখানি ডাল হয় ত বা আছে, হয় ত বা উঠে গেছে। সকলের দিয়ে থুয়ে দুধ একটু বাঁচে ত সে পরম ভাগ্য! নিরীহ ভাল মানুষ, কাউকে কড়া কথা বল্‌তে পারেন না, কারো ওপর রাগ দেখাতে জানেন না—

ওরে মহাপাতকী! এত বড় নিষ্ঠুর মহাপাপ তোর চেয়ে বেশি সংসারে কেউ কি কোন দিন করেছে? ইচ্ছে হ'ল, এই লোহার গরাদেতে মাথাটা ছেঁচে ফেলে সমস্ত ভাবনা-চিন্তের এইখানেই শেষ ক'রে দিই।

বোধ করি, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন দিকেই চোখ ছিল না, হঠাৎ কড়ানাড়ার শব্দে চম্‌কে উঠে দেখি, সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে নরেন আর মুক্ত। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে নীচের বিছানায় উঠে এসে বস্‌লুম। সেই দিন থেকে নরেন আর আসেনি। আমার সমস্ত মন যে কোথায় প'ড়ে আছে, সে নিঃসংশয়ে বুঝ্‌তে পেরেছিল ব'লে ভয়ে এ দিক্ মাড়াত না। তার নিশ্চয় ধারণা জন্মেছিল, বিপদে পড়্‌লে স্বামীর বিরুদ্ধে আমি তার কোন উপকারেই লাগ্‌ব না। তাই তার ভয়ও যেমন হয়েছিল, রাগও তেমনি হয়েছিল। ঘরে ঢুকে আমার দিকে চেয়েই দু'জনে একসঙ্গে চম্‌কে উঠ্‌ল, নরেন বল্‌লে—

"তোমার এত অসুখ করেছিল ত আমাকে খবর দাওনি কেন? তোমার বামুনটা ত আমার বাসা চেনে?"

ঝি দালানে ঝাঁট দিচ্ছিল, সে খপ্ কোরে ব'লে বস্‌ল, "অসুখ কর্‌বে কেন? শুধু জল খেয়ে থাক্‌লে মানুষ রোগা হবে না বাবু? দু'টি বেলা দেখ্‌চি, ভাতের থালা যেমন বাড়া হয়, তেম্‌নি প'ড়ে থাকে। অর্দ্ধেক দিন ত হাতও দেন না।" শুনে দুজনেই স্তব্ধ হয়ে আমার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যার পর নরেন বাসায় চ'লে গেলে মুক্তকে বুকে টেনে নিয়ে বল্‌লুম, "কেমন আছেন তিনি?"

মুক্ত কেঁদে ফেল্‌লে। বল্‌লে, "অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই বউ মা, নইলে এমন সোনার সোয়ামীর ঘর কর্‌তে পেলে না?"

"তুই ত ঘর কর্‌তে দিলিনে মুক্ত!"

মুক্ত চোখ মুছে বল্‌লে, "মনে হ'লে বুকের ভেতরটায় যে কি কর্‌তে থাকে, সে আর তোমাকে কি বোল্‌ব? বাবু ছাড়া আজও সবাই জানে, তুমি বাড়ী পোড়ার খবর পেয়ে রাত্তিরেই রাগারাগি ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেছ। তোমার শাশুড়ী ত তাঁর হুকুম নেওয়া হয় নি ব'লে রাগ কোরে তাঁর সঙ্গে কথা-

ঝার্ঠাই বন্ধ ক'রে দিয়েচে। মাগী কি বজ্জাত, মা, কি বজ্জাত! যে কষ্টটা বাবুকে দিচ্ছে, দেখ্‌লে পাষাণের দুঃখ হয়! সাধে কি আর তুমি ঝগড়া কর্‌তে বউ মা!"

"ঝগড়া করা আমার চিরকালের জন্য ঘুচে গেছে!" বল্‌তে গিয়ে সত্যি সত্যি যেন দম্ আট্‌কে এলো।

আজ মুক্তর কাছে শুন্‌তে পেলুম, আমাদের পোড়া বাড়ী আবার মেরামত হচ্চে, তিনি টাকা দিয়েছেন। হয় ত সেই জন্তই আমার গহনাগুলো হঠাৎ বাঁধা দেবার তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল।

বল্‌লুম, "বল্ মুক্ত, সব বল্। যত রকমের বুক-ফাটা খবর আছে, সমস্ত আমাকে একটি একটি কোরে শোনা—এতটুকু দয়া তোরা আমাকে করিস্ নে।"

মুক্ত বল্‌লে, "এ বাড়ীর ঠিকানা তিনি জানেন—"

শিউরে উঠে বল্‌লুম, "কি কোরে?"

"মাসখানেক আগে যখন এ বাড়ী তোমার জন্তেই ভাড়া নেওয়া হয়, তখন আমি জান্‌তুম।"

"তার পর?"

"একদিন নদীর ধারে নরেন বাবুর সঙ্গে আমাকে লুকিয়ে কথা কইতে তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন।"

"তার পর?

"বামুনের পা ছুঁয়ে মিথ্যে বল্‌তে পার্‌লুম না বৌমা,—চ'লে আস্‌বার দিন এ বাসার ঠিকানা ব'লে ফেল্‌লুম।"

এলিয়ে মুক্তর কোলের ওপরই চোক বুজে শুয়ে পড়্‌লুম।

অনেকক্ষণ পরে মুক্ত বল্‌লে, "বউ মা!"

"কেন মুক্ত?"

"যদি তিনি নিজে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসে পড়েন?"

প্রাণপণ বলে উঠে বোসে মুক্তর মুখ চেপে ধর্‌লুম—"না মুক্ত, ও কথা তোকে আমি বল্‌তে দেব না। আমার দুঃখ আমাকে সজ্ঞানে বইতে দে, পাগল কোরে দিয়ে আমার প্রায়শ্চিত্তের পথ তুই বন্ধ ক'রে দিস্‌নে—"

মুক্ত জোর ক'রে তার মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে, "আমাকেও ত প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে বউ মা? টাকার সঙ্গে ত একে ওজন কোরে ঘরে তুল্‌তে পার্‌ব না!"

এ কথার আর জবাব দিলুম না, চোখ বুজে শুয়ে পড়্‌লুম। মনে মনে বল্‌লুম, "ওরে মুক্ত, পৃথিবী এখনও পৃথিবীই আছে। আকাশ-কুসুমের কথা কানেই শোনা যায়, তাকে ফুট্‌তে কেউ আজও চোখে দেখেনি।"

ঘণ্টাখানেক পরে মুক্ত নীচে থেকে ভাত খেয়ে যখন ফিরে এলো, তখন রাত্রি দশটা। ঘরে ঢুকেই বল্‌লে, "মাথায় আঁচলটা তুলে দাও বউ মা, বাবু আস্‌চেন," ব'লেই বেরিয়ে গেল।

আবার এত রাত্রে? তাড়াতাড়ি কাপড় সেরে উঠে বস্‌তেই দেখ্‌লুম, দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে নরেন নয়,—আমার স্বামী।

বল্‌লেন, "তোমাকে কিছুই বল্‌তে হবে না। আমি জানি, তুমি আমারই আছ। বাড়ী চল।"

মনে মনে বল্‌লুম, "ভগবান্! এত যদি দিলে, তবে আরও একটু দাও—ওই দুটি পায়ে মাথা রাখ্‌বার সময়টুকু পর্য্যন্ত আমাকে সচেতন রাখো।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

জয়দেব

কোন্ সে মাহেন্দ্রক্ষণে হে বৈষ্ণব কবি,
হেরি হৃদি বৃন্দাবনে রাধা-শ্যাম-ছবি,—
কোকিল-কূজিত কোন্ নিকুঞ্জে বসিয়া
তব ভাব-মন্দাকিনী আসিল নামিয়া ?
কবে গীত-গোবিন্দের সুধাপদাবলী
উঠিল ও মর্ম্মমাঝে আবেগে উথলি,—
সুললিত ছন্দোমাঝে ভাবের লহরে,
নামিল বৈকুণ্ঠপুরী ধরণীর পরে ?
কবে বা হেরিলে কবি মানস-নয়নে
সুবিমল প্রতিভার উজ্জল কিরণে,
অম্বর মেদুর সেই সান্দ্র মেঘজালে
বনভূমি অন্ধকার শ্যামলতমালে,
তারি মাঝে একাকিনী মুগ্ধ রাধিকার
মদনমোহন লাগি প্রেম-অভিসার,
সুমন্দগামিনী সেই কালিন্দীর কূলে
অলিকুল-মুখরিত বকুলের মূলে,
মধুর নূপুর-রোলে মুরলী-নিস্বনে
বসন্ত-বিহার সেই গোপবধূসনে ?
কবে তব অসমাপ্ত কবিতা-চরণ,—
করিলেন ভগবান্ স্বহস্তে পূরণ ;
শ্রীকরে অঙ্কিত করি কবিত্ব চরম
চিরস্নিগ্ধ "দেহি পদপল্লবমুদারম্ ?"
ওগো চিরস্মরণীয় মহাভাগ্যবান্,
কঠোর সাধনাসিদ্ধ সাধক মহান্,
আজি বুঝি আছ তুমি, অনন্তবিশ্রামে,
রাধাশ্যাম-পদতলে শ্রীগোলোকধামে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গভাষা ও বাংলা ভাষা

সাহিত্যকে ভাবে ও ভাষায় গম্ভীর, উদাত্ত, কেবল গুণিজন বোধ্য করিয়া তুলিবার যেমন একটি ব্যাধি আছে, ঠিক তেমনি তাহাকে সহজ, সরল, জনসাধারণের নিকটতর উপভোগ্য বস্তু করিয়া তুলিবারও একটি ব্যাধি আছে। এই যে দুইটি আদর্শ, তাহার কোন একটিকেই অতিমাত্র করিয়া দেখা ও অপরটিকে ঘৃণা বা তুচ্ছ করাই দূষণীয়। নতুবা সাহিত্যে উভয়েরই স্থান আছে, উভয়ের সম্মিলনেই সাহিত্যের পূর্ণতর অভিব্যক্তি। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে আজ যে তথাকথিত চলিত ভাষা ও সাধুভাষার মধ্যে মল্লযুদ্ধ চলিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রতিবিম্বিত এই দুই রকম প্রেরণারই খেলা। নবীন সাহিত্যিকগণের অনেকেই দেখিতেছি, শুধু বাংলাভাষা আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন; আমাদের প্রয়াস, তাই তাঁহাদিগকে বুঝান যে, বঙ্গভাষারও দাবী তাঁহাদের উপর আছে, বঙ্গভাষা বাঙ্গালীরই ভাষা।

বাংলার সাধুভাষাটি কুলেখকের হস্তে প্রাণহীন, আড়ষ্ট, আড়ম্বরগ্রস্ত পণ্ডিতীভাষা হইয়া উঠিয়াছে। চলিত ভাষা তাই চাহিতেছে—সে ভাষাটি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সরল, প্রাঞ্জল, জীবন্ত করিয়া তুলিতে। টোলের শুষ্ক বাদবিতর্কের সঙ্কীর্ণ কোটরে পাণ্ডিত্যের সাজসরঞ্জামের বন্ধনে যাহার প্রতিষ্ঠা, তাহাকে টানিয়া বাহিরের আলোকে, বাতাসে, ধূলামাটীতে, জীবনের মুক্তপ্রাঙ্গণে ছাড়িয়া দিতে। চলিত ভাষা এই আদর্শটিকে যতখানি কার্য্যকরী করিয়া তুলিতেছে, ততখানিই তাহার সার্থকতা। কিন্তু তাই বলিয়া শুধু চলিতভাষার ভঙ্গিমাটির মধ্যেই যদি আবার বাংলাভাষাকে পূরিয়া রাখিতে চাই, তবে তাহাকে সমৃদ্ধ না করিয়া, পঙ্গু করিয়াই ফেলিব। কোনরূপ দক্ষতা যাহার নাই, তাহার হাতে সব ভাষারই দুরবস্থা, তা চলিত ভাষাই হউক আর সাধুভাষাই হউক কিংবা অন্য কোন প্রকার ভাষাই হউক। কিন্তু এইখানে একটি কথা উঠিয়াছে যে, চলিত ভাষা—চলিত ভাষার ভঙ্গিমাই হইতেছে বাঙ্গালীর আপনার ভাষা, বাংলার যথার্থ ভঙ্গিমা। কবিকঙ্কণ হইতে ঈশ্বর গুপ্ত অবধি দেখি, এই ভাষারই খেলা, ইহাকেই ভিত্তিস্বরূপ

ধরিয়া তবে প্রতিভা যাহা কিছু গড়িয়া তুলিবে। বাংলা ভাষা "অল্পপ্রাণ অক্ষরবহুল," ইহাতে শব্দের অলঙ্কারের ওজঃশক্তির গুরুভার সহিবে না। অতিপ্রাচীন inflexional ভাষায় যাহা চলিত, বর্ত্তমান যুগের analytical ভাষায় তাহা চালাইবার চেষ্টা অতীতের প্রতি একটা নিরর্থক অন্ধভক্তির উদাহরণ মাত্র। বাংলাভাষা—বাংলার হাটে-বাটে আউলে-বাউলে ছড়ায়-কীর্ত্তনে যে ভাষা প্রচলিত, সাধুভাষাটি তাহার উপর এই পরধর্ম্ম চাপাইতে চাহিয়াছিল, তাই বঙ্গীয় সাহিত্যপ্রতিভা মুক্তভাবে ফুটিতে পারে নাই। বাংলাভাষায় যদি এই শক্তি—এই গৌড়ীয় রীতি ধারণ করিবার সামর্থ্য নাই থাকে, তবুও ক্ষুণ্ণ হইবার কিছু নাই, ইহাতে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নাই। সব ভাষাতেই সব গুণ থাকে না, থাকিবার প্রয়োজনও নাই। যে গুণ থাকে, তাহার মধ্য দিয়াই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টি হইতে পারে।

কিন্তু এই যে ভাষার একটি বিশেষ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা যে অকাট্য সনাতন, এ কথার প্রমাণ কি? সব ভাষারই একটা বিশেষ প্রকৃতি আছে, সত্য বটে; কিন্তু কয়েকটি বিশেষত্বের মধ্যেই কি তাহাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলা যায়, আর বিশেষতঃ যখন সে ভাষা কেবল গড়িয়া উঠিতেছে, পূর্ণাঙ্গ পরিপুষ্ট হইতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র? চলিত ভাষা বলিয়া আমরা যে সুর বাঁধিয়া দিতেছি, তাহার মধ্যেই কি বাংলার সব ভবিষ্যৎ? আমরা ত মনে করি, এইরূপে বাংলার ভবিষ্যৎকে আমরা খর্ব্ব করিয়া আনিতেছি, তাহার কতকগুলি possibilitiesকে বহিষ্কার করিয়া দিতেছি। বস্তুতঃ পণ্ডিতদিগের যতই দোষ থাকুক না কেন, তাঁহারা যে বাংলা ভাষার একটা সম্পূর্ণ নূতন শক্তির উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রকৃতিকে উদার ও মহনীয়ই করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন বাংলার সাহিত্যে ও ভাষায় যুগান্তর আনিয়াছেন, আমরা সকলেই বলিয়া থাকি, কিন্তু এ কথার তাৎপর্য্য ঠিক ঠিক যে হৃদয়ঙ্গম করি, এমন বোধ হয় না। এই নবযুগের পূর্ব্বে বাংলা কি ছিল, তার যথাযথ প্রতিকৃতি পাই চণ্ডিদাসে, আর কি হইতে পারে, তারও চরম অভিব্যক্তি ঐ চণ্ডিদাস। তাহা হইতেছে বাঙ্গালীর "গেরস্থালী"তার পরাকাষ্ঠা। তার ভাব তার ভাষা অতিমাত্র বাঙ্গালীর, বাঙ্গালীর

প্রাণের যা বিশেষত্ব, যে নিছক স্বাতন্ত্র্যটুকু তাহারই পরিস্ফুরণ। কিন্তু সেই সঙ্গেই মিশিয়া রহিয়াছে কেমন এক প্রাদেশিকতা, একটা সঙ্কীর্ণতা, একটা "ঘরমুখো" প্রকৃতির ছায়া, বিশ্বজীবনের উদার বহুতরঙ্গায়িত বৈচিত্র্যের সহিত একটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অভাব। তাহা সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণস্পর্শী, মাধুরিমাময় সন্দেহ নাই, কিন্তু ছায়ার কোলে বর্দ্ধিতা লতিকার ন্যায় তাহাতে কেমন তেজের—সামর্থ্যের অভাব, যেন বিগলিতদেহা, প্রতিনিয়তই বসুধালিঙ্গনপরা।

কিন্তু ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালী যে দিন বাংলার প্রাণ ছাড়িয়া বিশ্বপ্রাণের বার্ত্তা পাইল, শুধু নিজের ঘরের যে অনুভূতি, যে অভিজ্ঞতা, তাহা ছাড়াইয়া যে দিন সমস্ত জগতের বিপুল বিচিত্র রসের সন্ধান পাইল, সে দিন তাহার সে পূর্ব্বতন চিরপরিচিত ভাষা ও ভঙ্গিমা এ নূতন জীবনের স্পন্দন আর ধারণ করিতে পারিল না। সে চাহিল নূতন আধার, জীবন-সঙ্গীতের নূতন মূর্চ্ছনার অনুরূপ তাহার ভাষার নূতন সুর—নূতন ছন্দ। আর তারই ফল বিদ্যাসাগর, মধুসূদন। মুকুন্দরাম অথবা চণ্ডিদাসের পন্থা অনুসরণ করেন নাই বলিয়া বিদ্যাসাগর-মধুসূদনকে যদি অ-বাঙ্গালী স্থির করি, তবে আমরা বাংলাভাষায় ও সাহিত্যে একটা সঙ্কীর্ণ আদর্শই খাড়া করিয়া তুলিব। হইতে পারে, এই প্রথম আচার্য্যগণ ভাষায় যে সব নূতনত্ব আনিয়াছিলেন, তাহা সব টিকিবার নয়, টিকা উচিতও নয়। কিন্তু তাঁহারা বাংলা ভাষায় যে বজ্রসার, যে গুরুত্ব, যে একটা লাতিন প্রতিভা অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বাংলার চির-সম্পদ্, তাহা শুধু অতীতের এক ক্ষণিক বিকৃতি নহে; পরন্তু মহোজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই পূর্ব্বাভাস।

ইংরাজী ভাষাতেও চসার ছিলেন খাঁটি ইংরাজ—"The well of English undefiled"—তাঁহার ভঙ্গিমা ছিল ইংরাজের অতি আপনার, গৃহস্থালী-ভাবেরই প্রতিমা। কিন্তু এলিজাবেথের যুগে ইংরাজজাতির দৃষ্টি যখন ইংলণ্ডের সীমাটি অতিক্রম করিল, আপন গণ্ডীটি ছাড়িয়া নূতন জ্ঞানে নূতন প্রেরণায় তাহার অন্তরাত্মা ভরপূর হইয়া উঠিল, তাহার কর্ম্মবীরগণ যখন অসীম সাগরের পারে ছুটিয়া চলিলেন, তখন সে জাতির সাহিত্য-ভাষাও ধরিল এক নূতন আকার। আদর্শ কর্ম্মবীর রোমকের ভাষা সে সহজেই আপনার করিয়া লইল। আর তারই ফল সেক্সপীয়র মিল্‌তন।

তখনকার আলোড়ন-মিশ্রণের মধ্য দিয়াই উৎপন্ন হইয়াছে ইংরাজী ভাষার পূর্ণাঙ্গ দেহটি, পরবর্ত্তী যুগে কুইন আনে'র সময়ে তাহাই সাধারণ সাহিত্যের ভাষারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর বর্ত্তমান যুগে যে ভাষার যতই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকুক না কেন, কাঠামটি এখনও সেই একই রহিয়াছে। খাঁটি অবিমিশ্রিত ইংরাজীর ধরণটি বজায় রাখিবার জন্য তখনও প্রচেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু ইংরাজের মুক্তপ্রতিভা কোনরূপ বন্ধন বা সঙ্কীর্ণ মানদণ্ডে আপনাকে আঁটিয়া রাখিতে পারে নাই। শুধু লাতিন কেন, বৈদেশিক সব ভাষা হইতেই ইংরাজ যেমন সহজে ও অকুণ্ঠিতচিত্তে উপকরণরাজী সংগ্রহ করিয়াছে, বৈদেশিক ভঙ্গিমায় আপনাকে যথেচ্ছা ঢালিয়া দিয়াছে, এমন কোন জাতি তাহা পারে নাই। সাহিত্যে সব ভাষাই কেমন বর্ণসঙ্করের ভয় করিয়া আসিয়াছে, চাহিয়াছে নিজের রক্তের শুদ্ধতা বজায় রাখিতে; কিন্তু ইংরাজীভাষা তেমনটি করে নাই। তাই দেখি, ইংরাজীভাষা তাহার কবি সেক্সপীয়রের মনেই এত স্বাধীন—এত বৈচিত্র্যে ভরা, ভাবরাজ্যে এবং সেই জন্য কর্ম্মরাজ্যেও এত দূরপ্রসারী। মানুষের কণ্ঠে যত রকম ভাবের—যত রকম ভঙ্গিমার খেলা ফুটিয়া উঠিতে পারে, ইংরাজীতে যেমন তার পূর্ণ প্রকৃতিটি পাই, আর কোন ভাষায় তাহা পাই না। সত্য বটে, বিশেষ ভাষার এক বিশেষ গুণ আছে এবং সেই গুণের দিক্ দিয়া দেখিলে ইংরাজী ভাষা অন্যান্য ভাষা হইতে নিকৃষ্টতর হইতে পারে। ফরাসী ভাষার প্রাঞ্জলতা, তাহার বলয়িত গতিভঙ্গিমার তুলনা নাই। ইতালীয় ভাষার সে মধুর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা আর কোন ভাষায় অসম্ভব। কিন্তু ইংরাজী যদি এইরূপ কোন বিশেষ আদর্শ, একটা বিশেষ standard যদি না খাড়া করিয়া থাকে, তবে তাতে ক্ষতি না হইয়া বরং তার লাভই হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে বিশ্বপ্রকৃতিরই বহুরূপ। স্বাতন্ত্র্যকে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অবাধ গতি দেওয়ার ফলে তাহাতে এত বহুভঙ্গিমা, এত অশেষ সম্ভাবনীয়তা স্থান পাইয়াছে। সেই জন্যই দেখিতে পাই, বিদেশী ভাব ইংরাজীতে যেমন যথাযথ ব্যক্ত হয়, আর কোন ভাষায় তেমনটি হয় না। গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত অথবা আধুনিক কোন ভাষায় রচিত কাব্যের ইংরাজী অনুবাদ যত সহজে, নিখুঁৎ-ভাবে, যত মূলানুযায়ী করিয়া তোলা যায়, অন্যান্য ভাষায় তাহা যায় না।

ফরাসী ভাষায় শুধু ফরাসী প্রতিভার অনুরূপ সৃষ্টি ব্যতীত বিদেশী কিছু প্রতিফলিত করা নিতান্তই কঠিন—ইংরাজীতে যেখানে সাধারণ লেখকের দক্ষতাই যথেষ্ট, ফরাসীতে সেখানে দরকার হইবে একজন genius.

ফরাসী ভাষার টলটল প্রাঞ্জলতায় আমরা মুগ্ধ এবং দেখাইয়া থাকি, বাংলার প্রকৃতি কতখানি ফরাসীর অনুরূপ। আর সেই জন্য বাংলাকে কেবল ফরাসীরই আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছি। কিন্তু ফরাসী ও বাংলার মধ্যে যতই মিল থাকুক না কেন, বাংলার অন্তরে যদি কিছু নূতন সম্ভাবনীয়তা থাকে বা নূতন কিছু অনুস্যূত করিয়া দিতে পারি, তবে তাহাকে প্রথম হইতেই পরধর্ম্ম বলিয়া নিরসরণ করিবার যথেষ্ট কারণ দেখি না। সব ভাষায় সব রকম সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ভাষার কোন একটি পদ্ধতি বা ভঙ্গিমাকে একান্ত করিয়া ধরিতে হইবে, তাহার অতিরিক্ত কিছু করিবার প্রয়োজন নাই, এমন বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের "ছিন্নপত্র" বা "ঘরে বাইরে" খুব সুন্দর—খুব মনোহারী হইতে পারে, বাংলা গদ্যের একটা নূতন দিক্ বোধ হয় তাহা খুলিয়া দিয়াছে অথবা চণ্ডিদাসের সে পূর্ব্বতন বাংলারই সরলতা ঋজুতা সরস অন্তরঙ্গতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; কিন্তু কেবল সেইটুকুই যে বাংলার প্রাণ, তাহার চরম বিকাশ, আর যাহা কিছু, তাহা আরোপমাত্র, তাহা সংস্কৃত-ইংরাজীর জীবনশূন্য অনুবাদ, এরূপ নির্দ্দেশ করাও দুঃসাহসই।

বাংলা ভাষায় আমরা সংস্কৃতের একটা বিশিষ্ট স্থানই দিতে চাই, তার কাব্যে লাতিন প্রতিভারও ছবি পাইতে চাই—ধ্বনির পূর্ণতা, অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্যকেও বহিষ্করণ করিতে চাই না—সেই জন্য যে আমাদের লক্ষ্য বাংলাকে গৌড়ীয়রীতিতে গড়িয়া তুলা বা তাহার কাব্যে কেবল declamation ভরিয়া দেওয়া, সে আশঙ্কা কেহ করিবেন না। সাধুভাষা যে সহজ সরল প্রাঞ্জল হয় না, তাহা নয়। আবার বর্ণে শব্দে আভরণে অলঙ্কারে সাজিলেই কাব্য যে declamation হইয়া পড়ে, তাহাও নয়। Great poetry সন্ন্যাসীর মত একেবারে নিরাভরণ হইতে পারে, আবার সকল রকম সাজ-পোষাকে রাজমূর্ত্তিও ধরিতে পারে। দুই রকম সত্যের, দুই রকম ভাবের দুই রকম অভিব্যক্তি মাত্র। আমাদের মতে সাধুভাষাটি এই উভয় ছাঁচেই ঢালা যাইতে

পারে। চলিত ভাষা যদি একটিকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে বলিব, সাহিত্যের আদর্শকে সে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিতেছে, বাংলাকে ঘরের কোণে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিতেছে।

সাহিত্যের ভাষার একটা standard স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে আর একটি কথা বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা অঞ্চলের কথোপকথনের ভঙ্গিমা অনুসারেই বাংলাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কারণ, বাংলাভাষার স্বাভাবিক গতিই দেখিতেছি এই দিকে। আর সাহিত্যের ভাষাকে জীবন্ত রাখিতে হইলে এইরূপ একটা চলিত বা দৈনন্দিন মৌখিক আলাপনের ভাষারই অনুরূপ করিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু কোন দেশের একটা dialect বিশেষই যে সে দেশের সর্ব্বসাধারণের সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিবে, এমন কোন অকাট্য নিয়ম কিছু নাই। দান্তে তসকানের (Tuscan) প্রাদেশিক ভাষাকে ইতালীয় সাহিত্যের ভাষা করিয়া তুলিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সব দেশে এমন ঘটে নাই বা ঘটিতে বাধ্য নয়। ইংলণ্ডে সাহিত্যের ভাষা King's English কোন প্রাদেশিক ভাষার গড়নে গঠিত হয় নাই। দেশের নানা দিক্ হইতে ফরাসী প্রভাবগ্রস্ত রাজপরিষদে যে নানান ভাষাভাষীর মিশ্রণ হইয়াছিল, সেই আংগ্লোসাক্সনের নানা dialect ও নর্ম্মাণভাষার মধ্য হইতে উঠিয়াছে ইংরাজী। ফরাসীকে বলা হয় বটে Isle de France এর ভাষা, কিন্তু সে ভাষা কত পরিবর্ত্তিত; পরিবর্ত্তনের ফলে, অন্যান্য dialect এর কত মিশ্রণের ফলে, পণ্ডিতদিগের কত কারসাজীর (scholasticism) পরে তবে সাধারণের সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। প্যারীনগরে যে ধরণে কথোপকথন চলে, তাহার সহিত এখন এই সাহিত্যের ভাষার সাদৃশ্য খুব অল্পই। আর প্রাচীন গ্রীসে যখন একটা সাহিত্যের সর্ব্বসাধারণ ভাষা গড়িয়া উঠিল, তখন সেই attic ভাষা যে অতিমাত্র আথেন্সেরই গৃহস্থালীর সুরের অনুরূপ হইয়াছিল, তাহাও ঠিক নয়। পূর্ব্বতন প্রধান তিনটি প্রাদেশিক ভাষা হইতেই প্লেটো তাঁহার ভাষার গড়ন পাইয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা মনে করি, ইহাই অধিকতর সত্য যে, সাহিত্যের ভাষার উপর বিশেষ কোন dialect এর যতই প্রভাব থাকুক না কেন, সব dialect হইতেই ন্যূনাধিক পরিমাণে সে উপকরণাদি সংগ্রহ করে, কোন একটি প্রাদেশিকতা সে

অনুসরণ করিয়া চলে না, যেখান হইতে যাহা লইবার যোগ্য, যাহা লইতে পারে, তাহা লইয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকে আপন পথ করিয়াই সে চলিয়াছে। আর এইরূপেই সাহিত্যের ভাষা পুষ্ট, সমৃদ্ধ, একটা বিশিষ্টতায় মণ্ডিত হইয়া উঠে।

বঙ্গভাষা কোন বিশেষ dialectকে ধরিয়া গঠিত হয় নাই। রাঢ়দেশের প্রভাব তাহার উপর যতই থাকুক না কেন, রাঢ়দেশের ভঙ্গিমা বা সুরকেই সে একান্ত করিয়া লয় নাই। আর সে জন্যই যে সে জড় মৃতবৎ হইয়াছে বা হইয়া উঠিবে, তাহা কিছু নয়। এ কথাটি মানিয়া লইতে আমরা ইতস্ততঃ করিবই যে, সাহিত্যকে জীবন্ত রাখিতে হইলে মৌখিক ভাষায় অর্থাৎ কথাবার্ত্তায় যে শব্দ যে ভঙ্গিমা ব্যবহার করি না, বা করিতে পারি না, তাহা সব বিসর্জ্জন দিতে হইবে। বঙ্গভাষা পণ্ডিতগণের গড়া ভাষা, ইহা স্বীকার করিলেও আমরা দেখিতেছি, এ ভাষা বাঙ্গালীর সাহিত্যের প্রাণের ভাষাই হইয়া উঠিয়াছে—দৈনন্দিন জীবনকে হুবহু অনুকরণ না করিয়া চলিলেও তাহাতে জীবনেরই অভিব্যক্তি হইয়াছে ও হইতে পারে। সে জীবন একটু ভিন্নপ্রকার, এই যা পার্থক্য।

কিন্তু থিওরি হিসাবে সাধুপন্থী ও চলিতপন্থীদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে দেখিতেছি, সব প্রভেদ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনামগুলি ও আর দুই চারিটি কথা লইয়া। সাধুপন্থীদের মধ্যে যেমন সংস্কৃতশব্দ, সংস্কৃত syntax অথবা ইংরাজীভঙ্গিমা দেখা যায়, চলিতপন্থীদের মধ্যে যে তাহার নিতান্ত অভাব, এমন বলা যায় না। কলহ কেবল "করিতেছি", "হইয়া" "ইহারা" "নহে" লিখিব, না লিখিব, "কচ্ছি", "হয়ে", "এরা", "নয়"। "কচ্ছি" "হয়ে" প্রভৃতি যদি সাহিত্যে স্থান পায়,তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু সে জন্য সাধু কথাগুলি যে অবাংলা বলিয়া নির্ব্বাসন করিতে হইবে, এমন প্রয়োজন দেখি না। মুখে আমরা "করিতেছি" "হইয়া" বলি না বটে, কিন্তু মুখে "নূতন"ও বলা হয় না, "চলিতও" বলা হয় না—বলা হয় "নতুন" "চল্‌তি"। তবুও ত চলিত-পন্থীদের লেখায় এ সব "অ-মৌখিক" শব্দ যথাতথা দেখিতে পাই। আর "নূতন" বা "চলিত" লিখিলে ভাষার যে জীবনহানি হয়, এমনও তাঁহারা

স্বীকার করেন না। সুতরাং "করিতেছি", "ইহারা" লিখিলেই যে সব যজ্ঞ পণ্ড হইবে, এমন আশঙ্কা করিবার কিছু নাই। ছন্দের জন্য যদি কোথাও লিখিতে পারি "নূতন", কোথাও লিখিতে পারি "নতুন", তবে শুধু ছন্দ নয় ভাবের—অর্থের একটা বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই লিখিতে পারি "করিতেছি", "হইয়া", "ইহারা", "নহে"।

সে যাহাই হউক, বঙ্গভাষা ও বাংলাভাষার একটিকে মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করা ও অপরটিকে বিদেশী বলিয়া বিতাড়িত করা সমীচীন হইবে না। বাংলার হৃদয়ে এতখানি উদারতা বোধ হয় আছে—যাহাতে দুইটিই সেখানে স্থান পায়। অবশ্য, কোন ভঙ্গিমার সামর্থ্য কতখানি ও কোন দিকে সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার নিরসন তর্কে হইবে না। সে সমস্যা-পূরণ হইবে সৃজনের দ্বারা, সাহিত্য-রচনার দ্বারা। চলিতপন্থীরা যে সত্যটুকুকে কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিতেছেন, তাহা যে আমরা দেখিতেছি না, তাহা নয়। সেটা হইতেছে আধুনিক যুগের ধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগের গতি হইতেছে বিশ্লেষণের দিকে, জিনিষকে কাটিয়া ভাঙ্গিয়া পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখান। সকল ভাষাতেও দেখি, এই বিশ্লেষণময়ী প্রকৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। সে চায় ভাবকে, অর্থকে, কথাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া, সরল সহজ মিহি করিয়া, বলয়িত ভঙ্গিমায় সাজাইয়া তুলা। বাংলার চলিতভঙ্গিমা এই আদর্শটিকে কতখানি প্রতিফলিত করিতেছে বা করিতে পারে, সে প্রশ্ন আমরা করিব না। কিন্তু এই আদর্শ একটা পদ্ধতিমাত্র। ইহারই মধ্যে যে সাহিত্যিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ বা চরম পরিণতি, তাহা কে বলিতে পারে? আর বর্ত্তমান যুগেও আর কোন ভঙ্গিমার খেলা হইতে পারে না, এমন নিয়মই বা কে করিয়া দিতে পারে?

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

বুদ্ধিমানের কর্ম্ম

আঠার উনিশ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন সহরের পূর্ব্বভাগে একবার জল যোগাইতে একটু গোল হয়। চব্বিশ ঘণ্টা জলের কলে জল চলিত না। আমি তখন বিলাতে। প্রথমে দু'চারদিন এই বিষয়ে খবরের কাগজে লেখালেখি চলিল। তার পর এক-দিন শুনিলাম যে, যে-কোম্পানীর উপরে জল যোগাইবার ভার, একদল লোকে তাহাদের আফিসে যাইয়া, চড়াও করিয়া, সে বাড়ীর জানালা দরজা ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিয়াছে। পরের দিন খবরের কাগজ খুলিয়াই দেখি, পূর্ব্বলণ্ডনের জলাভাব দূর করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এ'টা ইংরাজের প্রকৃতি। যাহা তাহার প্রাপ্য, ভালয় ভালয় না পাইলে জোর করিয়া তাহা আদায় করিয়া লয়। চব্বিশ ঘণ্টা কলে জল না চলিলে ইংরাজের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ নিতান্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠে না। স্নানটা ইংরাজের নিত্যকর্ম্ম নয়, পানের জন্যও জল না হইলে যে চলে না, এমন নয়। তিন চার চিলিমিচি জল হইলেই যাহাদের দেহ-শুদ্ধি হয়; পান করে যারা ধেনো বা বীয়ার, স্নান করে যারা পাব্‌লিক বাতে বা সাধারণ স্নানাগারে, তাদের ঘরের কলে চব্বিশ ঘণ্টা জল না চলিলে তেমন কিছু আসিয়া যায় না।

আমাদের খাইতে, শুইতে, বসিতে সর্ব্বদাই জলের প্রয়োজন। অথচ আমরা এই সহরে বহুদিন চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ীর কলে জল পাই নাই। কাগজে-কলমে এখন পাইবার কথা, কিন্তু পাই কি না, মা গঙ্গাই জানেন। ইংরাজের কলে চব্বিশ ঘণ্টা জল চলার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইংরাজ সে কথা ভাবে না। ইংরাজ বুঝে, জলের ট্যাক্‌স যখন ষোল আনা আদায় করিয়া লও, সময়মত ট্যাক্‌স না পাইলে কল কাটিয়া যাও, তখন সর্ব্বমত আমার ঘরের কলে জল যোগাইবে না কেন? জলের ট্যাক্‌স যে নেয়, জল যোগাইতে সে বাধ্য। আর যদি সে না দেয়, তবে যাহাতে সে দেয়, তার উপায় করিতে আমিও বাধ্য। ইহা আমার সিভিক ধর্ম্ম। কথায় যদি সে সোজা হয় ভাল, না হইলে মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি।

আমরা ইহা বুঝি না। আমরা জানি, আমাদের যাহা দেয়, আমরা তাহাই দিতে বাধ্য। অপরের যাহা করণীয়, সে যদি তাহা না করে, সে দায় তার, আমাদের নহে। আমরা জলের ট্যাক্‌স দিতে বাধ্য। না দিলে বা না দিতে পারিলে, ঘটি-বাটিটা ক্রোক করিয়া সেই ট্যাক্‌স আদায় করিয়া লইতে পারে।

সুতরাং জল পাই আর না পাই, ঘটিবাটিটা বাঁচাইবার জন্য কিস্তি-মাফিক ট্যাক্স দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। জল যোগান ত আমার কর্ম্ম নয়। যার কর্ম্ম, সে যদি তাহা না করে, আমি তার কি করিব? কলে যদি জল না চলে, ঘড়া কাঁধে করিয়া, বা ভারী ডাকিয়া গঙ্গাজল আনিতেই হইবে। জলের প্রয়োজন প্রাণের জন্য; প্রাণের প্রয়োজন জলের জন্য ত নয়। যাহার উপরে জল যোগাইবার ভার, সে জল যোগায় না বলিয়া, তার সঙ্গে মারামারি করিতে যাইয়া, পৈতৃক প্রাণটা হারাইতে যাই কেন?

জীবনের সাড়ে চৌদ্দ আনা পথে খেয়ার কড়ি দিয়া সাঁতারিয়া নদী পার হওয়াটা আমাদের স্বভাব। খেয়ার কর্ত্তা আমি নই, খেয়ানী। খেয়ার নৌকা পারাপারে গতাগতি করে, খেয়ানীর ইচ্ছায়। তিন ঘণ্টা তীরে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিলেও যদি ও-পারের নৌকা এ-পারে না লাগে, তাহা হইলে আমি কি খেয়ানীর সঙ্গে, তারই ঘাটে, তার আপনার জনের মাঝখানে, একটা লড়াই বাধাইয়া লাঞ্ছিত হইতে যাইব? সুখের চাইতে আমার স্বোয়াস্তিই ভাল। আমার প্রয়োজনেই আমি ও-পারে যাইতে চাই, খেয়ানীর প্রয়োজনে নয়। খেয়ার নৌকা যখন এ-ঘাটে আসিয়া লাগিল না, তখন দুর্গা! দুর্গা! বলিয়া সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া, ও-পারে যাইয়া, ভাল মানুষটির মতন, খেয়ানীকে খেয়ার কড়িটা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ইংরাজ ঘটে এত বুদ্ধি নাই। ইংরাজ নিজের কর্ম্ম পণ্ড করিয়াও অপরকে জোর করিয়া তার কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত রাখে। এইরূপে নিজের কর্ম্ম পণ্ড করাকে ইংরাজ সিভিক ধর্ম্ম কহে।

মহাভারতে একটা কাহিনী আছে। রাজা ও রাজধর্ম্মের উৎপত্তি কখন্, কিরূপে হইল যুধিষ্ঠির এই প্রশ্ন করিলে, ভীষ্ম কহিলেন, আদিতে রাজাও ছিল না; রাজধর্ম্মও ছিল না। প্রজারা নিজেই আপনাপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া সমাজস্থিতি রক্ষা করিত। কালক্রমে কতকগুলি লোক আলস্যপরায়ণ হইয়া নিজের কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা করিতে লাগিল। তখন অপরে তাদের সেই অকৃত কর্ম্মের ভার নিজেদের হাতে তুলিয়া লইল। কর্ম্ম যে করে, সে-ই কর্ত্তা হয়। কর্ত্তা হইলে কর্ত্তৃত্ব করিতেই সে ছাড়িবে কেন? সমাজের কর্ম্ম করিতে যাইয়া দশজনের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করিলেই মেজাজটাও আপনা হইতে বিগড়াইয়া যায়। সমাজ-কর্ত্তাদের মেজাজ বিগড়াইলে, সমাজ-শাসন নিষ্পেষণ হইয়া উঠে। নিষ্পেষণের মাত্রা বাড়িলেই নিষ্পেষিতের মনে জিঘাংসার উৎপত্তি হয়। ইহার ফলে মারা-মারি কাটাকাটি আরম্ভ হইয়া সমাজে অরাজকতা উপস্থিত হয়। অরাজকতা যখন উপস্থিত হইল, তখন অধর্ম্মের ভার সহিতে না পারিয়া বিশ্বমাতা বসুন্ধরা স্বয়ং

নারায়ণের দরবারে যাইয়া মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। নারায়ণ পৃথিবীর দুঃখের কথা শুনিয়া, ধ্যানস্থ হইয়া প্রথমে একটা সমাজবিধি রচনা করিলেন। পরে সমাজকে সেই বিধি-অনুযায়ী চালাইবার জন্য একজন মানস-পুত্রের সৃষ্টি করিয়া, তাঁহার উপরে সমাজ-শাসনের সকল ভার অর্পণ করিলেন। এইরূপেই আদিরাজার উৎপত্তি হয়।

প্রজাগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া সমাজ-শৃঙ্খলা ও সমাজ-স্থিতি রক্ষা করিবে, ইহাই সনাতন রাষ্ট্রধর্ম্ম। আর যেখানে কোন লোকে আপনার এই কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হয়, সেখানে সে কর্ম্মটা কেবল তারই নয়, আমারও; তার কর্ম্মাকর্ম্মের ফলভাগী আমাকেও হইতে হয়; সে যখন তার কর্ত্তব্য-পালন না করে, তাহাতে সে নিজেই অক্ষম হইয়া পড়ে, তাহা নহে, সমাজও দুর্ব্বল হয়; সমাজের দুর্ব্বলতা-বৃদ্ধিতে অরাজকতার সূত্রপাত হয়;—এ সকল বুঝিয়া ও ভাবিয়া রাজাপ্রজা সকলকে নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত রাখা, সমাজের প্রত্যেক লোকের কর্ম্ম। এ কর্ম্ম না করিলে আমরা সমাজ স্থিতি-ভঙ্গের সহায়তা করিয়া প্রত্যবায়ভাগী হই। ইহাই ইংরাজের সিভিক্ ধর্ম্ম।

পাড়ায় পাহারা দেওয়া পুলিশের কাজ, আমার নয়; ইহা সত্য। কিন্তু পুলিশ যদি পাহারা না দিয়া, কেবল গরুর গাড়ীর নির্দ্দোষ গাড়ওয়ানদের তাড়া করিয়া বেড়ায় এবং কিসে তাদের নিকট হইতে দু'পয়সা কাড়িয়া লইতে পারে, তারই চেষ্টা দেখে; তাহা হইলে সেই পুলিশকে শাসন করা আমারও কাজ। সমাজে শান্তি-রক্ষার জন্যই পুলিশ মাহিনা খায়, শান্তি ভাঙ্গিবার জন্য নহে। আর প্রত্যেক কনেষ্টবলকে দিয়া যথাবিধি পাড়ায় পাহারা দেওয়াইবার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে একজন হেড্ কনেষ্টবল, এবং হেড্ কনেষ্টবল যাতে কনেষ্টবলের উপরিপাওনার উপরে চোখ না বসায়, তাহা দেখিবার জন্য একজন সব্ইনিস্পেক্টর—এইরূপে প্রত্যেক গলির মোড়ে চব্বিশ ঘণ্টা গোটা থানাটা ত আনিয়া দাঁড় করিয়া রাখা যায় না। এইজন্য কনেষ্টবল তার কর্ত্তব্য করিতেছে কিনা, এটা দেখা পাড়ার লোকেরই কর্ম্ম। ইংরাজ বলে, এইটাই সিভিক্ ধর্ম্ম।

আমরা সংবাদপত্রে ও সভামঞ্চে দিনরাত পুলিশের গালিনিন্দা করি। পাড়ার পাহারাওয়ালা লোকের উপরে অত্যাচার করিলে, অদৃশ্য থাকিয়া, বেনামী চিঠি ছাপাইয়া উপরওয়ালাদের উপরে খুব তম্বি করিয়া থাকি। কিন্তু একথাটা ভাবিয়া দেখি না যে, পাড়ার লোকে যদি কনেষ্টবলের ভয়ে দিনরাত জুজু হইয়া থাকে, তাদের চ'খের সাম্‌নে যখন বে-আইনী কাজ হয়, তখন যদি তার প্রতিবাদ না করে, ক্বচিৎ কোন নির্ব্বোধ লোকে তার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া যদি বিপদে পড়ে,

পাড়ার লোকে যদি তখন সত্যকথা বলিবার জন্ত তদন্তের সময় সাক্ষী দিতে পর্য্যন্ত না দাঁড়ায়, তাহা হইলে থানার কর্ত্তাদের ত কথাই নাই, খোদ লাট সাহেবেরও সাধ্য নাই যে, পুলিশের উৎপীড়ন হইতে লোককে রক্ষা করেন।

ইংরাজের নিজের দেশে এরূপ উৎপীড়ন হয় না, হইতে পারে না; এইজন্ত যে সেখানে দশে মিলিয়া দেশের পুলিশ-প্রহরীদের সর্ব্বদা সায়েস্তা রাখে। বে-আইনী কাজ দেখিলেই তার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া কাহারও সঙ্গে পুলিশের বিবাদ বাধিলে পাড়ার লোকে, দেশের লোকে সে বিবাদটা নিজের করিয়া লয়। সত্য ঘটনা কি যারা জানে, নিজেদের সুখস্বোয়াস্তি বিসর্জ্জন দিয়া তারা আদালতে সাক্ষ্য দিতে দাঁড়ায়। নিতান্ত অপরিচিত পথের লোকেও সে দেশে, এ সকল ঘটনায়, প্রয়োজন হইলে, সাক্ষ্য দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, নিজের নাম-ধাম লিখাইয়া দিয়া যায়। এইটা ইংরাজের সিভিক্ ধর্ম্ম।

আমাদের মধ্যে এই সিভিক্ ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল কিনা জানি না। কিন্তু এখন যে তার চিহ্নমাত্র নাই, ইহা দেখিতেছি। এই সিভিক্ ধর্ম্ম আমাদের নাই বলিয়াই আমরা জীবনের সাড়ে চৌদ্দ আনা বিষয়ে, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম বলিয়া হাত উল্টাইয়া নিশ্চিন্ত হই।

কেহ কেহ বলেন, এই নিশ্চেষ্টতার জন্ত আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ দায়ী। নিজের দায়িত্ব-কর্ত্তব্য পরের ঘাড়ে চাপাইয়া চলা, ভারতবর্ষের ধর্ম্মের, সমাজনীতির, চির-দিনের আভাস। ধর্ম্মে আমরা শাস্ত্রের উপরে সত্যাসত্য-নির্দ্ধারণের ভার দিয়া, ধর্ম্মমীমাংসায় নিজের বিচারবুদ্ধি-প্রয়োগের দায় হইতে মুক্ত হই। কর্ম্মে আমরা দেশা-চারের উপরে কর্ম্মাকর্ম্ম-নির্দ্ধারণের ভার দিয়া, ভাল-মন্দ-বিচারের দায় হইতে মুক্ত হই। এইরূপে জীবনের সকল বিষয়ে ও সকল বিভাগেই আমরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্বকে চাপিয়া রাখিয়া পরমতানুবর্ত্তন ও পরের শাসন মানিয়া চলি। এই জন্যই আমাদের মধ্যে এই সিভিক্ ধর্ম্মটা গড়িয়া উঠিতেছে না। ইংরাজ সকল বিষয়েই আপনার উপরে নির্ভর করিয়া চলে ও চলিতে চাহে। এই জন্য ইংরাজের সমাজে ও রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই জনগণের স্বত্ব-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

এ সকল কথা নূতন নহে। এই সকল কথার মধ্যে যে কোনই সত্য নাই, তাহাও নহে। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র এ সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু নহে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, নানাবিধ কর্ম্মের ভিতর দিয়া যেমন একই অখণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়, সমষ্টিগত সমাজ-জীবনেও সেইরূপ, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের নানাবিধ সাধন ও শাসনের ভিতর দিয়া একই সমাজচরিত্রের বা সমাজ-জীবনের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আমাদের এই দেহের মধ্যে, দেহের

বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রাদির পরস্পরের সঙ্গে যেমন একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ (বা organic relation) আছে, শরীরের একটি অঙ্গের বা শরীরের ভিতরকার একটি যন্ত্রের বিকারে বা দুর্ব্বলতায় যেমন অন্যান্য অঙ্গকে ও সমুদায় দেহকে দুর্ব্বল এবং স্বল্পবেশী বিকৃত করিয়া তোলে, সমাজ-দেহেও তাহাই ঘটে। সমাজেও ধর্ম্ম-তন্ত্র, রাষ্ট্র-তন্ত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য-তন্ত্র, পারিবারিক গঠন, এ সকলের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। অতএব ধর্ম্ম যদি দুর্ব্বল বা বিকৃত হয়, রাষ্ট্র তখন সবল ও সুস্থ থাকিতে পারে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধেতে যদি ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা না হয় বা না থাকে, তাহা হইলে পরিবারেও ন্যায় এবং সত্যরক্ষা সম্ভব হয় না। সমাজ-জীবনের কোন বিভাগে দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিলেই, সকল বিভাগ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সমাজ-জীবনের কোন অঙ্গে বিকার ঘটিলে ক্রমশঃ অপর অঙ্গেরও বিকৃতি ঘটে। এ সকল কথা অস্বীকার করা অসম্ভব।

কিন্তু প্রশ্ন এই,—আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় অবস্থার জন্য আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজই দায়ী, অর্থাৎ আমাদের ধর্ম্মে ও সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার অভ্যাস ও অবসর নাই বলিয়াই কি আমরা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রজামত ও প্রজাস্বত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি না,—কিংবা বহুদিন হইতে আমরা রাষ্ট্রীয় জীবনে পরাধীন হইয়া আছি বলিয়াই ধর্ম্মে ও কর্ম্মে আমাদের এই শাস্ত্রানুগত্য ও আচারবশ্যতা আসিয়াছে? এইরূপে এই প্রশ্নটা তুলিলেই, বোধ হয়, মূল ইযুটা পরিষ্কার হইয়া উঠে।

বিদেশীয় সমালোচকেরা চিরদিন কহিয়া আসিতেছেন যে, আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজনীতিই আমাদের রাষ্ট্রীয় অক্ষমতার নিদান। স্বদেশের সমাজ-সংস্কারকেরাও অনেক দিন হইতে পাকে-প্রকারে এ সকল কথা কহিয়াছেন। স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ধর্ম্মপ্রচারক নন, কিন্তু সমাজ-সংস্কারক। আর দুই বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসের রঙ্গমঞ্চ হইতে তিনি এই কথাই কহিয়াছেন। স্বারাজ্য লাভের উপায় আলোচনা করিতে যাইয়া, সিংহ-সাহেব কহিয়াছেন :—

"We can obtain the priceless treasure of Self-Government only by means of such prossessive improvement in our mental, moral, and material condition, as will, on tne one hand, render us worthy of it, and, on the other, impossible for our rulers to withhold it."

অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে যখন আমরা এরূপ মানসিক, সামাজিক ও বৈষয়িক বা আর্থিক উন্নতিলাভ করিব, যাহাতে আমদের স্বারাজ্য-সম্ভোগের অধিকার জন্মিবে, তখনই আমাদের বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের পক্ষে আমাদিগকে এই স্বারাজ্য হইতে বঞ্চিত রাখা অসাধ্য হইবে।

সিংহ-সাহেবের মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির লক্ষণা ও মাপকাঠিটা যে কি, তাহা তিনি খুলিয়া বলেন নাই। ইংরাজ স্বারাজ্য ভোগ করিতেছে। অতএব যে মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক উন্নতিলাভে স্বারাজ্যের অধিকার জন্মে, ইংরাজের তাহা অবশ্যই আছে। এই অনুমানখণ্ডে সিংহ-সাহেবের উপদেশের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইংরাজের মতন বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইলে, এবং ইংরাজ-সমাজের আর্থিক অবস্থালাভ করিতে পারিলেই স্বারাজ্যলাভে আমাদের সত্য অধিকার জন্মিবে। এই জন্যই সিংহ-সাহেব কহিয়াছেন—এখনও ভারতে স্বারাজ্য-প্রতিষ্ঠার সময় আইসে নাই। তার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাক।

আমরা আগে স্বভাবে ও প্রভাবে ইংরাজ হইয়া পরে স্বরাজ পাইবার শক্তি ও যোগ্যতা লাভ করিব, রবীন্দ্রনাথ এমন কথা কোনও দিন বলেন নাই। সিংহ-সাহেব বিলাতী সভ্যতাকে যে চক্ষে দেখেন, রবীন্দ্রনাথ কোন দিন সে চক্ষে দেখেন নাই। সিংহ-সাহেব যে ভাবে, অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত স্বারাজ্যের অপেক্ষায় আমাদিগকে প্রতীক্ষা করিতে বলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাও বলেন না। অথচ সে দিন রামমোহন লাইব্রেরীর হলে "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" নাম দিয়া যে প্রবন্ধ পাঠ ✓ করিয়াছেন, আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজনীতিকেই যে তিনি আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় দুর্গতির জন্য দায়ী করিয়াছেন, ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না। ধর্ম্মে আমরা নিতান্ত শাস্ত্রানুগত্যকে ও কর্ম্মে একান্ত আচারবশ্যতাকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা চলি বলিয়াই, রাষ্ট্রে আমরা যথাযোগ্য আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি না। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়াই সে দিন এই কথা কহিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশ-প্রচলিত ধর্ম্মের ও আচারবদ্ধ সমাজের যে সকল ত্রুটী দেখাইয়াছেন, তার অনেক কথাই সত্য। গতানুগতিক ধর্ম্মে যে ভাবে শাস্ত্র মানিয়া চলে, তাহাতে ধর্ম্মাচরণ সম্ভব হইলেও, ধর্ম্মসাধন সম্ভব নয়; এ কথা শতমুখে স্বীকার করি। তবে এই শাস্ত্রানুগত্যের আলোচনা করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের দেশের জনসাধারণে যে ভাবেই শাস্ত্রানুগত হইয়া চলুক না কেন, সাধকেরা কোনও দিন, তিনি যে শাস্ত্রানুগত্যের অনিষ্টকারিতার উল্লেখ করিয়াছেন, সে ভাবে শাস্ত্র মানিয়া চলেন নাই। যাঁরা এ দেশে ধর্ম্মসাধন করেন, কেবল ধর্ম্মাচরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন না, তাঁরা সর্ব্বদাই সত্যবস্তুকে ও তত্ত্ববস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন; কেবল শাস্ত্র বা গুরুমুখে তার কথা শুনিয়া কোনও দিন তৃপ্ত রহেন নাই। তাঁরা সাধন-পথে যাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া সত্য বলিয়া বরণ করেন, অনেক সময় তার সঙ্গে বিস্তর কল্পনা মিশাইয়া থাকিতে পারে। আর মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, আমাদের এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গেও, সর্ব্বদাই

বিস্তর কল্পনা মিশাইয়া থাকে। আমরা যতটুকু দেখি-শুনি, সর্ব্বদাই তার চাইতে বিস্তর বেশী দেখিতেছি বা শুনিতেছি, এরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সঙ্গেই যখন এত প্রকারের কল্পনা মিশাইয়া রহে, মানসপ্রত্যক্ষের সঙ্গে তাহা মিশিয়া যাইবে, ইহা আর তবে বিচিত্র কি! কিন্তু এ সত্ত্বেও এ দেশের ধর্ম্মসাধনের মূল লক্ষ্য চিরদিনই দেবতার প্রত্যক্ষলাভ।

"তদেতৎ শ্রোতব্যং, দ্রষ্টব্যং, নিদিধ্যাসিতব্যম্"

পরম-তত্ত্বকে প্রথমে শ্রবণের বিষয় করিবে। অর্থাৎ শাস্ত্র-গুরুমুখে প্রথমে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিবে। তার পর পরম তত্ত্বকে দর্শনের বিষয় করিবে। অর্থাৎ অপরোক্ষ অনুভব দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবে। তার পর বারংবার তাঁহার ধ্যান করিয়া, তাঁহাকে জীবনের সকল জ্ঞান, সকল ভাব ও সকল কর্ম্মের সঙ্গে জড়াইয়া রাখিবে—এই উপদেশ আর কোনও ধর্ম্ম-শাস্ত্রে নাই।

আর এই জন্যই আমাদের দেশের প্রচলিত ধর্ম্মেও শাস্ত্র নিজে নিজের প্রমাণ নহে। শাস্ত্রের প্রমাণ গুরু। যিনি সাধনবলে আপনার মধ্যে শাস্ত্রার্থের সত্য সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনিই গুরু-পদের অধিকারী; অন্যের এ অধিকার নাই। শাস্ত্রের প্রমাণ যেমন গুরু, সেইরূপ গুরুবাক্যের প্রমাণ শিষ্যের অপরোক্ষ অনুভব। যতক্ষণ শিষ্যের এই অপরোক্ষ অনুভব না হইয়াছে, ততক্ষণ গুরুর বাক্য অগ্রাহ্য হইবে না সত্য, কিন্তু তাহার প্রামাণ্যও প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই জন্যই যাঁহারা এ দেশে গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত সাধনের রাজ্যে, যতক্ষণ না কোন তত্ত্বের প্রত্যক্ষলাভ হইয়াছে, ততক্ষণ গুরুর কথা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন না—গ্রহণ করা নিষেধ। তাঁরাও বলেন—

যাহা না দেখ আপন নয়নে
তাহা না মান গুরুর বচনে।

ইহা শিষ্যের সংকল্প নয়, শাস্ত্রগুরুবর্জ্জিত ধর্ম্মের প্রচারকেরও প্রতিবাদ নহে। ইহা যে স্বয়ং গুরুরই উপদেশ।

ফলতঃ আমাদের ধর্ম্মে শাস্ত্রের প্রভাব যত অল্প, জগতের আর কোনও প্রাচীন ধর্ম্মে অত অল্প নহে। ইহার প্রমাণ - আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এক নহে, অনেক। অপরাপর ধর্ম্ম-শাস্ত্র কালবিশেষে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের সকল শাস্ত্রের মূল যে বেদ, তাহাকে লোকে নিত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। বৈদিক যাজ্ঞিকেরা বেদ-মন্ত্র নিত্য, অনাদি, সৃষ্টির সঙ্গে এ সকল মন্ত্রের প্রকাশ হইয়াছে; এ সকলের কোনও রচয়িতা ছিলেন না, এরূপ বিশ্বাস করিতেন। তাঁরা মন্ত্রশক্তি বা ম্যাজিকে আস্থাবান্ ছিলেন।

অন্যপক্ষে জ্ঞানমার্গের সাধকেরা যে-বেদকে নিত্য কহিয়াছেন, তাহা মন্ত্র নহে, সে বেদ ঋগ্বেদাদি নহে। উপনিষদ এই ঋগ্বেদাদিকে অপরা বা নিকৃষ্ট বিদ্যা কহিয়াছেন, আর যাহার দ্বারা "সেই অক্ষর বস্তুকে জানা যায়"—'যয়া তদক্ষরং অধিগম্যতে'—তাহাকেই পরা বিদ্যা কহিয়াছেন। আর উপনিষদ ইহাও কহিয়াছেন যে, শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের দ্বারা, যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা, ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মের দ্বারা, পঞ্চতপ প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা,—এ সকলের কোন কিছুরই দ্বারা সেই অক্ষরবস্তুকে জানিতে পারা যায় না। কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সেই অক্ষরবস্তু লাভ হয়। "জ্ঞানেনৈবমাপ্নুয়াৎ।" আর—"অনুভূতিপর্য্যন্তং জ্ঞানম্"—অপরোক্ষ অনুভবে যাহা প্রতিষ্ঠিত হয়, আমাদের পুরাতন মনীষিগণ তাহাকেই কেবল জ্ঞান বলিতেন;—শোনাজ্ঞানকে তাঁহারা জ্ঞানই কহিতেন না। সুতরাং সাধকের অতীন্দ্রিয়, অপরোক্ষ অনুভবেতে যাহা প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই পরা-বিদ্যা। আর তাহাই সেই বেদ—প্রাচীনেরা যাহাকে নিত্য, অপৌরুষেয় প্রভৃতি বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছেন।

আর বেদের এই নিত্যত্বের যেরূপ ব্যাখ্যাই হউক না কেন, ধর্ম্মশাস্ত্রকে নিত্য বলিয়া বিশ্বাস করার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। সত্য প্রকাশ করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। আর প্রকাশ করাই যে-বস্তুর ধর্ম্ম, সে-বস্তু যদি নিত্য হয়, তবে এই প্রকাশের বিরাম ত কদাপি সম্ভব হয় না। এই জন্য হিন্দুর শাস্ত্র প্রকৃত-পক্ষে কোনও গ্রন্থ-বিশেষ নহে। কিন্তু সত্যের ও তত্ত্বের একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশধারা মাত্র।

এই প্রকাশ-ধারাকে আশ্রয় করিয়া, প্রথমে ঋগ্বেদাদি বেদ-চতুষ্টয়ের প্রচার হয়। তার পর উপনিষদের, উপনিষদের পরে ব্রহ্মসূত্রের; ক্রমে পুরাণ-তন্ত্রাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এইরূপে আমাদের দেশে যুগে যুগে কত শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই।

সতের আঠার শত বৎসর ধরিয়া খৃষ্টীয়ান্‌দিগের মধ্যে সেই একই বাইবেল্ একমাত্র অভ্রান্ত শাস্ত্র হইয়া আছে। এই বাইবেলের অনেক টীকা-টিপ্পনী রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তার এক পংক্তিও প্রামাণ্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয় নাই। আর আমাদের দেশে যুগে যুগে সাধক ও সিদ্ধমহাপুরুষেরা আপনাদের অন্তরের প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ও সেই আত্মপ্রত্যক্ষের অভিধানের সাহায্যে শাস্ত্রবাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তন শাস্ত্রের সমান মর্য্যাদা ও অধিকার পাইয়াছে। এইরূপে প্রথমে ছিল বেদ-চতুষ্টয়; তার পর মহাভারত পঞ্চম বেদ হইয়া উঠিল। অন্যপক্ষে সাধন-পন্থার বিভাগ হইয়া, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা জ্ঞানসাধকের প্রস্থানত্রয় হইল। ভক্তিপন্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতসম্প্রদায়মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত কার্য্যতঃ বেদের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। আর

সেই ধারাতেই ক্রমে এই সামান্য পাঁচশত বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীতে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ভাগবতের সমান মর্যাদা পাইয়াছে। আর এই যে নব নব শাস্ত্রপ্রকাশের অবসর আমাদের ধর্ম্মে আছে, তাহাতে আমাদের দেশে শাস্ত্রানুগত্য যে প্রকৃত পক্ষে মানুষের আত্মার স্বাধীন বিকাশের কোনও অন্তরায় হয় নাই, ইহাই প্রমাণ হয়।

ফলতঃ রবীন্দ্রনাথ আমাদের শাস্ত্রকে যেরূপ স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী রাজার বেশে সাজাইয়া সেদিন আসরে নামাইয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে ভারতের শাস্ত্র কোন দিন সেরূপ ছিল না, এখনও সেরূপ নাই। একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখিতে পাই যে, মানুষকে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ করাই আমাদের সমাজ-তন্ত্র ও ধর্ম্ম-তন্ত্র উভয়ের চরম লক্ষ্য এই জন্যই আমাদের সমাজ-তন্ত্রে গার্হস্থাশ্রমে যেমন অশেষ প্রকারের আচার-নিয়মের বন্ধন আছে, সেইরূপ বানপ্রস্থে এ সকল বন্ধন অনেকটা আল্‌গা ও সন্ন্যাসে কোনও বিধি-বন্ধনেরই বশ্যতা নাই। এই সন্ন্যাসাশ্রমই সকল আশ্রমের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সংযমে, সাম্যে ও মৈত্রীতে যে চরম স্বাধীনতার গোড়া-পত্তন, গার্হস্থ্যা-শ্রমের বিধিবন্ধনের মধ্যে যার শুদ্ধিলাভ, বানপ্রস্থের ধ্যানচিন্তনে যার তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, সন্ন্যাসের চূড়া শিখরে তারই পূর্ণ প্রকাশ। এই স্বাধীনতাই জীবের পরম পুরুষার্থ। আর শাস্ত্র বল, গুরু বল, সমাজ বল, রাষ্ট্র বল, সকলই এই পরমপুরুষার্থসাধনের যন্ত্র, এই বৈকুণ্ঠলাভের সোপান।

এটা কেবল একটা প্রাচীন পুঁথিগত আদর্শ নহে। পুরাতন আশ্রম-ধর্ম্ম সমাজে কখনও পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল কিনা, জানি না; এখন যে সেরূপ আশ্রম-বিভাগ নাই, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রহ্মচর্য্য এবং বানপ্রস্থই কার্য্যতঃ লোপ পাইয়াছে; গার্হস্থ ও সন্ন্যাস লুপ্ত হয় নাই। আর গার্হস্থ্যের বিধিবন্ধন যতই কঠোর হউক না কেন, সন্ন্যাসে যে এখনও প্রকৃতপক্ষে তেমন কোনও বিধিবন্ধন নাই, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। আর আমাদের সমাজের ও ধর্ম্মের সকল বিধিবন্ধন বাহিরের কর্ম্মাকর্ম্মকেই কেবল নিয়মিত করিতে চাহে; অন্তরের মতামতকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহে না। হিন্দুর ধর্ম্মই আচারগত, অনুষ্ঠানগত; খৃষ্টিয়ান্ বা ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের মতন মত-বদ্ধ নহে। আমাদের ধর্ম্মে যার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ সিদ্ধান্তই সে গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের শাস্ত্র এই জন্য, কোনও দিন লোকের চিন্তার স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করে নাই। দেহ-তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বর-তত্ত্ব, কোনও তত্ত্ব-বিচারে গবেষণার গতিরোধ করে নাই। যে স্বাধীন হইতে চাহে, আমাদের শাস্ত্র তাহাকে চিরদিন সে অধিকার দিয়া আসিয়াছে, এখনও দিতেছে।

লোকের চিন্তাকে শাস্ত্র দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহে নাই বলিয়াই, আমাদের

দেশে প্রত্যেক শাস্ত্রের সঙ্গেই তার মীমাংসাও সেই শাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মসূত্র বা উত্তরমীমাংসা বহুদিন যুক্ত হইয়া আছে। কর্ম্মকাণ্ডের শাস্ত্রের সঙ্গে পূর্ব্ব-মীমাংসা সেইরূপ জড়াইয়া আছে। আর শাস্ত্রের সত্য অর্থনির্ণয়ে লোকের মনে যে স্বাভাবিক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এ সকল মীমাংসার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শাস্ত্র, সন্দেহ, বিচার, সঙ্গতি, সমন্বয়,—অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহাই মীমাংসার ক্রম হইয়া আছে। আমাদের সাধনে সন্দেহকে পাপ বলিয়া বর্জ্জন করে নাই; সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভবলাভের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে; বিচারের দ্বারা, criticism-এর দ্বারা সন্দেহকে নিরস্ত করিতেই চাহিয়াছে। দুনিয়ার আর কোন শাস্ত্র ত সন্দেহকে এতটা মর্য্যাদা দান করে নাই। সন্দেহের এই মর্য্যাদাই আমাদের ধর্ম্মে স্বাধীন-চিন্তার মর্য্যাদার প্রমাণ।

ফলতঃ হিন্দু কি বিশ্বাস করিবে বা না করিবে, এ বিষয়ে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। এই বিশ্বাস যদি ধর্ম্ম-বিশ্বাস হয় এবং তার সঙ্গে যদি সামাজিক রীতিনীতির বা প্রচলিত বিধিব্যবস্থার গুরুতর বিরোধ হয়; তাহা হইলে সমাজ ছাড়িয়া, অত্যাশ্রমী হইয়া, সকল সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া, স্বাধীনভাবে জীবনপথে চলিবার অধিকারও হিন্দুকে তাহার শাস্ত্রশাসনই দিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বতন যুগে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রমত্রয়কে যথাবিধি অতিক্রম না করিয়া কেহ সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু ক্রমে পরবর্ত্তী যুগে সে নিয়মও উঠিয়া গেল। এখন, যখন-তখন, যে-সে দণ্ডধারণ করিয়া বা ভেক লইয়া সন্ন্যাসী বা বৈরাগী হইয়া সকল সমাজ-বন্ধনের অতীত হইতে পারে। এ ব্যবস্থা ত দুনিয়ার আর কুত্রাপি খুঁজিয়া পাই না।

কেবল তাহাই নহে। সমসাধকে মিলিয়া সাধকগোষ্ঠী গড়িয়া, নিজ নিজ সাধনের অনুকূল পারিবারিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা করিয়া লইবার অধিকারও এ দেশে চিরদিন ছিল, এখনও আছে। এইরূপেই আমাদের বাঙ্গালাদেশে, মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবেরা নিজেদের একটা বৈষ্ণব-স্মৃতি রচনা করিয়া লইয়াছেন। শাস্ত্র বা সমাজ তাঁহাদের এই স্বাধীনতা হরণ করে নাই। প্রাচীন স্মৃতির অনুগত হিন্দুগণ নূতন বৈষ্ণব-সমাজের সঙ্গে আদান-প্রদান বন্ধ করিলেন; কিন্তু, এই বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সিদ্ধ মহাপুরুষ বা সাধক দেখিতে পাইলে, তাঁহাদিগকে নিজেদের দীক্ষাগুরু করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। প্রাচীন সমাজের সমাজপতিগণ প্রথম প্রথম ইহাতে আপত্তি করিলেন বটে, কিন্তু এ আপত্তি টিকিল না। এইরূপে কত ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণব মহাজন শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণের গুরু হইলেন। এখনও

সেই সকল মহাজনের সন্তানেরা ঐ ব্রাহ্মণগণের সন্ততিদিগের গুরু হইয়া আছেন। আজিও সাধনরাজ্যে হিন্দুদিগের মধ্যে এই স্বাধীনতাটুকু দেখিতে পাওয়া যায়।

ফলতঃ শাস্ত্র ও আচার, শাস্ত্রানুগত্য ও আচারবশ্যতা যে কেবল এই আমাদের হতভাগ্য দেশেরই বিশেষত্ব, তাহা নহে। কোন না কোন আকারে এ সকল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে। এই বস্তুটা বিশ্বব্যাপী। বিশ্বের সর্ব্বত্র দুইটা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির খেলা চলিয়াছে। একটা স্থিতির শক্তি, আর অপরটাকে গতির শক্তি বলিতে পারা যায়। জড়ের রাজ্যে একটিতে শক্তির ওজন ঠিক রাখে, অপরটিকে তার রূপান্তর ঘটায়। ইংরাজীতে একটিকে conservation of energy আর অপরটিকে transmutability of force কহে। জীব-বিজ্ঞানে এই স্থিতির শক্তিকে বীজ-শক্তি বা heredity কহে। ইহাই প্রত্যেক জীবকে তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে এবং এই পূর্ব্ব-সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া তবে তাহাকে নূতন অবস্থায় নূতন ব্যবস্থা করিয়া আত্মরক্ষার ও আত্মচরিতার্থতার জন্য জীবন-সংগ্রামে ছাড়িয়া দেয়। সমাজ-বিজ্ঞানে এই স্থিতির শক্তিটাই, শাস্ত্র ও আচারকে আপনার বাহন করিয়া, সামাজিক জীবনের পরিবর্ত্তন-প্রবাহের মধ্যে পূর্ব্বাপরের যোগ বাঁধিয়া রাখিয়া, এ সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। যেখানে জড়, সেইখানেই যেমন conservation of energy'র চেষ্টা ও প্রতিষ্ঠা, যেখানে জীব, সেখানেই যেমন হেরিডিটি heredity বা বৈজিক শক্তির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা; সেইরূপ যেখানেই সমাজ, সেখানেই শাস্ত্র এবং আচার আছে। লিখিত গ্রন্থবদ্ধ শাস্ত্র না থাকুক, মৌখিক শাস্ত্র আছে; জটিল স্মৃতিবদ্ধ আচার না থাকুক, কতকগুলি রীতিনীতি এমন আছেই, যাহাকে সমাজ মাথায় করিয়া চলে। যাযাবরদিগের মধ্যেও আছে; সভ্যতম, সুসংবদ্ধ সমাজেও আছে।

রবীন্দ্রনাথ কিছু দিন হইতে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বা individualismএর পুরোহিত হইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যাভিমানকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। আমরা পুরাতন শাস্ত্র, প্রচলিত আচার, কোন কিছুরই ঐকান্তিক বশ্যতা স্বীকার করি না। অথচ, আমাদের মধ্যেই কি কোন শাস্ত্র বিধি, কোন আচার-নিয়ম নাই? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উভয়েই শুদ্ধ স্বাভিমতের উপরে নিজেদের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসাধন গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। আবার ইঁহারা উভয়েই পরে নিজ নিজ শাস্ত্রসংহিতাও প্রচার করেন। মহর্ষি তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকে ব্রাহ্মসমাজের সত্য-শাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। কেশবচন্দ্র তাঁহার "নবসংহিতাকে" নববিধান মণ্ডলীর মনুসংহিতারূপেই প্রচার করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকে স্বরচিত বলিয়া মনে করিতেন না। ঈশ্বর-প্রেরণায় তাঁহার অন্তরে যে সকল সত্য প্রকাশিত হইয়াছিল,

তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্ম নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ, মহর্ষি এইরূপই মনে করিতেন। আর পূর্ব্বতন শাস্ত্র সকলও এই প্রণালীতেই প্রকাশিত হইয়াছিল, সকল দেশের শিক্ষিত শাস্ত্রবাদীরাই এ কথা বলেন। সুতরাং সত্যের প্রামাণ্যরূপে শাস্ত্র পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, চিরদিনই থাকিবে।

তবে, সকল শাস্ত্রবাদী একই ভাবে শাস্ত্র মানিয়া চলেন না। অজ্ঞ লোকে শাস্ত্রের শব্দকে আশ্রয় করিয়াই চলে। জ্ঞানিগণ তাহার অর্থের অনুসরণ করেন। প্রাকৃত জনে প্রাকৃত শব্দকোষের দ্বারা শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করে। সাধকেরা নিজ নিজ অন্তরের সাধনাভিজ্ঞতার দ্বারা শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য নিরূপণ করেন। মনীষিগণ বর্ত্তমানের অনুভব দিয়া প্রাচীনকালের অভিজ্ঞতাকে পরীক্ষা করিয়া, সেই প্রাচীন অভিজ্ঞতার বাহিরের উপমান অনুমানাদি হইতে ভিতরের নিভাঁজ প্রত্যক্ষকে পৃথক্ করিয়া, শাস্ত্রের দেহকে উপেক্ষা করিয়া, তাহার প্রাণবস্তুকেই গ্রহণ করেন। এইরূপে যাঁহারা শাস্ত্র-প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যেও সাধকে ও অসাধকে, জ্ঞানীতে ও অজ্ঞানীতে, সাত্ত্বিকে ও তামসিকে, বিস্তর প্রভেদ আছে। তামসিকে, অজ্ঞানীতে, অসাধকে, জড়তা বা কার্পণ্য বশতঃ সচরাচর যে ভাবে শাস্ত্রের প্রামাণ্য মানিয়া থাকে, তাহাকেই শাস্ত্রানুগত্যের একৈক রূপ বা শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলিয়া ধরিলে চলিবে কেন? গ্ল্যাডষ্টোন্, ডীন্ ফেরার কিংবা বিশপ গোরে যে ভাবে খৃষ্টিয়ান্ শাস্ত্রের প্রামাণ্য মানিতেন, আমাদের কেওরা-পুকুরের কাটাকিষ্টও কি সেই ভাবেই বাইবেল্ বুঝে, না মানে? ভগবান্ ভাষ্যকার, রাজা রামমোহন কিংবা ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার যে ভাবে হিন্দুশাস্ত্র প্রামাণ্য মানিতেন, জগন্নাথঘাটে যে সকল দেবল ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়াইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে, তারাও কি সে ভাবে বেদপুরাণাদি বুঝে, না মানে?

সকল দেশেই এমন সকল লোক আছে ও চিরদিন থাকিবে, যাহারা গতানুগতিকভাবেই শাস্ত্রের শাসন মানিয়া চলে ও চলিবে। ধর্ম্ম-বস্তুকে যাহারা নিজের জ্ঞান দিয়া ধরিতে চাহে না, বিচার-যুক্তি দিয়া কষিয়া নিতে জানে না, নিজের প্রত্যক্ষ অনুভব ও অভিজ্ঞতার উপরে ধর্ম্মজীবন গড়িয়া তুলিতে পারে না, যাহারা গড্ডলিকা-প্রবাহের মতন ধর্ম্মের পথে চলে, এমন লোক সর্ব্বত্রই আছে; ইউরোপেও আছে, ভারতবর্ষেও আছে; আমাদের দেশের শাস্ত্রানুগত হিন্দুসমাজেও আছে, শাস্ত্রগুরু-বর্জ্জিত ব্রাহ্মসমাজেও আছে। আর সর্ব্বত্রই এ সকল লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী।

গতানুগতিক হিন্দু দেবতায় বিশ্বাস করেন, কারণ, শাস্ত্র দেবতার কথা বলে। কিন্তু দেবতা বস্তুটি কি, কেন যে দেবতায় বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য, দেবতার শক্তিসাধ্য কি, বিচারযুক্তি দিয়া এ সকল কথার মীমাংসা করেন না।

গতানুগতিক খৃষ্টিয়ান্‌ও সেইরূপ যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, কারণ, বাইবেলে সে কথা লিখিত আছে। ঈশ্বর কে, ঈশ্বরের স্বরূপ কি, ঈশ্বরের পুত্র কিরূপ,—বিচারযুক্তি দিয়া এ সকল কথার মীমাংসা করেন না। বাঙ্গলাদেশের গতানুগতিক হিন্দু বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইলে শীতলার পূজা দেন। ইউরোপের খৃষ্টিয়ান্ মহামারী উপস্থিত হইলে, গীর্জ্জায় যাইয়া যীশুর নিকটে প্রার্থনা করেন। জ্ঞানের নিক্তিতে ওজন করিলে, দুইজনের মধ্যে বেশ-কমটা কি ও কোথায়, বুঝিতে পারি না। গতানুগতিক হিন্দু রোগের ঔষধ পাইবার জন্য তারকেশ্বরে যাইয়া হত্যা দেন; আর জ্ঞানী ও বিশ্বাসী জর্জ্জ মূলার ক্ষুধার অন্নের জন্য দরজা বন্ধ করিয়া যীশুর নিকটে প্রার্থনা করিতেন। ইহাঁদের মধ্যে প্রভেদ কি, বুঝিয়া ওঠা ভার। দুইজনেই প্রাকৃত বিজ্ঞানের আশ্রয় না লইয়া,অতি-প্রাকৃত শক্তির শরণাগত হইয়া আপনার প্রাকৃত অভাব-মোচনের চেষ্টা করেন। হিন্দুর অতিপ্রাকৃত শক্তির একটা প্রত্যক্ষ প্রতীক আছে। জর্জ্জ মূলারের অতি-প্রাকৃত শক্তির এরূপ কোন চাক্ষুষ প্রতীক ছিল না, কেবল একটা মানসপ্রতিমা ছিল—দু'জনার মধ্যে এই ত প্রভেদ। প্রাণের আকুল আর্ত্তনাদ দু'জনারই সমান হইতে পারে। ভক্তেরা বলেন, এই আর্ত্তনাদই আসল বস্তু। কিন্তু যে যুক্তিতর্ক দ্বারা রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের গতানুগতিক ধর্ম্মের ভ্রম-কুসংস্কার দূর করিতে চাহেন, সেই যুক্তিতর্কের দাড়িপাল্লায় ওজন করিলে ইংরাজ জর্জ্জ মূলারের যীশুতে এবং আমাদের গ্রামের মদন বাগ্‌দীর শীতলাতে কোন আত্যন্তিক প্রভেদ পাওয়া যায় কি? অতি-প্রাকৃত যীশুতে অতি-বিশ্বাসী ইংরাজ যদি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, অতি-প্রাকৃত শীতলার আশ্রিত হিন্দু পারিবে না কেন?

এ দেশের প্রাচীনতন্ত্রের হিন্দুগণ শাস্ত্র মানেন। আমরা নবীনতন্ত্রের ব্রাহ্ম, আমরা কোন শাস্ত্র মানি না। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেই কেবল গতানুগতিক লোক আছেন, আমাদের মধ্যে কি নাই? হিন্দু, শাস্ত্রের কথায় ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন; ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজের কথায় ঈশ্বর আছেন, ইহা মানেন। কেন যে ঈশ্বর আছেন, এই ঈশ্বর কিরূপ, হিন্দু তার বিচার করেন না। অধিকাংশ হিন্দুই নিজের অনুভব দিয়া এই ঈশ্বরকে বুঝিবার ও ধরিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে রাজী নহেন। ঈশ্বরের স্বরূপ কি; কেন যে ঈশ্বর সাকার হইতে পারেন না, নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ মাত্র; নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ বস্তু কি, অনুভবে এ বস্তুকে কি ভাবে ধরিতে পারা যায়, এ সকল প্রশ্ন লইয়া কয়জন ব্রাহ্মই বা মাথা ঘামাইয়া থাকেন? বরঞ্চ ব্রাহ্মসমাজের সাত্ত্বিক সাধুগণ পর্য্যন্ত এ সকল প্রশ্নকে "ঢেঁকির কচ্‌কচি" বলিয়া, সাধনের অন্তরায় বোধে, দূরে পরিহার করেন। ঐ গতানুগতিক শাস্ত্রবাদী হিন্দুতে আর এই গতানুগতিক শাস্ত্রবিরোধী ব্রাহ্মেতে কোনও সত্য প্রভেদ আছে কি?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় হইতে—"আমি যাহা বুঝি, আমি যাহা বিশ্বাস করি, তাহাই সত্য; তোমরা তাহাতেই বিশ্বাসস্থাপন করিবে"—সকল ব্রাহ্ম আচার্য্যই ত এই কথা কহিয়া আসিয়াছেন। "আমি যাহা বলিতেছি, তাহা পরখ করিয়া দেখিও, বিচার করিয়া গ্রহণ করিও, সত্যবোধ হইলে গ্রহণ করিও, অসত্যবোধ হইলে বর্জ্জন করিও, বিনা প্রমাণে মানিও না, পরের মুখে ঝাল খাইও না, শাস্ত্রের মুখেও নয়, আমার মুখেও নয়"—শাস্ত্রগুরুবিরোধী ব্রাহ্ম প্রচারকের মুখে ত কোন দিন অমন কথা শুনি নাই। যিনি সদ্‌গুরু, সুশাস্ত্র ও স্বানুভূতির একবাক্যতার উপরে ধর্ম্মের প্রামাণ্য পাইয়াছিলেন, কেবল তাঁরই মুখে ইহার অনুরূপ কথা শুনিয়াছি।

আধ্যাত্মিক ও মানসিক স্বাধীনতার কথা মুখে বলা সহজ, চরিত্রে লাভ করা বড়ই কঠিন। যে এ বস্তু পাইয়াছে, তার সকল বন্ধন মোচন হয়। সে নিজে সত্যভাবে স্বাধীন হইয়াছে বলিয়া, অপরের স্বাধীনতারও যথাযোগ্য মর্য্যাদা করিতে জানে। শাস্ত্রগুরু বর্জ্জন করিয়াও এ বস্তু লাভ না হইতে পারে; শাস্ত্রগুরু বর্জ্জন না করিয়াও ভাগ্যবলে কেহ এই পরমবস্তু লাভ করিতে পারেন। আমরা ত শাস্ত্রগুরু কিছুই মানি না। কিন্তু এই পরমবস্তু লাভ হইয়াছে কি?

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" বলিয়া যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মত ও আদেশ মানিয়া চলিতে নারাজ হইলেন, মহর্ষির প্রভুতার প্রতিকূলে আপনার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেন, শাস্ত্রগুরুবর্জ্জিত ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় ত তখন কেশবচন্দ্রের ও তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণের স্বাভাবিক স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেন না! কালক্রমে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি যখন নিজেদের ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হইয়া, কেশবচন্দ্রের মতের ও কর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া, নিজেদের স্বাধীন মত প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেন, কেশবচন্দ্রও ত তখন বিরোধীদলের স্বাধীনতার মর্য্যাদা করিতে পারিলেন না! নাস্তিক, যুক্তিবাদী, জড়বাদী, অবিশ্বাসী বলিয়া জগতে তাঁহাদের নিন্দাবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন! পণ্ডিত বিজয়-কৃষ্ণ যখন আপনার সাধন-অভিজ্ঞতাতে এমন কোন অপূর্ব্ব বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, যাহা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির জ্ঞানগোচর হয় নাই, তখন এই বেশী দেখার বিষম পাপটা তাঁর পূর্ব্বতন ধর্ম্মবন্ধুগণ ত কিছুতেই সহিতে পারিলেন না; স্পেনের শাস্ত্রবাদী পাদ্রিগণ যেমন তাঁহাদের জ্ঞানের অগোচর একটা বিরাট্ মহাদেশ আছে, এই কথা বলিবার অপরাধে কলম্বসকে সমাজচ্যুত করিতে চাহিয়াছিলেন, সেইরূপ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতৃবর্গ গোস্বামী মহাশয়কে ব্রাহ্মসমাজের বাহির করিয়া দিলেন! যাঁহারা শাস্ত্রশাসন ছাড়িয়াছেন, তাঁরাও নিজের মতের সংকীর্ণ গণ্ডী

ছাড়াইতে পারেন নাই। জগতে স্বাধীন চিন্তার ধ্বজা তুলিতে দাঁড়াইয়াও অপরের চিন্তার স্বাধীনতা সহিতে পারেন নাই।

সুতরাং শাস্ত্রগুরু না মানিলেই যে মানুষ স্বাধীনতার সম্মান করিতে শিখে, অথবা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রজামতের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, কিংবা স্বারাজ্যের যোগ্যতা লাভ করে, কিছুতেই এমন কথা বলা যায় না।

আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে ত কোনও প্রকারের শাস্ত্রানুগত্য এবং আচারবশ্যতা নাই। আর্য্যসমাজেও গতানুগতিক হিন্দুসমাজ অপেক্ষা শাস্ত্রানুগত্য অল্প, আচার-বশ্যতাও বিস্তর কম। কিন্তু তথাপি ইঁহারাও ত রাষ্ট্রীয় স্বত্বস্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার আপদ-বালাই হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে নিজেদের দূরে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

কমলের দুঃখ

দ্বিতীয় স্তবক

আঁধার আসে চোখের পরে জড়িয়ে আসে পাখা,
অন্ধকারে চিকুর হানে যায় না চোখে দেখা ;
বুকের ভারে চল্‌তে নারি বুক ফেটে খান খান,
নিঝর ধারা শুকিয়ে গেছে উঠ্‌ছে হা হা তান।

(ইন্দু—শৈল)

ঠাকুরঝি,

আমার সব ফুরিয়ে গেল—চার বছর ধ'রে যাকে বুকের ভেতর ক'রে রাখ্‌লাম—সে এমন ক'রে কোথায় চ'লে গেল! আমার আর কি নিধি ছিল—কে নিলে ঠাকুরঝি—সে বড় নিষ্ঠুর, বড় নিষ্ঠুর। আমি ত কখন কারো মনে কষ্ট দিই নি—তবে কেন আমি এমন কষ্ট পেলুম? আমি যারে বুকের ভেতর ক'রে রাখ্‌লাম—সে আমার বুকের হাড় খসিয়ে চ'লে গেল—আমি কি কর্‌ব ঠাকুরঝি—আমার কি হ'ল! আমার যে আর দিন কাটে না—কখন্ স্বৃধি ওঠে, কখন্ ডুবে যায়, আমার কিছুই মনে হয় না—আমার মিহির কোথায় গেল, কেউ আমায় ব'লে দিতে পার, সে কোথায়, সে আমার কোথায়? দিন যে কাটে না আর, কি ক'রে দিন কাটাব ঠাকুরঝি! কি এক যাতনার ব্যথায় সমস্ত বুক ভ'রে উঠ্‌ছে, যেই নিশ্বাস পড়্‌ছে—বুকটা যেন একেবারে খালি হয়ে যাচ্ছে—যেন জগতে কিছুই নেই! চোখ দিয়ে, মুখ দিয়ে, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন কাকে ধ'রে রাখ্‌তে যাই—কই, শুধু খালি ব'লে মনে হয়। ঠাকুরঝি! আমি যে চারিদিক্ অন্ধকার দেখ্‌ছি, কি নিয়ে থাক্‌ব ভাই, কি নিয়ে থাক্‌ব—আর ত আমার কিছু নেই, আমার সকল আশার ভরসা ম'রে গেল, কেন এমন হ'ল, কেন এমন হ'ল, আমি ত কারো কিছু করি নি—আমার কেন এমন হ'ল! আর তাকে দেখ্‌তে পাব না, আর তার মা বলা শুন্‌তে পাব না, আর তার বাঁশী বাজান স্বর আমার কানে আস্‌বে না, আর ত সে 'বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব' গাইবে না—কেন এমন হয় ভাই—কেন এমন হয়? কত

দিন ধ'রে সুখের স্বপ্ন গাঁথি—কত সাধ ক'রে কত খেলায় খেলে বেড়াই—কোথা থেকে একটা মুহূর্ত্ত আসে, সব ভেঙ্গে যায়, কেন যায়, কার জন্যে যায়, কেন গেল, কে আমার এমন করলে, আমি ত তার কিছু করি নি। উঃ, মা গো, কেমন ক'রে থাকব! আর যে দিন কাটে না।

এক এক ক'রে সব আমার মনে জাগ্‌ছে। দিন তখন কেমন কেটেছে—কত কাজ, আজ আর কাজও নেই, দিনও কাটে না। কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! জগতের কি ভীষণ নিয়ম! ঠাকুরঝি, কেন এমন বদল হয় বল্‌তে পার? এক এক ক'রে এই কটা বছর কি ক'রে কেটেছে, তাই কেবল মনে পড়্‌ছে, ঘুরে ফিরে তারি দিকে মন ছুটেছে। একটি একটি দিন ছবির মত আমার চোখের উপর ভেসে উঠ্‌ছে—তাই ভাবি—অমনি তার পর আর একটা দিন, আবার তার পর মাথার ভেতর কি রকম ক'রে ওঠে, তার পর সব ছবিগুলো জড়িয়ে একটা কি হয়ে যায়, কিছু মনে থাকে না, যেন সব কি রকম ভুলে যাই—বুকটা যেন ভেঙে যেতে চায় অথচ ভাঙে না—শুধু পাথরের মত ভারী হয়ে ওঠে—আবার যেই নিশ্বাস পড়ে—অমনি যেন ফেটে দু'খানা হয়ে যায়—এমনি ক'রে দিন কাটে অথচ কাটে না। এমন ক'রে আর কটা দিন যাবে—তাই ভাব্‌ছি! ওগো, তোমরা আমায় বল্‌তে পার, কোথায় যাই? ভাই, কেবলই আমার সেই বছরের কথাটা মনে পড়্‌ছে, সেই প্রথমে একদিন ঘরে শুয়ে আছি—উনি শুয়ে শুয়ে বই পড়্‌ছেন—দুপুরবেলা, বসন্ত কালের আলোয় সমস্ত ঘর ভ'রে গেছে—দূরে জানালা দিয়ে দেখা যাচ্চে—দু-একখানা শাদা মেঘ যেন শাদা পাল তুলে নীল আকাশে ভেসে চলেছে—চারিদিক্ থেকে কচি আঁবের গন্ধের সঙ্গে বেলের গন্ধ ভেসে আস্‌ছে, জানালার ধারে একটা অশোক-ফুলের গাছ অশোক-ফুলে ভ'রে গেছে, নিম-ফুলের গন্ধও কেমন মিশিয়ে যাচ্ছে—অশোক-ফুলের গাছের ডালে ব'সে একটা পাখী 'খোকা হ'ক, খোকা হ'ক' ব'লে যেমনি ডেকে উঠেছে, হঠাৎ আমার দেহের মধ্যে যেন কার সাড়া পেলাম, সে কি সুখ, সে কি দুঃখ, সে কি আনন্দের ব্যথা ও জাগরণ, আমি—উঃ! ব'লে তার দুটো পা হাত দিয়ে চেপে ধরেছিলুম—তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হ'ল?' আমি হেসে ফেল্লাম, সেই আমার প্রথম ব্যথা ও জাগরণ, ঠাকুরঝি, আমি আনন্দ, কান্না ও হাসির মাঝে কোথায় ডুবে গেলাম, মনে হ'ল, মা হয়েছি, মনের ভিতরে ইচ্ছা কোথায় কেমন ক'রে লুকিয়ে ছিল, কেমন ধীরে ধীরে কেমন ফুটে উঠ্‌ল, কোথায় লুকিয়েছিল, কেমন যেন কি ক'রে সাড়া দিলে, তার পর জীবন্ত হয়ে সে ইচ্ছা আমার জগতের সব সুখের মাঝে ফুটিয়ে তুললে। তার পর দিন গেল—যেমন ফলে ভরা গাছ নিজেকে সাম্‌লাতে পারে

না, মুইয়ে পড়ে, যেমন থোলো-ভরা আঙ্গুরের লতা—ভারে লুটিয়ে পড়্‌তে চায়, তেমনি মুইয়ে পড়্‌লাম, চল্‌তে যাই, মাঝে মাঝে মাটীতে হাত দিয়ে যেন ব'সে পড়ি। গভীর রাতে একদিন বড় গরম ব'লে ছাদের হাওয়ায় শুয়ে রয়েছি, স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনী নদীর মত ছায়াপথ এ ধার হ'তে ও ধার পর্য্যন্ত চ'লে গেছে, হঠাৎ এক ঝাঁক পাখী সুর ক'রে ডাকতে ডাকতে দক্ষিণদিক্ হ'তে উত্তরদিকে উড়ে গেল—ছায়াপথটি ঢেকে আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। দিদিমার কাছে শুয়েছিলাম, এই পাখী—"পোয়াতী পাশ, পোয়াতী পাশ" ব'লে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়, সে সময় খোলা ছাদে থাক্‌তে নেই, তাদের চোখের মধ্যে পড়্‌তে নেই—যত দিন না ওই পাখীরা ফিরে আসে, তত দিন ছেলে হয় না। পাখী উড়ে যাওয়া দেখে মনে ভয় হ'ল, তবে কি হবে, নিজের পেটে হাত দিয়ে দেখ্‌লাম—সাড়া পাই কি না; বুকে হাত দিয়ে দেখি, বুকটা যেন ঢিপ্ ঢিপ্ কর্‌ছে, তার পর থেকে আশঙ্কায় উদ্বেগে দিন-রাত কাটতে লাগ্‌ল; আবার একদিন রাত্রে দেখি, তারা উত্তরদিক্ হ'তে দক্ষিণে তেমনি ক'রে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল—আমার বুকের ভার ক'মে গেল, তার পরদিন তুলসীতলায় হরির লুট দিলাম। কত মাথা খুঁড়্‌লাম। এমনি ক'রে আশা ও উদ্বেগে দিন কেটে যেতে লাগ্‌ল, ছেঁড়া কাপড়গুলো কত ক'রে গুছিয়ে রাখ্‌তে লাগ্‌লাম। যে যা বলে, তাই করি, কেউ একগাছা রাঙা সুতো বেঁধে দিয়ে গেল, কেউ একটা মাদুলী দিয়ে গেল—যে যা বলে, তাই করি। উনি রকম দেখেন আর হাসেন; আমিও হাসি।

দিন যেতে লাগ্‌ল, তার পর সেই ভয়ানক দিন এল, সে কুদিন কি সুদিন, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি; ব্যথা হ'ল, আমি ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে যেতে লাগ্‌লাম—ধাই মাগী আমার মাথার চুলগুলো নিয়ে মুখের মধ্যে গুঁজে দিতে লাগ্‌ল—আর সমস্ত শরীর তোলপাড় ক'রে ন্যাকার আস্‌তে লাগ্‌ল। ওদিকে ব্যথা বাড়্‌ল, যত যাতনা হয়, ততই মনের ভেতর আনন্দ হয়, আবার ম'রে যাবার ভয় হয়, যত যাতনা ও ব্যথা খুব জোর ক'রে হ'তে লাগ্‌ল, ততই যেন প্রাণের ভেতর আশা ও সঙ্গে সঙ্গে মরণের বিভীষিকা দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। শেষ—সেই শেষ মুহূর্ত্তে এমন ভয়ানক যাতনা হ'ল যে, আমি চীৎকার ক'রে উঠ্‌লাম। তার পর মনে হ'ল, আর কিছু নেই—আর আমি ম'রে গেছি, তার পর যখন জ্ঞান হ'ল, দেখি—আমার সাম্‌নে তুমি ব'সে—তোমার কোলে এক রাশি গোলাপফুল জড় করার মত—এক রাশি শাদা মল্লিকাফুল জড় করার মত এক নতুন জিনিস, এক মাথা কাল কাল চুল, বড় বড় পদ্মর পাপড়ির মত লাল্‌চে আভা দেওয়া ফুটফুট কচ্ছে দুখানি চোখ—ঠিক যেন পদ্মর ও পলার মত দুখানি ঠোঁট। তুমি বল্‌লে, 'এই দেখ্ কেমন ছেলে!' আমার

চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়্‌ল—যেই তাকে আমার কোলে দিলে, আমি আহ্লাদে অধীর হয়ে তাকে বুকে চেপে ধর্‌লুম—সে একেবারে চিলের মত চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। তুমি বল্‌লে, "পোড়ারমুখি—রাক্‌সী—ছেলে কি অমনি ক'রে চট্‌কায়?" আমি তোমার কোলে দিয়ে হাসি ও কান্নার মাঝে দেখ্‌লাম, সে কেমন হাস্‌ছে। তার পর চার দিনের দিন যখন মাই ধরাতে গেলুম—সে এক অপূর্ব্ব ভাব আমার মনের ভেতর জেগে উঠ্‌ল, যেই মাই টানে, আর ভয়ানক ব্যথা মনে হয়—অথচ সে ব্যথা ভাল লাগে, আর ইচ্ছা হয়, সমস্ত নিঙ্‌ড়ে রস তার মুখের মধ্যে ঢেলে দিই। যত মাই টানে, তত লাগে, তত হাসি, সে এক অদ্ভুত। তখন মনে হ'ল—এইবার আমি সত্যি মা হয়েছি। সেই সময়ে উনি এসে দাঁড়ালেন দরজার গোড়ায়, আমিও হেসে ফেল্লাম। দিদিমার মুখে শুনেছিলাম, ষেটেরা পুজোর দিন বিধাতা এসে কপালে সব লিখে দিয়ে যায়; সমস্ত রাত উদ্বেগে দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে রইলুম, ধাই মাগী পায়ের তলায় প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুতে লাগ্‌ল, আমি তাকিয়ে ব'সে রইলুম, কখন্ বিধেতাপুরুষ আসে—কি লেখে দেখ্‌ব! রাত প্রায় ভোর হয়ে এল, তখনও কই কেউ ত এল না; কি আশঙ্কায় কি উদ্বেগে যে রাত কাট্‌তে লাগ্‌ল—তা আর বল্‌তে পারি নে, ভাব্‌লাম, আমার ছেলের কপালে কি বিধেতা কিছু লিখ্‌বেন না—সবারই ত লেখেন। দুর্ব্বল শরীর—ভাব্‌তে ভাব্‌তে খোকার দিকে তাকিয়ে দেখি, সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাস্‌ছে—আমি ধীরে ধীরে সেই ফুটন্ত ফুলের মত ঘুমন্ত জ্যোৎস্নার হাসির ওপর প্রথম চুমু দিলাম, প্রাণ যেন কি ক'রে উঠ্‌ল—সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল; তার পর কখন্ তন্দ্রা এয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছি, দরজার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো এসে পড়েছে,—পল্লীতে লোকের সোরগোল শোনা যাচ্ছে। ভাব্‌লুম, কেন ঘুমিয়ে পড়্‌লাম, বিধেতাপুরুষ ফাঁকি দিয়ে কখন্ এসে কি লিখে দিয়ে গেল? সকালবেলার আলোয় তার কপালটা টেনে দেখ্‌তে গেলাম, কি লেখা হয়েছে, দেখ্‌লাম, কিছুই বোঝা যায় না, কেবল দু একটা লাইনের মত কি—তাও অস্ফুট—বোঝা যায় না, এ রকম। দিনে দিনে এমনিতর সে আশা ও আশঙ্কার মাঝে বাড়্‌তে লাগ্‌ল। চাঁদ দেখ্‌ত—হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাক্‌ত, ছোট ছোট হাত দুখানি বাড়িয়ে হাঁ ক'রে-আনন্দে ধর্‌বে ব'লে ছুটে যেত। আমি হাস্‌তাম, সেও হাস্‌ত—একবার আমার মুখের পানে চেয়ে আবার ফিরে চাঁদের পানে চাইত, একবার হাত দিয়ে আমার মুখখানি ধর্‌ত, আর একবার সেই ছোট হাত চাঁদের কাছে বাড়িয়ে দিত—আমার মুখ ধ'রে হাস্‌ত, চাঁদ পেত না ব'লে কাঁদ্‌ত। আগে এত এ সব মনে পড়্‌ত না। আজ কেবল সেই সব এক এক ক'রে মনে পড়্‌ছে—আর প্রাণটা যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কি পরিবর্ত্তন! যে দিন খুব মেঘ

ক'রে বর্ষা ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে আস্‌ত, ছুটে ছুটে ভিজ্‌তে যেত, বাজ পড়্‌ত, বিদ্যুৎ চমকাত, প্রথমটা চোখ কেমন ক'রে উঠে তার পর হাততালি দিয়ে নাচ্‌ত—সে তার কি আনন্দ—কত ব'লে, ধ'রে, মেরে তবে তাকে ঘুম পাড়াই—তবে সে ঘুমুত। বর্ষার গান তার বড় ভাল লাগ্‌ত, তাই বুঝি সে বর্ষায় চ'লে গেল—আমার যে ঠাকুরঝি, তার সেই গান গাওয়া মনে পড়্‌ছে।

সে গান গাইত আর নাচ্‌ত—কত রকম কর্‌ত, তুলসীমঞ্চে যেমন ঝারা বিন্দু বিন্দু ক'রে পড়ে, তেমনি আমার হৃদয়-তুলসী মিহিরকে আমি আমার প্রাণের অক্ষয় স্নেহধারা দিয়ে তাকে প্রাণ ভ'রে রেখেছিলাম, তবু আমার প্রাণের মাঝে থেকেও সে তুলসী শুকিয়ে গেল। আমি কি কর্‌ব! আমি কি কর্‌ব! কেবলই আমার সেই সব কথা মনে পড়ে—আর যেন কি হয়ে যায়! আলোয় আলোয় এসেছিল, আঁধারে আঁধারে চ'লে গেল। ঠাকুরঝি, বলতে পার, কোথায় যায়, সেখানে ত তার মা নেই, সে যে আমার দুরন্ত ছেলে, সে যে আমার কাছ-ছাড়া একদণ্ড থাক্‌তে পার্‌ত না—মায়ার কোলে থাক্‌ত, কিন্তু আমাকে কাছে ব'সে থাক্‌তে হ'ত—সে যে আমায় মেরে চুল ছিঁড়ে ছোট ছোট হাতে কীল মেরে শেষে কেঁদে গলা জড়িয়ে ধর্‌ত, সে কার কাছে আর এমন কর্‌বে—আমায় ত সে ডেকে নিয়ে গেল না, সেখানে ত তার মা নেই, তাকে কে দেখ্‌বে ঠাকুরঝি, সে কি সেখানে থাক্‌তে পার্‌বে, সে কোথায় কোন্‌ মেঘের রাজ্য, পরীর দেশ, তার ত ডানা নেই, সে ত তাদের মত উড়্‌তে পার্‌বে না। না, সেখানে গেলে বুঝি ওই সব ছবির মত সোন্দর ছেলেদের সঙ্গে থাক্‌লে, আলোর ছটার মত ডানা বেরিয়ে উড়ে উড়ে খেলা করে। আমার মনে হচ্ছে, যেন আমার তন্দ্রার মত এল, আর মায়ার কোল থেকে কে যেন তাকে তুলে নিয়ে গেল। আহা—হা—হা—সে আমার কোথায় গেল গো, কোথায় গেল! বাবা! কোথা গেলি বাবা, একদিন ছেড়ে যে থাক্‌তে পার্‌তে না—একবার চোখের আড় কর্‌তে প্রাণ বেরিয়ে যেত, আজ যে কদিন কেটে গেল—ঠাকুরঝি, সত্যি আমি পাষাণী, নইলে মিহির ছেড়ে এখন বেঁচে আছি? আমায় ডেকে নে বাবা, ডেকে নে—আর যে তোমার সেখানে কেউ নেই বাবা। ঠাকুরঝি! এক একবার ভাবি, আমি কি পাগল হব—না হয়েছি, কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি কেন। চুপ ক'রে ব'সে আছি, যেমন মেঘ ডেকে উঠ্‌ল, অমনি যেন বুকের মাঝে কাকে জড়িয়ে ধর্‌তে যাই। আহা! সে যে মেঘের ডাক শুন্‌লেই আমাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধর্‌ত—যত শন্‌ শন্‌ ক'রে বাতাস বইছে, তত যেন মনে হচ্ছে, সে আমায় ডাক্‌ছে—এ কি! ওই যে মা—মা,—মা—ব'লে ডাক্‌ছে ঠাকুরঝি! ... ... ওই যে গো তোমরা শুন্‌তে পাচ্ছ না—ওই যে

ডাক্‌ছে, ওই শোন না, বাতাসের ভেতর কান পেতে শোন, ঢেউয়ের মত হেলে দুলে আস্‌ছে, ওই ডাক্‌ছে, কেন ডাক্‌ছে, সে ত জানে, আমি এখন যেতে পারিনে, ওই চাঁদখানা যেন কটমট ক'রে তাকিয়ে রয়েছে,—আমি কি ক'রে যাই, সব যে শূন্য, পথও নেই, শূন্যের মাঝে কোথায় হাতড়াব। না—না, এ সব বুঝি আমার মাথার খেয়াল, সব ভুল, কেমন হয়েছে, ও সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। এটা কি গাছ ও মানুষটার নাম, ওখানা কি কিছুই মনে কর্‌তে পার্‌ছি নি—মনে পড়্‌ছে, আবার তখনি ভুল হয়ে যাচ্ছে। আমার যেন কিসের, কোন সুতোর খেই হারিয়ে ফেলেছি, কাকেও আর টান্‌তে পার্‌ছি নি—একলা ব'সে আছি, আকাশের মত ফাঁকা কিছু নেই—খালি সব যেন খালি হ'য়ে গেছে।

ঠাকুরঝি! আমার মনে হ'চ্চে যেন, আমি নরক থেকে উঠে এলাম, আমার নইলে এত সাহস যে, মুখে এমন ক'রে এই সব বল্‌তে পাচ্ছি। যত দিন না কেউ মা হয়, তত দিন এ জ্বালা কেউ জানে না, বল্‌তেও পারে না। এ যে কি মজ্জায় মজ্জায় তার ভেতর পর্য্যন্ত পুড়িয়ে ছাই করে, তা জানে না। মনে হয়, বুঝি যাদের ছেলে হয়নি, তারা বেশ আছে—তা নয়, তুমি আমার ভুল বুঝ্‌তে পাচ্ছ, অথচ একটা ছেলের অভাবে সংসার ধুলো হয়ে উড়ে যায়। কি জানি, কি ভাবি, কি যে বলি, তার কিছুরই ঠিক নেই। উনি যখন এসে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, খোকা কোথা, যখন খোকা খোকা ব'লে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডাক্‌তে ডাক্‌তে আস্‌বেন, তখন কে তাঁরে উত্তর দেবে? আর আমি হতভাগীই তাঁরে কি উত্তর দেব, তিনি যে আমার কোলে তাঁর প্রাণের স্বরূপকে দিয়েছিলেন, তা আমি কোন্ অগাধ জলে হেলায় হারালাম! আমি রাক্ষসী, আমি তাকে খেয়ে ব'সে রইলাম! ভাব্‌ছি, ওঁকে কে দেখ্‌বে, আমারও এই অবস্থা, উঃ, আমার বাছাকে কে কেড়ে নিয়ে গেল? ভাই, উঃ, প্রাণটা যেন কি হয়ে গেছে, কি কর্‌ব, কি যে হবে, কি যে হ'ল, এ সব আর মনে থাকে না—আহা-হা-হা! জুড়ুতে চাই, কিন্তু কোথায় গেলে যে জুড়ন পাই, বল্‌তে পার? কে এমন আছে যে, এ জ্বালা আমায় ভুলিয়ে দিতে পারে—যে মৃত্যু আমায় এ জ্বালা দিয়েছে, সেই এ জ্বালা নিবুতে পারে। কি যে লিখ্‌ছি, কি যে বল্‌ছি, কেনই যে এ বল্‌লাম, তাও মনে কেমন হচ্ছে—কি করি ঠাকুরঝি! আমি ত তবু তোমায় বল্‌তে পার্‌ছি, মারা কেবল প'ড়ে প'ড়ে 'বাপ্‌রে আমার' ক'রে চেঁচাচ্ছে। আহা, ছুঁড়ী এল জুড়ুতে, আর আমার ভাঙ্গা কপাল—তার জ্বলুনি বাড়্‌ল। আমি এমনি হতভাগী যে, আমি বেশ চুপ ক'রে সব ত সইছি। কেবল ভাব্‌ছি—সে দিন কেমন ছিল, আজ এ কেমন! সে দিন যে দিকে চাইতাম, সেই দিকে হাসি—আজ যে দিকে চাই, সে দিকে কান্না। এমনি বদল! কত দিনে এ জ্বালা ভুলব,

কত দিনে এ সমস্ত ফেলে দিয়ে চোখ বুজ্‌ব! কত দিনে! উঃ—কত দিনে! কাল কারো কথা শুন্‌তে চায় না, সে বড় নিঠুর, সে মা'র চেখের জল মানে না—কিন্তু কমল কি ক'রে এমন নিঠুর হ'ল, কি ক'রে সে মায়ার কোল থেকে—আমার—আমার—আমার—আমার তাকে কেড়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, একটু কি মায়া হ'ল না তার! ঠাকুরঝি, কোথায় যাই—আর যেন কারুকে মুখ দেখাতে ইচ্ছে হয় না—সূয্যির পানে সকালবেলা আর তাকাতে পারিনে তুলসীতলায় দীপ দিতে যেতে পারি নি—সে এইখানে 'নমঃ' কর্‌ত; ঘরের মধ্যে শুতে যেতে পারিনি, সব জিনিষে তার ছায়া দেখি, খাবার সময় ছোট গেলাসটি দেখে খাওয়া ভুলে যাই, প্রাণ কেমন ক'রে উঠে, মায়া এমন হয়ে পড়েছে—তাকে আমায় দেখ্‌তে হয়—আহা, সে ওই ছেলেটাকে বুকে ক'রে দিন কাটাতে শিখ্‌ছিল—সে এমন যে তাকেও কাঁদিয়ে চ'লে গেল। ঠাকুরঝি! তোমায় ওরা জানায় নি, আমি যে না জানিয়ে থাক্‌তে পার্‌লাম না, তোমার চিঠি পেয়ে কি লিখ্‌ব, কি উত্তর দেব, ভাব্‌তে ভাব্‌তে কতই লিখে ফেল্‌লাম, জানি না, লোকের এ সংসারের সাধ কেন হয়—বড় জ্বালা গো বড় জ্বালা— মা হওয়া বড় জ্বালা! কত পাপ করেছিলুম যে, এত নূতন সুখের তারার আলোয় দীপ জ্বেলে—তাতে আশা বাড়িয়ে তখনি তখনি নিরাশ কর্‌লে। বড় আশা ক'রে তার মুখ চেয়ে ছিলুম, অন্ধকার—আমার চোখের ওপর—আঁধার কালি ঢেলে দিয়ে সে মুখখানি মুছে গেল। আজ যেন সমস্ত জীবনটাই আমার এ স্বপ্নের মত লাগ্‌ছে, কবে তার জাগরণ হবে, তা জানিনে। কেবল মনে হচ্চে, তাঁকে আমি কি উত্তর দিব, তাঁকে আমি কি ক'রে বুঝাব, তাঁর প্রাণের আঘাত আমি আর কেমন ক'রে মুছ্‌তে পার্‌ব। বুঝ্‌তে পারি নে, কি হবে—কি কর্‌ব। আর যেন সব ভেঙে শরীর-মন কোথায় যেন মিশিয়ে যেতে চায়। কি কর্‌ব ভাই !!!

(মায়া—শৈল)

বড়দি! বড়দি! আর পারি নি—এ পোড়া শনির মত যেখানে যাই, যার দিকে তাকাই, অমনি তার মাথা উড়ে যায়। সেখানেই এক অনর্থ ঘটে। আমি যে কুটোটা ধ'রে জীবনকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, সেই কুটোটাই ভেসে যায়। কি হ'ল বড়দি, আমি কেন এমন কপাল নিয়ে জন্মালাম, আমার কেন আগে মরণ হ'ল না? আমিই না হয় মরি, ম'লে যদি নিজের ও পরের সকলের যন্ত্রণা নিভে যায়। কি কর্‌ব, কি কর্‌ব! তুমি একবার এলে না কেন—একবার কি আস্‌তে নেই—কি হয়ে গেল, —আমি এলাম আর এই ক'মাসের মধ্যে কি হয়ে গেল—আমিই সব অমঙ্গলের কেতু —যেখানে যাই, সেখানেই মাথা-কাটার ছায়া পড়ে, সব ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায়! দিদি,

কেন তোমরা আমায় এত আদর করতে, কেন তোমরা আমার রূপের কথা ব'লে এত সুখ্যাতি করতে—এত গরব এ পোড়ারমুখী রাক্ষুসীর কেন বাড়িয়েছিলে—তাই তার আজ এই দুর্দশা। তখন কেন দূর করলে না—এ অমঙ্গলের ছায়া আর কার ঘরে এমন ক'রে পড়ত না। যেখানে যাই, সেখানেই মহামারীর বিষ ছড়াতে ছড়াতে যাই; কেবল মৃত্যু আর অশান্তি এনে দিই—আমার জীবনে ধিক্, এমন জীবনে কি কাজ,—যদি কখন কিছু হ'ল না। যদি কখন কোন শান্তি নিজের মনে বা পরের মনে আমা হ'তে হ'ল না, তবে আবার আমার এমন জীবনে কিসের কাজ—দিন-রাত তিল তিল ক'রে তুঁষের আগুন বুকের ভিতর ভ'রে রেখে, আপনার আগুনে আপনি জ্বলে জ্বলে দিন কাটাব। পলে পলে দিনে সহস্রবার মরণ ছড়িয়ে—নিজে পেতিনীর মত এলোচুলে শ্মশান জাগিয়ে ব'সে থাকব। ওগো! এ যাতনা আমি কোথায় তুলে রাখব গো, আমার মিহির কেন গেল—কেন গেল—তোমরা আমায় ব'লে দাও, কেন, আমার কি দোষ, আমি কেন এই মৃত্যুর ছায়া হয়ে রইলাম! আহা, সে কেন আমার বাতাসে উড়ে গেল—আমার মিহির কেন গেল, কেন গেল? বড়দি, আমার চেয়ে দুঃখী কে আছে দিদি! মানুষ জন্মে কত সাধ করে, আমার কোন্ সাধটা পূর্ণ হ'ল বল। আমার এই কুড়ি বছর বয়সে কি পাপে এমন দুর্দশা হ'ল বলতে পার? যা চাইলাম, তা পেলাম না, যা পেলাম, সে তীব্র বিষ। একটা মাণিক আঁচলে গেরো দিতে গেলাম, আলগা গেরোয় সে মাণিক জলে গড়িয়ে পড়ল। পরের ধন কারো হয় না; কিন্তু তার কেন গেল,আমি ছুঁয়েছিলাম ব'লে—এর চেয়ে আর কি দুঃখ দিদি! তোমার ঠাকুর আছে, দেবতা আছে, বামুন আছে, সংসারে অন্নপূর্ণা হয়ে আছ; আমার কি আছে?—কিছু নেই। পরের আনন্দের একটা ফোঁটা যা তাদের উপছে পাত্র থেকে প'ড়ে যাচ্ছিল, তাই লোলুপ হয়ে আগ্রহে এ মরুর তৃষা মিটাতে গিয়েছিলুম, পাত্র শুদ্ধ উল্টে গেল, মরুভূঁয়ে সব রস নিমেষে হরণ করলে—আমার নিশ্বাসে সব ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল। এ কি কম দুঃখ? ফুলটা বুকে ক'রে ক'রে বেড়ালাম, এমনি নিশ্বাসের তাপ, ঝলসে পুড়ে ছাই হয়ে গেল; এ কি কম দুঃখ? অদৃষ্টকে যে দেখতে পাই নি, তা হ'লে বলতাম, তোমার সব দান ফিরিয়ে নাও, আমায় শুধু মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও! কে জানে, মানুষ নিজের অদৃষ্ট নিজে গড়ে কি না—আমার এ ভাঙাকপাল কি জোড়া লাগে। তাই যেখানে যাই, তাদেরও কপাল ভেঙে যায়। কিন্তু সে আমার অদৃষ্ট—সে আমার কপাল ভেঙে দিয়ে এখন কথা শেখা শিখতে চায়। সেই ত আমার কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে গেল—নইলে যম আমায় না নিয়ে আমার কোল থেকে তাকে নিয়ে যেতে পারত না। পাঁচটি দিন—আহা, পাঁচটি দিন আমার বাছার জ্বর হয়েছিল গো; এই পাঁচটি দিনে সব নিঃশেষ হয়ে সবাইকে অথৈ জলে ফেলে চ'লে গেল!

উঃ, সে কি গায়ের তাপ, সে কি ধনুষ্টঙ্কার, সমস্ত শরীরটা যেন বেঁকে তেউড়ে নীল হয়ে যেতে লাগ্‌ল; এমন যাতনা কখন দেখিনি; দুদিন দুরাত অবিরত অমনি হয়ে কেটেছে। ডাক্তারগুলোই মেরে ফেল্লে; ওরাই ত মাল্লে; কেবল সর্ব্বাঙ্গে বিষ ভ'রে ভ'রে দিতে লাগ্‌ল, শেষদিনে সকালে কেবল যেন সব কমে এল, সে সব ভাব পরিষ্কার হয়ে গেল, মুখের ভাব যেন ফিরে গেল, হঠাৎ যখন সন্ধ্যে হ'ল, তখন কেবল 'কমল মামা, কমল মামা' কর্‌তে লাগ্‌ল। তার পর কি করম হ'ল, জ্বর যেন ক'মে এসে হাঁপাতে লাগ্‌ল। আমি ভাব্‌লাম, দুর্ব্বল হ'য়েছে, দুধ দিতে গেলাম—কস বেয়ে প'ড়ে গেল। আমি কি জানি—কেঁদে উঠ্‌লাম। তার পর ডাক্তার এল, আবার সেই কি ফুঁড়ে ওষুধ দিলে, তার পরই যেন ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়্‌ল। তার পর দেখি, নিশ্বেস পড়্‌ছে না—সব যেন হিম বরফ—আমি আছ্‌ড়ে পড়্‌লুম বুকে জড়িয়ে। ডাক্তার চোখে রুমাল চাপা দিয়ে চ'লে গেল, কণ্ঠাটা তখনও একটু গরম; ভাব্‌লাম, তবে কি প্রাণ এখনো আছে? তখন বাড়ীতে কেউ নেই, অমরও ডাক্তারের বাড়ী ফের ছুটেছে। তার পর যখন ডাক্তার এল; তখন বল্‌লে, "ওঃ! হয়ে গেছে।" আমারই কোলে গেল, আমি রাক্ষুসী ব'সে ব'সে তাই দেখ্‌লাম। দেখ বড়দি, যখন বড় ভয়ানক হয়ে ওঠে, বুকের ভেতর কেমন করে, তখন খুব চেঁচাই—চেঁচিয়ে যেন একটু ভার নেবে যায়—আবার চোখ মুছে উঠে দেখি, দরজার কোলে হাঁ ক'রে আকাশপানে চেয়ে ব'সে আছে। সাড়া নেই, শব্দ নেই—ডাক্‌লে উত্তর নেই, যেন পাথর-গায়ে হাত দিলে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে—"এঁ্যা"—আমি জড়িয়ে ধ'রে খুব কাঁদি, সে তখন আমার কত বোঝায়, কত রকমে চুপ করায়—বলে—'গেছে তা গেছে'—আঁচল দিয়ে আমার চোখ মুছে বুকের ভেতর ক'রে নেয়, এমন মার মতন বোনের আমার কি হ'ল—এমন দিদি আর আমি কোথায় পাব! এমন শোকও মানুষ সাম্‌লাতে পারে!

মিহিরকে বুকে ক'রে আমার যেন আর সব দুঃখ ভুল্‌তে শিখেছিলুম। জলবিম্বের উপরে কত রকম রঙে আঁকার মত আমার কাছে সে এল, তার পর হাওয়া হয়ে উবে গেল—কোথাও তাকে আর খুঁজে পাই নে। আমি ত অমনি যাই না—এই আশ্চর্য্য। দিদিকে দেখে প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে, কি হবে দিদি, তুমি কি একবার আস্‌বে না? আর যেন ভাব্‌তেও পারি না। কাল দেখি- তোমায় চিঠি লিখ্‌তে লিখ্‌তে অজ্ঞান হয়ে মেজেয় প'ড়ে আছে। কলমটা হাতের কাছে প'ড়ে হাতের একপাশে ফুটে গেছে—সাড়ও নেই, শব্দও নেই—সংজ্ঞাও নেই। কতক্ষণ পরে জলের ঝাপ্‌টা দিতে দিতে তবে জ্ঞান হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'বাবা, আবার আমায় ডাক্‌ছ কেন বাবা?' তার পর আবার অজ্ঞান হয়ে পড়্‌ল। আজ দেখ্‌ছি, কেবলই হাস্‌ছে—কে

জানে কি হবে। শেষ এতও আমাদের অদৃষ্টে ছিল! সুধীর এখনও আসেন নি, তাঁকেও এ খবর দেওয়া হয় নি। কি করতে কি হবে, তা বুঝতে পারি না। তুমি কি একবার আসবে না? তুমি একবারও এলে না কেন? এত হয়ে গেল, তুমি কি একবারও আসতে পারলে না?

কমল সেই রাত্তিরের পর থেকে আর আসে নি—আসে নি কেন, তাও আমি বুঝেছি, আমিই তার কারণ। যে যেখানে শান্তি আনে, সে আমাকে দেখলেই দূরে পালায়। খুব ভাল যাদের দেখলে, যাদের কথা শুনলে, যারা একটু আশা পায়, একটু প্রাণে এ দুঃখের অপার সাগরে কূল পায়,—তারাও আর দেখা দিতে চায় না। এমন সাপিনীর নিশ্বাস যে, কেউ সে বিষাক্ত বাতাসের কাছে আসতে পারে না।

ভাবছি কেবল, যেমন একটা সাপ—কালনাগিনী—দেখলে লোকের চোখ জুড়িয়ে যায়, আবার প্রাণ কেঁপে ওঠে—আমি ঠিক তেমনি! লোকে আদর ক'রে প্রাণ ধ'রে আমায় তাদের সকল সুখ—সকল আনন্দ ঢেলে দিতে চায়—আমি এমনি যে, তাদের অমনি বিষ ঢেলে দিই। তারা জ'রে ছারখার হয়ে যায়। হায়! কি ক'রে এমন ক'রে জীবনকে বয়ে নিয়ে বেড়াব! কমল একদিন বলেছিল, 'তুমি যেখান দিয়ে যাও, সব পোড়াতে পোড়াতে যাও,' আজ তার কথার মানে বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করব! প্রাণের এ আবেগ রোধ করা জলপ্রপাতকে বাঁধ দিতে যাওয়ার মত হবে;—গ'র্জ্জে শিলাগুলো গুঁড় করে, আরো উঁচু হয়ে ছাপিয়ে জল ছুটবে। তাই বুঝি এমন হ'ল। তাই সে আর দেখে না। কে জানে, আরো এ কপালে কি লেখা আছে। আরো কত না জানি—কত ঘরে অমঙ্গলের হাওয়া হিম-বরফের মত অসাড় ক'রে ঢেলে দেব। ভাবলাম, সব জ্বালা থেকে জুড়ব—আর সইতে পারিনে, এইখানে এসে একটু জুড়ই—তা হ'ল না—আরো তাদের জ্বালা বাড়িয়ে নিজের আগুনে নূতন ইন্ধন যোগালুম। কিন্তু তাই কি—আমার জন্যেই কি সে গেল—সত্যি কি আমি বিষফোড়ার মত সব বিষে ভরিয়ে দিলাম—সত্যি কি প্লেগের মত—ঘোর মহামারীর মত যেখান দিয়ে যাচ্ছি, সেখানে কান্নার রোল উঠছে—কে জানে, নিজেকে বুঝতে পাচ্ছি নি, কি যেন দারুণ অভিশাপ মাথায় বয়ে ফিরছি, বুঝতে পাচ্ছি নি, কোথায় এ পসরার ভার রাখি, কোথায় এ তীব্র জ্বালার অভিশাপ কোন্ সাগরের বারি দিয়ে নির্ব্বাণ করি। এ যেন রাশীকৃত অগ্নি আমার মধ্যে জ্বলে উঠেছে, আমি তার দাহনে তাপিত হয়ে ছুটে যাচ্ছি—যেখান দিয়ে যাচ্ছি, বনে দাবানল জ্বলে উঠছে—আর সবাই সভয়ে সন্ত্রস্তে পালিয়ে যাচ্ছে! ঠিক যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে কাপড়ে আঁচলে চুলে আগুন লেগেছে—আমি তা ফেলে সেই আগুন থেকে পালাতে যাই—আমার আগুন আমার সঙ্গে যায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

গান

প্রাণের মাঝে ডাকে বাঁশী
ওই যে, বাজে, ওই শোন না,
(আমার) সকল রসে মজল যে মন
লাজের বাধা আর মানে না।

মন-বনের গহন কোণে
কে বাজায় আর কেবা শোনে,
এ দেহ হল ব্রজের মাটী—
নয়ন ধারে বয় যমুনা।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা,

আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩২৪ সাল

সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	আগমনী	...	রামপ্রসাদ সেন	৮১৫
২।	বুদ্ধিমানের কর্ম্ম	...	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	৮১৬
৩।	চিরসঙ্গী (কবিতা)	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৮৪১
৪।	কণ্ঠের কঠোর মূর্ত্তি	...	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৮৪২
৫।	সে আসিল না (কবিতা)	...	শ্রীসুধাময়ী সেন	৮৫৯
৬।	কমলের দুঃখ	...	শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৮৫১
৭।	মায়ের ডাক (কবিতা)	...	শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ	৮৬৭
৮।	ভূতের বেগার	...	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৮৬৯
৯।	শিশির বিন্দু (কবিতা)	...	শ্রীহেরম্বনাথ পাণ্ডিত	৮৮২
১০।	প্রাচীন রাজগৃহ	...	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	৮৮৩
১১।	বিজয়া (কবিতা)	...	শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি, এ,	৮৯২
১২।	বেদনার বৈচিত্তি	...	শ্রীজগদম্বা দেবী	৮৯৩
১৩।	চার ইয়ারী কথা	...	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক	৮৯৬
১৪।	পান্থের প্রতি	...	শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী	৯০১
১৫।	নির্ম্মোকসার চিন্তামণি	...	শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	৯০৩
১৬।	শেষ বেলায়	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৯০৮
১৭।	ছেঁড়া ফুল	...	শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৯১০
১৮।	জীবন ও জীবনের ধর্ম্ম'	...	শ্রীআশালতা সেন	৯১৫
১৯।	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী	৯২২
২০।	মহীসুর ভ্রমণ	...	শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	৯৩১
২১।	সামর্থা (কবিতা)	..	শ্রীবহুবল্লভ গোস্বামী	৯৪২
২২।	শকুন্তলার মা	...	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৯৪৪
২৩।	বিজয়া	..	রামপ্রসাদদ সেন	৯৫০

কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
'বসুমতী প্রেসে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম ও ষষ্ঠ সংখ্যা] [আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩২৪

আগমনী

পিলু-বাহার—যৎ।

গিরি এবার আমার উমা এলে,
আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ কারো কথা শুনবো না॥
যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া
জামাই ব'লে মানবো না।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে,
ঘরের ভাবনা ভাবে না।

রামপ্রসাদ সেন।

বুদ্ধিমানের কর্ম্ম

(২)

(ভাদ্রের নারায়ণের ৮০৩ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

ফলতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্মতত্ব, পরলোকতত্ত্ব,—এ সকল যতক্ষণ না প্রত্যক্ষ হইয়াছে, ততক্ষণ সত্য ধর্ম্মলাভ হইল, যাঁরা এরূপ মনে করেন না; শাস্ত্রের উপদেশে বা গুরুর কথায় ঈশ্বর আছেন, কেবল এইমাত্র শুনিয়া কিছুতেই যাঁরা জীবনে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করেন না ও করিতে পারেন না; এমন লোক সংসারে অতি বিরল,—শাস্ত্রানুগত ধর্ম্মেও অতি বিরল, শাস্ত্রবর্জ্জিত ধর্ম্মেও অতি বিরল—লাখে না মিলয়ে এক। এ সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষেরাই কেবল পদে পদে শাস্ত্র-গুরু-উপদেশকে আপনার অন্তরের প্রত্যক্ষ অনুভব দিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে ধর্ম্মপথে ও কর্ম্মপথে চলিয়া থাকেন। বাকি নিরনব্বই হাজার নয়শত নিরনব্বই জনই জীবনে পরমতা-নুবর্ত্তন ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া যা-কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন করিতে চেষ্টা করেন। কেহ বা প্রাচীন সংস্কার মানিয়া চলেন, কেহ বা নবীন সংস্কার মানিয়া চলেন। গতানু-গতিক হিন্দু তিন হাজার বৎসরের সংস্কারের দাস। আমরা, গতানুগতিক ব্রাহ্ম, ত্রিশ বৎসরের সংস্কারের দাস। সংস্কারের দাস নয় কে? সত্যের প্রত্যক্ষলাভ হইলেই কেবল সর্ব্বসংস্কার-মোচন হয়। কিন্তু সত্যের অপরোক্ষ অনুভবলাভ কয় জনার ভাগ্যে ঘটে?

কোনও সংস্কার মানিব না, তিন হাজার বৎসরেরও নহে, ত্রিশ বৎসরেরও নহে —বেশ কথা। অন্তরে যে কর্ত্তাপুরুষ আছেন, কেবল তাঁহাকেই মানিয়া চলিব, বাহিরের কোনও কর্ত্তৃত্বের অধীনে থাকিব না,—শাস্ত্রেরও নহে, গুরুরও নহে; এক জন রামমোহনেরও নহে, বারজন রাজারও নহে; স্মৃতিরও নহে, সমিতিরও নহে;—অতি উত্তম কথা। এই সংকল্প লইয়া যে জীবনপথে ও সাধনপথে দাঁড়াইতে পারে এবং জীবনের সকল বিষয়ে বিশ্বের প্রতি যথাসাধ্য উদাসীন হইয়া, কেবল নিজের কাছে খাঁটি থাকিতে চাহে, তাঁহাকে মাথায় করিয়া লই।

কিন্তু এ যে করিতে পারে, আমরা যাহা মানি, সে যে তাহাও মানিয়া চলিবে, তার ত কোনও স্থিরতা নাই। সে ঈশ্বর মানিতেও পারে, নাও বা মানিতে পারে। ঈশ্বর সাকার, সে ইহাও মানিতে পারে; ঈশ্বর নিরাকার, ইহাও মানিতে পারে। তার নিজের বিচার-বুদ্ধিতে যাহা সত্য বলিয়া বোধ হইবে, সে ত কেবল তাহাই

মানিবে। সে পরকাল মানিতেও পারে, নাও বা মানিতে পারে। সে জাতিভেদ ভালও বলিতে পারে, মন্দও বলিতে পারে। যে সকল মত স্বীকার করিয়া আমরা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হই, সে তার সবকটাই মানিতে পারে, একটাও না মানিতে পারে। এমন কি, আমরা আজকাল যাহাকে নীতি বলি, খৃষ্টীয়ানেরা যাহাকে দশাজ্ঞার বেড়া দিয়া ঘেরিয়া রাখিয়াছে, ইংরাজ যাহাকে মর‍্যালিটি বলে, আমাদের প্রাচীনেরা যাহাকে ধর্ম্ম কহিতেন,—সে তাহাও মানিতে পারে, নাও বা মানিতে পারে। সংস্কারের প্রভুত্ব যদি নষ্ট করিতে হয়, তবে এতটা বুকের পাটা থাকা চাই যে, যে ঈশ্বর মানিবে না, পরকাল মানিবে না, নীতি মানিবে না, ধর্ম্ম মানিবে না,—কেবল নিজের নিকটে খাঁটি থাকিয়া জীবনপথে চলিবে এবং নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া অপরের স্বাধীনতা নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করিবে না, এইটুকু মাত্র মানিয়া চলিবে,—তাহাকেও মাথায় করিয়া লইতে হইবে।

এরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে কেহ কেহ অরাজকতা বলিতে পারেন। কিন্তু এ অরাজকতা প্রাকৃতজনের সমাজদ্রোহী অরাজকতা নহে। ইউরোপে ইহাকেই দার্শনিক অরাজকতা বা Philosophic Anarchism বলে। আর রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল হইতে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদকে আশ্রয় করিয়া আত্মমত প্রচার করিতেছেন, এই দার্শনিক অরাজকতাই তার শেষ কথা ও অপরিহার্য্য পরিণাম। এই দার্শনিক অরাজকতা বা Philosophic Anarchism হেয় বস্তু নহে। যেখানে এবস্তু বাহিরের আমদানী নয়, কিন্তু ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেখানে তাহাকে শ্রদ্ধাভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি।

কিন্তু এই তন্ত্রে কেবল পুরাতন শাস্ত্রবিধিরই নহে, বাহিরের কোনবিধ শাসনেরই তিলার্দ্ধ স্থান নাই। এই তন্ত্রে পূর্ণ সাম্য, পূর্ণ স্বাধীনতা, পূর্ণ মৈত্রীর হীরক-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। এ পথে লৌকিক নাস্তিক্যের ভিতর দিয়াই সত্য আস্তিক্যের, লৌকিক অধর্ম্মের ভিতর দিয়াই সত্য ধর্ম্মের, লৌকিক অনাচারের মধ্য দিয়াই সত্য আচারের এবং লোকে যাহাকে স্বেচ্ছাচার বলিবে, তাহার ভিতর দিয়াই সত্য স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয় না।

আর ইহার কারণ এই যে আস্তিক্য, ধর্ম্ম, আচার, স্বাধীনতা, এ সকল বস্তু কেহ কোনও দিন সত্যভাবে বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে পারে না। প্রত্যেকের ভিতর হইতেই এ সকল ফুটিয়া উঠে। এ সকল বস্তু মানুষের প্রকৃতিগত। প্রত্যেক লোক যদি সত্যভাবে আপনার প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া চলে ও চলিতে পারে, তবে ঋজুকুটিল যে পথেই হউক না কেন, সে সেই প্রকৃতির অভিব্যক্তির সঙ্গে

সঙ্গেই তার সত্যধর্মকেও প্রাপ্ত হইবে। এই ধর্ম্মই তার স্ব-ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মেই তার জীবনের চরম সার্থকতালাভ সম্ভব। এই জন্যই আমাদের প্রাচীনেরা এই প্রকৃতি-গত ধর্ম্মবস্তুকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন—

"ধর্ম্মং চর, ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।"

এই ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা কহিয়াছেন—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

এই প্রকৃতিগত ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে যাইয়া যদি মৃত্যুও হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর। কিন্তু অপরে বাহির হইতে ও উপর হইতে ধর্ম্ম বলিয়া যাহা লোকের ঘাড়ে চাপাইতে আইসে, তাহা অতিশয় ভয়াবহ বস্তু। সে পরধর্ম্মে জীবকে ভয়েতেই কেবল অভিভূত করে, কদাপি সত্য অভয়দান করিতে পারে না। কিন্তু সত্যভাবে এই মতবাদ গ্রহণ করা, কিংবা নিষ্ঠাসহকারে ইহা প্রতিপালন করা, যার-তার কর্ম্ম নয়। কথাটা শুনিয়া পরধর্ম্মের পাণ্ডাগণ আঁৎকাইয়া উঠিতে পারেন, কিন্তু আমাদের দেশের তান্ত্রিক সাধনের "বীরাচার" এবং বৈষ্ণবসাধনের "সহজিয়া" সত্যভাবে কেবল এই তত্ত্বেই সম্ভব।

যে দেশের ও যে সমাজের শাস্ত্র ও আচারের অত্যাচার দেখিয়া জনগণের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভ রবীন্দ্রনাথ দুঃসাধ্য মনে করিতেছেন, অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সেই দেশে ও সেই সমাজেই বহু প্রাচীন কাল হইতে এই Philosophic Anarchism বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ধর্ম্মের ও সাধনের কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে।

ভারতের প্রাচীন ঈশ্বর-তত্ত্ব ও জীব-তত্ত্বের উপরেই আমাদের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা। বাহিরের যাবতীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া, তোমার অন্তরে যে কর্ত্তাপুরুষ আছেন, কেবল তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তিনিই তোমাকে সমুদায় পাপ হইতে রক্ষা করিবেন—এই উপদেশ কেবল আমাদের ধর্ম্মেই পাই।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া।
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত॥"

হে ভারত, জীবের অন্তরতমদেশে ঈশ্বর বিরাজিত। তিনিই আপনার মায়াপ্রভাবে যাবতীয় জীবকে সংসারচক্রে ঘুরাইতেছেন। সর্ব্বভাবেতে তাঁহারই শরণাপন্ন হও। তিনিই তোমাকে সকল দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবেন। এই উপদেশ আর কোথাও শুনি নাই। এই ঈশ্বরকেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের অন্তরের অন্তরতম কর্ত্তাপুরুষ বলিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহাকে পাইব কোথায়? তিনি আমার অন্তরেই আছেন, এই কথা বলিলেই ত তাঁর পরিচয় বা সাক্ষাৎকার পাই না। ফলতঃ আমার অন্তরে ত সকল সময় আমি একজন কর্ত্তাপুরুষকে খুঁজিয়া পাই না। রবীন্দ্রনাথই গাহিয়াছেন—

"বাসনার বশে মন অবিরত
ধায় দশদিশে পাগলের মত –"

এই পাগ্‌লা-গারদে "স্থির আঁখি যাঁর জাগিছে নিরত,"—তাঁহাকে ত আমি চোক মেলিয়াই দেখিতে পাই না। ডাক দিলেই ত প্রাণের ভিতের সে কর্ত্তাপুরুষের সাড়া পাই না। এই কর্ত্তাপুরুষের দোহাই দিয়া সংসারে কত লোকে, এদেশে ও বিদেশে, কত বিগর্হিত কর্ম্ম করিতেছে, ইহাও ত দেখিতেছি। মুসলমান গাজি খোদার নামে, তাঁর প্রেরণার দোহাই দিয়া, নিরপরাধ কাফেরের শিরোচ্ছেদন করিয়া আপনার স্বর্গের পথ পরিষ্কার করে। তান্ত্রিক কাপালিক শুদ্ধদেহ কুমারীর কৌমার্য্য হরণ করিয়া আপনার মুক্তির আয়োজন করে। খৃষ্টীয়ান মরমন্ সধবার শয্যা অঙ্গীকার করিয়া আপনার ধর্ম্ম বিস্তার করে। এরা সকলেই ঈশ্বরের নামে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, অন্তরের কর্ত্তাপুরুষের উপরে নিজেদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার দায়াদায় অর্পণ করিয়া চলে। ইহার মধ্যে ঈশ্বরের প্রেরণা কোন্‌টা, তার মীমাংসা করিবে কে?

ফলতঃ আমাদের ভিতরে একজন মাত্র কর্ত্তাপুরুষই যে আছেন, তারই বা প্রমাণ কি? আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, প্রত্যেক মানুষের ভিতরে একাধিক ভূত বাস করে। ইহাদের মধ্যে কখনও একটা আর কখনও বা অন্যটা প্রবল হইয়া তার দেহমনকে লইয়া খেলা করে। একই ব্যক্তি কখনও বা মিষ্টার জেকিল্, কখনও বা ডাক্তার হাইড্ হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের অভিনয় করে। অথচ এ সত্ত্বেও আমাদের যে একটা মৌলিক একত্বও আছে, ইহাও অস্বীকার করা সম্ভব নয়। নানাবাসনাবিক্ষুব্ধ, নানাকর্ম্মবিক্ষিপ্ত, নানাভাবোন্মত্ত চরিত্রের অন্তরালে এমন একটা কেন্দ্রস্থান আছে, যেখানে যাইলে আমি যে আমি'ই, অন্য কেহ নহি, ইহা বুঝিতে পারি। ঐ কেন্দ্রস্থানেই জীবনের মৌলিক একত্বের ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা। ঐখানেই জীবনের সকল বিরোধের নিষ্পত্তি, সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসা, সকল সন্দেহের নিরসন ও সকল দাওয়াদাবীর শেষ সমন্বয় হইয়া থাকে। আর সেই মহামহিমান্বিত মায়াতীত পরব্যোমেই, আমাদের অন্তরের অন্তর্য্যামী কর্ত্তাপুরুষ বসিয়া আছেন,—সাধুমহাপুরুষেরা এই কথাই কহিয়াছেন। প্রাচীন উপনিষদ এই পরব্যোম-

কেই গুহা কহিয়াছেন। এই অন্তরের অন্তরতম পীঠস্থানকে লক্ষ্য করিয়াই মহাভারত "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" বলিয়াছেন। শ্রুতি এই অন্তরের অন্তরতম কর্ত্তাপুরুষকেই

"গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং"—

বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন।

এই অন্তরের অন্তরতম কর্ত্তাপুরুষকে জানিতে হইলে অনেক কাঠখড় পুড়াইতে হয়। সকলের আগে এই দেহটাকে আপনার প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। এই কর্ত্তাপুরুষ এই দেহের মধ্যেই ত আছেন; কিন্তু দেহটা ত সর্ব্বদা আপনার ভাবে থাকে না। বৈজিক প্রভাবে, আবাল্যের শিক্ষা ও সংসর্গ বশতঃ, এই দেহটা বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। দেহের যন্ত্রসকল বিকৃত হইয়া মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে বিকৃত করিয়া তোলে। যতক্ষণ দেহের এই বিকৃত অবস্থা থাকে, ততক্ষণ দেহাভ্যন্তরস্থ কর্ত্তাপুরুষ এই দেহযন্ত্রকে আপনার ইচ্ছামত চালাইতে পারেন না। ততক্ষণ দেহের বিকৃত ক্ষুৎপিপাসাদির মধ্য দিয়া এই কর্ত্তাপুরুষের শুদ্ধ ও সত্য প্রেরণা আসে না। ততক্ষণ এই দেহটা তাঁহাকে প্রকাশ না করিয়া কেবল ঢাকিয়াই রাখে। সুতরাং দেহাভ্যন্তরস্থ এই কর্ত্তাপুরুষকে জানিতে হইলে, সকলের আগে এই দেহকে তার নিজের বিশুদ্ধ প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যে সাধনের দ্বারা এটি হয়, আমাদের প্রাচীনেরা তাহাকেই দেহশুদ্ধি বা ভূতশুদ্ধি কহিতেন।

তার পর চিত্ত-শুদ্ধি। চিত্তবৃত্তি সকলকে নিজ নিজ স্বরূপেতে বা প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করারই নাম চিত্তশুদ্ধি। অসংযত মন ও উদ্দাম ইন্দ্রিয়গ্রামই চিত্তের বিক্ষেপ উৎপাদন করে। অতএব চিত্তকে বশীভূত, স্থির ও প্রকৃতিস্থ রাখিতে হইলে, ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত ও মনকে সংযত করা প্রয়োজন। তার পর আত্মশুদ্ধি, অর্থাৎ আত্মা যে দেহ নহে, আত্মা যে সংসার নহে, এই বিবেক জাগাইতে হইবে। তারপর সকল বিষয়ে ফলকামনাবর্জ্জন করিতে হইবে। এই ফলকামনাবর্জ্জনকেই প্রাচীনেরা বৈরাগ্য কহিয়াছেন। আর এই দেহশুদ্ধি, এই চিত্তশুদ্ধি, এই বিবেক ও বৈরাগ্য,—এসকলই সেই অন্তরের অন্তরতম কর্ত্তাপুরুষকে পাইবার উপায়। যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধি আমাদের দেশে প্রাচীনতম কাল হইতে ধর্ম্মের ও কর্ম্মের চিরন্তন লক্ষ্য হইয়া আছে, এ সকলই তার সাধন। এই সাধনের দ্বারাই এ রাজ্যে সাধকের প্রতিষ্ঠালাভ হয়।

এই প্রতিষ্ঠালাভ হইলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সকল বিপদ্ কাটিয়া যায়, ব্যষ্টিতে-সমষ্টিতে সকল বিরোধের নিঃশেষ নিষ্পত্তি হয়। কারণ, দেহ যার নিজের সত্য প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়াছে, বিশ্ববিধানে এই দেহের স্থান ও কর্ম্ম যে কি, সে ইহাও

বুঝিয়াছে এবং ইহা বুঝিয়াছে বলিয়াই বিশ্বের সঙ্গে দেহ-সম্বন্ধে তার সকল বিবাদ মিটিয়াছে। তার এই বিশিষ্ট দেহই তখন বিশ্বদেহের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। চিত্ত যার শুদ্ধ, অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়, যার সকল ইন্দ্রিয় বিশ্বযন্ত্রের মধ্যে আপনার স্থান ও অধিকার প্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়ের সংগ্রাম তার ঘুচিয়া যায়। সর্ব্বফলকামনা যার নিঃশেষ নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়, বিশ্বকামনাই তখন তার আত্মকামনা হইয়া পড়ে। এই সাধনে যার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, আপনার ব্যক্তিত্বের বা personality'র সত্য বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার দ্বারাই সে বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হইয়া যায়। তার individualismই তখন সত্য ও সাকার, real এবং concrete universalism হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ এইরূপেই এই ঐকান্তিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পথে বিশ্বাত্মকত্ব সাধন করিয়াছিল। ভারতবর্ষ সাধনপথে চলিয়া যে অপূর্ব্ব সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, খৃষ্টবর্ষ কেবল মানসরথে চড়িয়া সে সমন্বয়লাভ করিবে কেমনে?

এই জন্যই আমাদের প্রাচীনেরা কহিয়াছেন, এ পথে সকলের অধিকার নাই। দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, বিবেকবৈরাগ্যসিদ্ধি যার হয় নাই, এই ঐকান্তিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মে তার সত্য অধিকার জন্মে না। কিন্তু ইংরাজ যাহাকে রাইট্ বলে, আমাদের প্রাচীনেরা তাহাকে অধিকার কহেন নাই। আমাদের অধিকার অর্থ স্বত্ব নহে,—সামর্থ্য। যে কাজ করিবার যার অধিকার, অর্থাৎ সামর্থ্য নাই, সে যদি সে কাজে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে কর্ম্মও পণ্ড হয়, কর্ম্মীরও অমঙ্গলের আশঙ্কা জন্মে। সকল কর্ম্মেরই কতকগুলি পূর্ব্ব-সাধন আছে। ব্যাকরণ ও শব্দকোষ অধ্যয়ন সাহিত্যচর্চ্চার পূর্ব্ব-সাধন। পাটীগণিত অধ্যয়ন বীজগণিত আলোচনার পূর্ব্বসাধন। এই পূর্ব্বসাধন যার আছে, সে'ই সাহিত্য বা বীজগণিত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে পারে, সে'ই এ বিষয়ে অধিকারী। এই অর্থেই ধর্ম্মেও অধিকারী-অনধিকারীর কথা ব্যবহৃত হয়।

আমাদের সমাজে গতানুগতিক ধর্ম্মচিন্তায় ও ধর্ম্মতন্ত্রে ধর্ম্মের এই অধিকারি-ভেদকে প্রকৃতিগত ও সাধনগত না রাখিয়া জাতি-জন্মগত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা জানি। কিন্তু ইহা অধিকারিভেদের অপব্যবহার মাত্র। এই অপব্যবহার দেখিয়া অধিকারিভেদের সত্য অর্থকে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে কেন?

আর ধর্ম্মের এই অধিকারিভেদটা জাতি ও জন্মগত হইয়াই আমাদের দেশে লৌকিক ধর্ম্মের বা সামাজিক ধর্ম্মের এবং সাধন-ধর্ম্মের বা মোক্ষধর্ম্মের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। পরমপুরুষার্থসিদ্ধিই মোক্ষধর্ম্মের বা সাধনধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই পুরুষার্থলাভেই মানুষের মুক্তি হয়। এই মুক্তি-বস্তুটা জন্য-বস্তু নহে, কোনও প্রকারের ক্রিয়াকর্ম্মের দ্বারা ইহাকে উৎপন্ন করা যায়

না। এই মুক্তি নিত্যসিদ্ধ বস্তু। আপনার সত্য স্বরূপেতে মানুষমাত্রেই নিত্য-মুক্ত রহিয়াছে। এই জন্যই ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনাকালে বলেন—

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥"

অর্থাৎ আমি দেবতা, অন্য কেহ নই; আমি ব্রহ্ম, শোকভোক্তা নই; আমি সচ্চিদানন্দরূপ, আমি নিত্যমুক্তস্বভাববান্। নিত্যকাল যে মুক্ত, তাহাকে কোনও ক্রিয়ার দ্বারা মুক্ত করা অনাবশ্যক। কিন্তু অজ্ঞানতা-বশতঃ, অবিবেক প্রযুক্ত, এই নিত্যমুক্তস্বভাব যে আত্মাপুরুষ, সে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি অধ্যাস করিয়া, আপনাকে বদ্ধ ভাবিয়া অশেষ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করে। এই অবিদ্যা নষ্ট করিয়া আত্মাপুরুষের এই স্বতঃসিদ্ধ স্বাধীনতাকে জ্ঞানগম্য করাই সাধনধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই জন্য এই সাধন-ধর্ম্মের গতি সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার প্রতি। এই জন্য সাধনধর্ম্ম বলে—ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গরু, হাতী, কুকুর ইহাদের মধ্যে কোনও পারমার্থিক ভেদ নাই। কিন্তু সাধন-ধর্ম্ম যেমন এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার পথে চলে, লৌকিক বা সামাজিক ধর্ম্ম সেইরূপ বৈষম্য, প্রতিযোগিতা এবং বন্ধনকে স্বীকার করিয়াই প্রতিষ্ঠালাভ করে।

এই সাধনধর্ম্ম আমাদের সাধনারই একটা বিশেষত্ব। জগতের আর কোনও ধর্ম্মে ঠিক এই বস্তুটি নাই। খ্রীষ্টীয়ান যাহাকে practical religion বলেন, যে ধর্ম্ম লোকের কর্ম্মে ও চরিত্রে প্রকট হয়, আমরা তাহাকে লৌকিক ধর্ম্মই বলি, সাধন-ধর্ম্ম বলি না। জগতের আর কোনও ধর্ম্মে আমাদের এই সাধন-ধর্ম্মের মতন কোনও কিছু নাই। নাই এই জন্য, যে জগতের আর কোনও ধর্ম্মে মানুষকে নিত্য-মুক্ত-স্বভাববান্ বলিয়া ধরিতে পারে নাই। মুক্তি যে মানুষের নিত্যসিদ্ধ বা eternally realised বস্তু, অন্য কোনও ধর্ম্মে এ কথা বলে না। এই জন্য সে-সকল ধর্ম্মে মুক্তি একটা জন্য-বস্তু, অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা, সাধনের দ্বারা, এই মুক্তির অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর সমাজ ব্যতীত কর্ম্ম সম্ভব হয় না। মনুষ্য-সমাজই আমাদের একমাত্র সত্য কর্ম্মভূমি। সুতরাং সমাজ-ধর্ম্মের দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। অতএব সমাজধর্ম্ম এক আর সাধন-ধর্ম্ম বা মোক্ষধর্ম্ম আর এক, জগতের অপর কোনও ধর্ম্মে এরূপ একটা ভাগাভাগি দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই সন্ন্যাসের আদর্শ প্রবল হইয়া, সাধন-ধর্ম্মের ও সমাজধর্ম্মের মধ্যে একটা বিরাট্ পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বিশিষ্ট সাধু-মহাপুরুষ-দিগের জীবনে কচিৎ সাধনধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্মের মধ্যে একটা সত্য ও গভীর সমন্বয় সাধিত হইলেও, জনসাধারণের চিন্তা ও কর্ম্মে এই সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সাধারণ লোকে

সাধন-ধর্ম্মের ও সমাজধর্ম্মের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করিয়া একটা গোঁজা-মিল দিয়া রাখিয়াছে। এই জন্যই সাধনধর্ম্মটা গুহ্য ও সমাজধর্ম্মটা বাহ্য হইয়া পড়িয়াছে; এবং লোকের মধ্যে লোকাচার সদ্‌গুরুর সঙ্গে সদাচার, সাধক-সমাজে এই নীতি প্রবল হইয়া আছে।

সাধনধর্ম্মে ও সমাজধর্ম্মে এরূপ ভাগাভাগিটা কিছুতেই ভাল নয়। ইহাতে লোক-চরিত্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেয়। ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ও গভীরতম প্রেরণাকে জনগণের দৈনন্দিন কর্ম্মজীবন ও সমাজের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য হইতে অতি দূরে রাখিয়া, ধর্ম্মকে একান্ত অন্তর্মুখীন বা subjective এবং কর্ম্মকে নিতান্ত বহির্মুখীন বা external করিয়া তোলে। ইহার ফলে ধর্ম্মবস্তুটা নিতান্ত বিমানচারী ও ভাবপ্রবণ হইয়া উঠে; আর জীবনের কর্ম্মসকল অত্যন্ত প্রাণহীন ও তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম প্রতিদিনের কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে পারে না; কর্ম্মও পৃথিবীর ধূলিজাল হইতে মুক্ত হইয়া ধর্ম্মের দিব্য আলোকে মণ্ডিত হইয়া উঠে না। ইহার ফলে লোকচিত্ত কর্ম্মের বেলায় একান্তভাবে ইহসর্ব্বস্ব ও ধর্ম্মের বেলায় আত্যন্তিক-রূপে পরলোক-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে। ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে, অনাত্মা ও আত্মার মধ্যে, জগৎ ও ব্রহ্ম এবং জীব ও শিবের মধ্যে একটা সত্য সমন্বয় সাধন করিতে না পারিয়া, লোকচিন্তা ক্রমে এ-লোককে অনিত্য এবং ও-লোককে নিত্য; জগৎকে অসত্য ও ব্রহ্মকে সত্য; সংসারকে কল্পনা ও পরমার্থকে বস্তু বলিয়া ধরিতে যাইয়া,—এই লোক সত্য নহে, ইহার কোন পারমার্থিক মূল্য ও মর্য্যাদা নাই; সংসারটা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর, সংসারের সম্বন্ধ সকল ক্ষণিক ও মায়িক, জীবনের ধর্ম্মাধর্ম্ম পর্য্যন্ত "অবিদ্যাবদ্‌বিষয়াণি"—এই ভাবটাকে গিয়া আঁকড়াইয়া ধরে। আর—

"তুমি কার, কে তোমার, কারে বল রে আপন,
মহামায়া-নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন!"

ইহাই জীবনের শেষ কথা ও সার কথা হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ইহাই সাধনের মূলমন্ত্র হইয়া উঠে।

শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু এই বাঙ্গালাদেশে যে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে এই বৈদান্তিক বা তান্ত্রিক মায়াবাদের স্থান নাই। তিনি স্পষ্টভাবে ভগবান্ ভাষ্যকারের বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন করিয়া পরিণামবাদ স্থাপন করেন। এই পরিণামবাদে জগৎ ও জীবকে পরিণামী নিত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা করে। অথচ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও সংসারজীবনে এই মারাত্মক মায়ার হাত এড়াইতে পারিলেন না।

লোকে বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা লইল, বৈষ্ণব গুরু করিল, বৈষ্ণব শাস্ত্র পড়িল; কিন্তু এই জগৎকে ও জগতের বিবিধ সম্বন্ধকে সত্যবোধে, ধর্ম্মের প্রেরণায়, মুক্তিকামনায়, পরমার্থ-দৃষ্টিতে দেখিয়া, আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিল না। ইহারা ভগবান্ মানিল; ভাগবতী লীলার কথা কহিতে লাগিল; ক্ষণজন্মা সাধু-মহাজনেরা ভাগবতী-তনু লাভ করিয়া ইহজীবনে ও ইহলোকেই সেই নিত্য ভাগবতী লীলার অনুসরণ করিতে পারেন, ইহাও বিশ্বাস করিল; ভাগবতী-তনু লাভ করিয়াছেন,এমন সিদ্ধ মহাপুরুষের সঙ্গ পর্য্যন্ত করিল; কিন্তু তথাপি এই সংসারের প্রত্যক্ষ সেবার, প্রেমের, রসের সম্বন্ধের মধ্যেই যে দেশকালের রঙ্গমঞ্চে ভগবানের নিত্যলীলার নিত্য অভিনয় হইতেছে, এ সংসারের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের সম্বন্ধসকল যে সেই নিত্যরসলীলার নিত্য রস-সম্বন্ধের আদর্শেই প্রকাশিত হইতেছে, ভগবানের এই জাগতিক লীলায় আমরা প্রত্যেকে যে তাঁর লীলা-পরিকর—এ সকল কথা ধরিতে ও বুঝিতে পারিল না। ইহারাও ভগবানের প্রত্যক্ষ জাগতিক লীলাকে মায়িক ও অলীক বলিয়া বর্জ্জন করিয়া, সংসারের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ-সকলের প্রতি উদাসীন হইয়া, "অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে" তাঁর "অপ্রাকৃত লীলা" ধ্যান ও কীর্ত্তন করিতে লাগিল। এইরূপে এই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত তত্ত্বাঙ্গে সংসার ও পরমার্থের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন করিয়াও, সাধনাঙ্গে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না। বৈদান্তিকের কৈবল্যধামের স্থানে বৈষ্ণবের ব্রজধামের প্রতিষ্ঠা হইল বটে, কিন্তু মায়াবাদী বৈদান্তিক যে ভাবে এই সংসারকে মায়িক ও অলীক বলিয়া উপেক্ষা করিতেছিলেন, ভক্তবাদী বৈষ্ণবও তাহা করিতে লাগিল।

এমন কেন হইল?

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিচারে যে মূল ইষুটা ধার্য্য হইয়াছে, অর্থাৎ আমাদের ধর্ম্মের ও সমাজের সংস্কার ও শাসনই কি আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় জীবনের হীনতার কারণ, না দীর্ঘকালব্যাপী রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাই আমাদের ধর্ম্মের ও সমাজের সর্ব্বপ্রকারের বন্ধন-হেতু, সেই মূল ইষুর মীমাংসা এই প্রশ্নের সদুত্তরের উপর নির্ভর করে।

মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের যখন প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ মুসলমান শাসনের অধীনে আসিয়াছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে তখন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মসাধনেও হিন্দুর স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইয়াছে। নবদ্বীপের মুসলমান কাজি, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অল্প দিন পূর্ব্বে, ভক্তরাজ হরিদাসকে হরিনাম সাধন করিবার অপরাধে বাইশ বাজারে ঘুরাইয়া বেত মারিয়াছে। এই পাশব অত্যাচারের প্রতিবাদ করে, বাঙ্গালাদেশে

তখন এমন লোক ছিল না। হরিদাস সমাধিস্থ হইয়া আপনাকে এই নির্যাতন ও অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। অতি-প্রাকৃত উপায়ে কাজির প্রাণে ভীতি-সঞ্চার করিয়া এই অত্যাচার বন্ধ করিতে পারিলেন। কাজি মহাপ্রভুর কীর্ত্তনও ভাঙ্গিতে চাহিয়াছিল। যে জগাই-মাধাই ধনীর ধন হরণ করিত, সতীর সতীত্বনাশ করিত, সমাজের শান্তিভঙ্গ করিত, যাহাদের ভয়ে গৃহস্থেরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া দিন কাটাইত, কাজি সাহেব সেই জগাই-মাধাইয়ের শাসন করিতে পারিতেন না বা চাহিতেন না। কিন্তু নিরীহ বৈষ্ণবেরা যখন দলে একটু ভারি হইয়া উঠিল, ভক্তগোষ্ঠী মিলিয়া হরিনাম দিয়া লোককে মাতাইতে আরম্ভ করিল, এবং ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন করিয়া একটু আনন্দ করিতে লাগিল, তখন কাজি সাহেব তাহার বাদী হইলেন। মহাপ্রভুর অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে কাজি সাহেব চৈতন্যচরণাশ্রয় লইলেন, চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গল এ কথা লিখিয়াছেন বটে। আর এ কথা যে অসত্য, এরূপ মনে করিবারও কোনও হেতু নাই। তবে এই আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রয়োগে সাময়িক কার্য্যসিদ্ধি হইল বটে, কিন্তু সমাজের শক্তিবৃদ্ধি হইল না, ইহাও সত্য। সকল বৈষ্ণবই ত আর মহাপ্রভুর মতন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্মেকর্ম্মে, সংসারের দৈনন্দিন ব্যাপারে, 'যথা পূর্ব্বং তথাপরং'- কাজির ভয় এড়াইতে পারিলেন না। আর ভয় যেখানে সংসারের প্রভু হইয়া বসে, আনন্দ সেখান হইতে পলায়ন করে। অথচ আনন্দ না হইলে জীবের জীবনচেষ্টাই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশো আনন্দো ন স্যাৎ।"

এই আকাশে যদি আনন্দ প্রস্রবণ নিয়ত বিদ্যমান না থাকে, তবে কেই বা জীবনচেষ্টা, কেই বা প্রাণধারণ করিতে পারে? এই জন্য মানুষ যখন সংসারের প্রত্যক্ষ-ব্যাপারে নিয়ত ভয়বিভীষিকার মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হয়, ইহলোকে যখন তার জীবনের যথাযোগ্য সার্থকতার ও আনন্দের সম্ভাবনা কমিয়া যায়, তখন সে স্বভাবতঃই ইহলোকের সত্য দুঃখ-যাতনাকে 'নাই' বলিয়া উড়াইয়া দিয়া,পরলোকে আপনার ঈপ্সিত স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিয়া, এ লোকে যাহা তার অপ্রাপ্য হয়, সেই কল্পিত স্বর্গলোকে তাহা পাইবার আশায় মনকে প্রবোধ দিয়া বসিয়া থাকে।

এইরূপে সংসারের অভ্যুদয়লোপে, লোকের ধর্ম্মের আদর্শের সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ কর্ম্মাকর্ম্মের একটা বিশাল পার্থক্য দাঁড়াইয়া যায়। ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ও সাধন একান্তভাবে অন্তর্মুখীন বা subjective হইয়া উঠে; এবং ধর্ম্মের ভাব বা ইমোষণ, ভাবুকতায় বা সেন্‌টিমেণ্টেলিজমে পরিণত হয়। বাহিরের প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া লোকের ধর্ম্মভাব জীবনের প্রত্যক্ষ কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে ফুটাইয়া ও গড়িয়া তুলিতে পারে না। যখনই যে দেশের সাংসারিক অভ্যুদয়ের পথ বন্ধ হইয়া

গিয়াছে, তখনই সে দেশের ধর্ম্মেও আত্যন্তিক পারলৌকিকতা ও শূন্যগর্ভ ভাবুকতার প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়া, জনমণ্ডলীকে কৃপণ ও স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে। যেমন বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধর্ম্মের, সেইরূপ ইহুদীয় খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাসও এই সত্যের সাক্ষ্যদান করে।

ইহুদীজাতির সাংসারিক অভ্যুদয় যখন একেবারে লোপ পাইয়াছে, জিহোভার আসনে যখন রোমের শাসন প্রতিষ্ঠিত, সেই যুগেই যিশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব হয়। যিশুর অলোকসামান্য শক্তি ও অসাধারণ প্রভাব দেখিয়া ইহুদীরা প্রথমে ভাবিয়াছিল, বুঝি বা তিনি তাহাদের বহুদিনের আশার আশ্রয়-স্বরূপ জিহোভার সেই পূর্ব্ব-প্রত্যাদিষ্ট দেবদূত, যাঁহার আগমনে পৃথিবীতে পুনরায় ইহুদীর পুরাতন দৈবতন্ত্রের বা থিওক্রেসির (Theocracy'র) প্রতিষ্ঠা হইবে। এতকাল পরে বুঝি বা যিশুর নেতৃত্বে ইহুদীর বিদেশীয় ও বিজাতীয় দাসত্ব ঘুচিবে। যিশু যখন স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে লাগিলেন, দেশভক্ত ইহুদীরা ভাবিতে লাগিল, তিনি বুঝি তাহাদের হৃত, লুপ্ত স্বারাজ্যের কথাই কহিতেছেন। এইরূপ ভাবিয়াই দলে দলে লোক তাঁহার সঙ্গ লইল। কিন্তু ক্রমে যখন ইহারা বুঝিল, যিশু যে স্বর্গরাজ্যের কথা কহিতেছেন, তাহা তাহাদের স্বারাজ্য নহে; এই স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় দেশে রোমকতন্ত্র নষ্ট হইয়া ইহুদীর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না; যিশুর স্বর্গরাজ্য এ লোকের নহে, কিন্তু পরলোকের; এই পৃথিবীর নহে, কিন্তু ঐ আকাশের; জনসমাজে ইহার প্রতিষ্ঠা নাই, জনগণের নিজ নিজ চিত্তেতেই কেবল এই স্বর্গরাজ্য গড়িয়া উঠিবে, তখনই নিরাশাবিক্ষিপ্ত হইয়া তাহারা যিশুর বিরোধী হইয়া উঠিল। এইরূপেই যাহারা প্রথমে যিশুকে জিহোভার দূত বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল, তাহারাই পরে তাঁহাকে সমাজদ্রোহী ও ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া হত্যা করিল।

"সীজরের প্রাপ্য সীজরকে দাও, ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও"—যিশু যে দিন এ কথা বলিলেন, সেদিনই স্বারাজ্য-লুব্ধ ইহুদীর প্রাণে যে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষ বিলোপ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু যিশুর এই কথা শুনিয়া স্বারাজ্যলুব্ধ ইহুদীর দল যেমন ক্ষেপিয়া উঠিল, সেইরূপ আর এক দল হাঁপ ছাড়িয়াও বাঁচিল। সীজরে ও ঈশ্বরে যখন একটা ভাগবাটোয়ারা হইয়া গেল, তখন ইহাদের দুকুলরক্ষার একটা উপায় জুটিল। যাহারা সাত্ত্বিকতার বহিরাবরণের মধ্যে ঘোরতর তামসিকতাকে আশ্রয় করিয়া, নিতান্ত ভালমানুষের মতন, একান্ত নির্ঝঞ্ঝাটে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য ব্যগ্র ছিল, তাহারা যিশুর ঐ আকাশের স্বর্গরাজ্যটা পাইয়া, এই পৃথিবীতে স্বজাতির স্বারাজ্য-প্রতিষ্ঠার দায় হইতে মুক্তিলাভ করিল। তখন হইতে যিশুর শিষ্যেরা ইহলোকের অন্যায়-অবিচার, উৎপীড়ন-অত্যাচার, দুঃখ-দারিদ্র্য, সংসারের সকল প্রকারের যন্ত্রণার

ঔষধস্বরূপ ঐ আকাশের স্বর্গরাজ্যটাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। অজ্ঞেরা উপরের আকাশের স্বর্গরাজ্যে যাইয়া মরণান্তে জীবনের সকল সাধ মিটাইবার আশায় বসিয়া রহিল; বিজ্ঞেরা নিজেদের অন্তরেই সেই স্বর্গরাজ্যে রহিয়াছে জানিয়া আপনাপন অন্তরকে শুদ্ধ করিবার জন্য ঐকান্তিকভাবে চিত্তশুদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে নানা লোকে নানা দিক্ দিয়া, যিশুখ্রীষ্ট-প্রচারিত ধর্ম্মে সংসার ও পরমার্থের মধ্যে একটা বিরাট্ ব্যবধান সৃষ্টি করিল। সেই হইতে যিশুখ্রীষ্টের ধর্ম্মের ঝোঁকটা বহুশতাব্দী ধরিয়া পরলোকের উপরেই পড়িয়া রহিল; এ লোকে স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃক্পাতও করিল না। আর ইহার প্রধান কারণ এই যে, যে-কালে, যে-সমাজে যিশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব হয়, সে-কালে সে-সমাজের সাংসারিক অভ্যুদয় একেবারে লোপ পাইয়াছিল। ইহলোকে জনগণের আরাম, শান্তি ও আনন্দের অবসর নিতান্ত কমিয়া গিয়াছিল। ঘরে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ, বাহিরে বিদেশীর শাসন, দেউলে পুরোহিতের প্রভুত্ব, দরবারে রাজার দাসত্ব, এ সকলে মিলিয়া জীবনটা দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছিল। এই জন্যই ইহসংসারে জীবনের যে সার্থকতার ও আনন্দের অবকাশ ছিল না, পরলোকে তাহা পাইবার আশায় মানুষের লুব্ধ চিত্ত, সেখানে একটা স্বর্গরাজ্য কল্পনা করিয়া, সেই দিকে মুখ রাখিয়া, যন্ত্রারূঢ়ের মতন সংসারপথে বিচরণ করিতে লাগিল।

ইহুদার সীমা অতিক্রম করিয়া যিশুখৃষ্টের ধর্ম্ম ক্রমে গ্রীশে ও রোমে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু খৃষ্ট-শিষ্যেরা গ্রীশ ও রোমের অভ্যুদয়ের অংশীদার হওয়া দূরে থাকুক, গ্রীশীয় ও রোমক সমাজপতি এবং রাষ্ট্রপতিদিগের নিকটে অসহ্য লাঞ্ছনা ভোগ করিতে লাগিলেন। সেকালের খৃষ্টীয়ানকে চোরের মতন মাটীর নীচে বাস করিতে হইত, ধরা পড়িলে আপনার ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য রাজসরকারের পোষা সিংহের কবলে প্রাণত্যাগ করিতে হইত। এ অবস্থায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ঝোঁকটা যে অতিমাত্রায় পরলোকের উপরে যাইয়া পড়িবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? কালক্রমে এ সকল অত্যাচার থামিয়া গেল, খৃষ্টধর্ম্ম ইউরোপের জনসাধারণের ধর্ম্ম হইয়া উঠিল। কিন্তু খৃষ্টীয়ান জনমণ্ডলীর ব্যক্তিগত স্বত্বস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হইল না। রোমকদিগের রোম গেল, কিন্তু খৃষ্টীয়ানসঙ্ঘের অধিপতি পোপ রোমক সম্রাটের শূন্য সিংহাসনে যাইয়া বসিয়া, পূর্ব্ববৎই স্বেচ্ছামত লোকশাসন করিতে লাগিলেন। রাজা-প্রজা সকলে পোপের পদানত হইয়া রহিল। অত্যাচারীর পরিবর্ত্তন হইল, অত্যাচারের রূপও বদলাইল না, পেষণেরও প্রশমন হইল না। রাজা বাহুবলে লোককে পদানত করিয়া রাখিতেন, পোপ ধর্ম্মের বিভীষিকা জাগাইয়া, ভীষণতর দাসত্বশৃঙ্খল দিয়া জনমণ্ডলীর দেহ, মন, প্রাণ, আত্মাকে পর্য্যন্ত বাঁধিতে লাগিলেন। এইরূপে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে একটা আত্যন্তিক পারলৌকিকতা বা other-worldliness এর অন্তর্মুখীনতা বা subtecti-

vity'র এবং অতিলৌকিকতা বা superntauralism'এর প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হইল। এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠার কথা, খৃষ্টীয়ানমণ্ডলীর উপাসনাপদ্ধতিতে থাকিলেও, তাহাদের কল্পনা হইতে দূর হইয়া গেল। একদিকে ইউরোপের স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজন্যবর্গ, অন্যদিকে খৃষ্টীয়ান-সঙ্ঘ বা Catholic Church এই দুইদলে মিলিয়া বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া ইউরোপের অন্তর ও বাহির উভয়দেশ দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিল। ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, জীবনের কোনও বিভাগে, আত্মপ্রতিষ্ঠার সূচ্যগ্র-পরিমাণ ভূমিও রহিল না। এই দীর্ঘকালকেই আধুনিক ইতিহাস ইউরোপের মধ্যযুগ (Mediæval ages) বা তামসযুগ (Dark ages) কহিয়া থাকে।

আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অবসর না পাইলে, যুগপৎ মানুষের সাংসারিক ও পারমার্থিক জীবনে কত যে দুর্গতি ঘটে, ইউরোপের এই মধ্যযুগের ইতিহাস তার সাক্ষী। মধ্যযুগে ইউরোপের যে মানসিক ও সামাজিক দুর্গতি ঘটিয়াছিল, কেবল ক্যাথলিক সঙ্ঘের পোপ ও পৌরোহিত্যের প্রভাবই তার জন্য দায়ী ছিলেন না। স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজ-শক্তি এই অতিপ্রাকৃত পৌরোহিত্যের সঙ্গে মিলিয়া ইউরোপকে সকল দিকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিয়াছিল। জীবনের কোনও ক্ষেত্রে লোকের স্বাধীন ও সহজভাবে আত্মচরিতার্থতা অন্বেষণের অবসর ছিল না। আর এই জন্যই মধ্যযুগের ইউরোপের এই দুর্গতি ঘটিয়াছিল। ক্রমে ইউরোপের খৃষ্টীয়ান সমাজ পোপ ও পৌরোহিত্যের বন্ধন কাটাইয়া বাহির হইল, ধর্ম্মচিন্তায় ও ধর্ম্মসাধনে মার্টিন লুথারের পর হইতে স্বাভিমতের বা private judgement'এর মর্য্যাদা ও অধিকার অনেকটা প্রতিষ্ঠালাভ করিল। কিন্তু রাষ্ট্রতন্ত্রে প্রজামতের প্রতিষ্ঠা হইল না। এই জন্য ধর্ম্মবন্ধন কতকটা আলগা হইলেও, রবীন্দ্রনাথ যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ প্রচার করিতে যাইয়া, আমাদের দেশের শাস্ত্রানুগত্য ও আচারবশ্যতাকেই আমাদের পরমতানুবর্ত্তিতা ও পরমুখাপেক্ষিতার জন্য বিশেষভাবে দায়ী করিতেছেন, সেই শাস্ত্রানুগত্য ও আচারবশ্যতা নষ্ট হইল না। আমরা এখন যেমন "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" বলিয়া, সকল বিষয়ে পরের কর্ত্তৃত্ব সহিয়া থাকি, বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রোটেষ্টান্ট্ খৃষ্টীয়ান সমাজ সেইরূপ তামসিকতা ও কার্পণ্য দ্বারা অভিভূত হইয়া ছিল। ফরাসী বিপ্লবের পর হইতেই রাষ্ট্রে গণতন্ত্রতার প্রভাব-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ইউরোপে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষ মানুষের মতন হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আগে ধর্ম্মের কুসংস্কার ও সমাজের বৈষম্য দূর করিয়া ইউরোপ রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রজামত ও প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নাই; বরঞ্চ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আগে লাভ করিয়াই, ক্রমে ক্রমে জীবনের অপরাপর বিভাগে জনমণ্ডলীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুলিয়া দিয়াছে।

মানিলাম, সাংসারিক অভ্যুদয় না থাকিলে ধর্ম্ম সত্য ও বাস্তব হয় না, নিতান্ত

অন্তর্মুখীন ও ভাবুকতা-প্রবণ হইয়া উঠে। কিন্তু সাংসারিক অভ্যুদয় বৃদ্ধিতেই যে ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, ইতিহাস ত এ কথা বলে না। ইউরোপের অভ্যুদয় ত খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছে; তার ধর্ম্মেরও প্রভাব সেরূপ বাড়িয়াছে কি? ইউরোপের বর্ত্তমান অভ্যুদয় সত্বেও ইউরোপের ধর্ম্মসাধন ও সমাজনীতি কতটা পরিমাণে যে হীন হইয়া পড়িয়া আছে, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

কিন্তু আমরা যে-ইউরোপের অভ্যুদয় দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতেছি, সে-ইউরোপ মুষ্টিমেয় ধনীরই ইউরোপ, ইউরোপের বিরাট্ প্রকৃতিপুঞ্জের ইউরোপ নহে। এই অভ্যুদয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের জ্ঞান এবং কলাকুশলতাও বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু এই জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত ও কলাকুশলতাসম্পন্ন ইউরোপও মুষ্টিমেয় মনীষীদিগেরই ইউরোপ, জনমণ্ডলীর ইউরোপ নহে। সাংসারিক অভ্যুদয়ের অভাবে যেমন, সেইরূপ এই অসম অভ্যুদয়ের অতিবৃদ্ধিতেও জনমণ্ডলীর মনুষ্যত্বকে চাপিয়া রাখে।

ইউরোপে আমাদের হিন্দুসমাজের মতন কোন জাতিভেদ নাই, সত্য; কিন্তু বিষম শ্রেণীভেদ আছে। আমাদের এই জাতিভেদ যে ভাল, এমন কথা বলি না। মনু আওড়াইয়া, অথবা মনুর সঙ্গে মেণ্ডেল-উইস্‌ম্যানকে মিশাইয়া, যুগপৎ প্রাচীন স্মৃতি ও আধুনিক বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া এই জাতিভেদটাকে সমাজে রাখিতেই হইবে, এমন আব্দারও করি না। কিন্তু আমাদের এই বিষম জাতিভেদ সত্বেও আমাদের দেশে যে সামাজিক সহানুভূতি ও সাহচর্য্য আছে, জাতিভেদ-হীন ইংলণ্ডে তার শতাংশের একাংশ নাই, এ কথা শতবার মুক্তকণ্ঠে কহিব। আমাদের জাতিভেদ, বিশেষতঃ এই বাঙ্গালাদেশে এবং সমগ্র উত্তরভারতে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পংক্তিভোজনই নিষেধ করে, কিন্তু পরস্পরের সামাজিক সাহচর্য্য নষ্ট করে না। ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অন্নই কেবল গ্রহণ করেন না, কিন্তু বিবাহের আসরে, শ্রাদ্ধবাসরে, নানাবিধ পূজা-পার্ব্বণোপলক্ষে, যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি সামাজিক সম্মিলনে, তাহাদের সঙ্গে একাসনে বসেন না, এমন ত নয়। অন্ত্যজ বর্ণ যাহাদিগকে বলে, তাঁহারাও, অন্ততঃ এই বাঙ্গালা দেশে, সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যখন সভা হয়, তখন সেই সভায় ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর বর্ণের সঙ্গে, একাসনে নহে, পৃথগাসনে কিন্তু একই আসরে বসিয়া পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ও ভাব-বিনিময় করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপক যখন ব্যাকরণ বা ন্যায়ের সূত্র অধ্যাপনা করান, তখনও গ্রামের তথাকথিত ইতরলোকেরা সেখানে যাইয়া, কেহ বা ঘরে, কেহ বা দাওয়ায় কেহ বা উঠানে বসিয়া, তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে গ্রাম্যকথা কহে, আর সারাক্ষণ তাঁর সেই অধ্যাপনা নীরবে, শ্রদ্ধাভরে, নিবিষ্টচিত্তে শুনিয়া থাকে। রামময় বিদ্যালঙ্কার

মহাশয়কে রামা বাগ্দী 'দাদা মহাশয়' বলিয়া প্রণাম করে। এই রামা বাগ্দীর সঙ্গে পথে দেখা হইলে, বিদ্যালঙ্কার মহাশয় দুদণ্ড দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে কিছুই সঙ্কোচ বোধ করেন না; আরামে-ব্যারামে তার বাড়ীতে যাইয়া, তার খবরাখবর লইয়া থাকেন। ইউরোপের সাম্যবাদী খ্রীষ্টীয়ান্ সমাজে এটি হয় না। হওয়া এখনও সম্ভব নয়। আর ইউরোপের সমাজের উচ্চতর স্তরের সঙ্গে নিম্নতর স্তরের এই বিশাল ব্যবধান আছে বলিয়া ইউরোপের বর্ত্তমান অদ্ভুত অভ্যুদয় একাংশকেই মাত্র উন্নত করিয়া তুলিয়াছে, ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানও সমাজের সামান্য ভাগকেই মাত্র অধিকার করিয়া আছে। ইউরোপের বর্ত্তমান অভ্যুদয় এখনও ব্যক্তিগত হইয়াই আছে, সত্যভাবে সামাজিক হইয়া উঠে নাই। একদিকে বিপুল বিভব, অন্যদিকে ভীষণ দারিদ্র্য; একদিকে সভ্যতার উজ্জ্বল শুভ্র আভা, অন্যদিকে বর্ব্বরতার কৃষ্ণচ্ছায়া; একদিকে মনুষ্যত্বের মোহন রূপ, আর অন্যদিকে পশুত্বের বিকটচ্ছবি—ইহাই ত বর্ত্তমান ইউরোপের সত্য আলোক-চিত্র। আর ইউরোপের সাংসারিক অভ্যুদয়বৃদ্ধিতে ধর্ম্মের ও মনুষ্যত্বের প্রভাব যে বাড়িতেছে না, বরং দিন দিন যেন আরও ম্লান হইয়া পড়িতেছে, ইউরোপের সাংসারিক অভ্যুদয় নহে, কিন্তু ইউরোপীয় সমাজের এই বিষম বৈষম্যই তাহার মূল কারণ।

আমাদের সমাজেও বহুদিন হইতে জাতিতে জাতিতে একটা বিশাল বৈষম্য রহিয়াছে। কিন্তু এ বৈষম্যটা জন্মগত। আর জন্মের উপরে ত মানুষের কোনও হাত নাই। মানুষ জীবনের আর সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু জন্মটা কচিৎ লুকাইতে চেষ্টা করিলেও বদলাইতে পারে না। এই কারণে আমাদের সমাজের এই পুরাগত বৈষম্যটা দূর করিবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কেউ কোনও চেষ্টা করে না, করিতে পারে না। যখন যখন এই চেষ্টা হইয়াছে, তখন হয় সর্ব্বপ্রকারের ব্যক্তিগত স্বার্থবাসনা-বিমুক্ত ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষেরাই লোকহিতকল্পে এ কাজে হাত দিয়াছেন, আর না হয়, সংস্কারকেরা দল বাঁধিয়া এই বৈষম্য নষ্ট করিতে গিয়াছেন। পুরাণে শোনা যায়, এক বিশ্বামিত্রই ব্যক্তিগতভাবে আপনার অসাধারণ তপঃপ্রভাবে জন্মে ক্ষত্রিয় হইয়াও কর্ম্মে ব্রাহ্মণত্বলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের পরেও—এমন কি, আজি পর্য্যন্ত, অনেক বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাধু মহাত্মা অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিলাভে জাতিজন্মের সকল সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া, জনগণের গুরু ও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া, প্রকৃত ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মলাভে ব্রাহ্মণ্যের মর্য্যাদা পাইয়াছেন। ইউরোপে শ্রেণীবিভাগ আছে, আমাদের দেশে জাতিভেদ আছে। ইউরোপে নিম্নতর শ্রেণীর লোকেরা গুণকর্ম্মের দ্বারা উচ্চতর শ্রেণীতে যাইয়া উঠিতে পারে, আমাদের সমাজেও নিম্নজাতির লোকে আপনার গুণকর্ম্মের দ্বারা একেবারেই যে উচ্চতর জাতির পদ ও মর্য্যাদা পায় নাই, বা পাইতে পারে না,

তাহাও নহে। তবে ইউরোপের শ্রেণীবিভেদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা যত সহজ, ভারতের জাতিভেদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা তত সহজ নহে। ইউরোপে টাকার জোরে নিম্নতর শ্রেণীর লোকে উচ্চতর শ্রেণীতে যাইয়া প্রবেশ করিতে পারে। ভারতে টাকার দ্বারা অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইতে পারিত না। ইংলণ্ডে আজ যে শুঁড়ি, কাল সে লাট; আজ যে ব্রুয়ার (brewer) কাল সে পীয়ার হইতে পারে। টাকা জমাইতে ও একটু বুদ্ধি খাটাইয়া সেই টাকার কিয়দংশ লোক-হিতে কিংবা রাষ্ট্রকর্ম্মে ব্যয় করিতে পারিলেই যে-সে সে দেশে আভিজাত্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। এ দেশের জাতির গণ্ডীটা সোনারূপা দিয়া ভাঙ্গিতে পারা যায় না—কেবল তপঃপ্রভাবে ও ভক্তির বলেই ভাঙ্গিতে পারা যায়। প্রবৃত্তির পথে নয়, নিবৃত্তির পথে;—সংসারের পথে নয়, কেবল পরমার্থের পথেই আমাদের সমাজে, জাতি-জন্মের বৈষম্য নষ্ট হইয়াছে। এ পথ বড় কঠিন, বড় সংকীর্ণ; ও পথ অপেক্ষাকৃত সহজ ও প্রশস্ত। এ পথের প্রলোভন অল্প; ও পথে অসংখ্য। ত্যাগের সংকল্প লইয়া এ পথে পদক্ষেপ করিতে হয়; ভোগের বাসনা প্রদীপ্ত করিয়া ও পথে চলিতে হয়। ইংরাজের শ্রেণীভেদ ও ভারতের জাতিভেদের কথা লইয়া বিচার-আলোচনার সময়, উভয়ের এই মূল প্রভেদটা মনে রাখা মন্দ নয়।

হিন্দুর জাতির সীমা অতিক্রম করা অসাধ্য নহে; কিন্তু অত্যন্ত দুঃসাধ্য। ইংরাজের শ্রেণীর সীমা অতিক্রম করা অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য। অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য বলিয়া সকলেই যে অতিক্রম করিতে পারে, তাহা নহে; কিন্তু অতিক্রম করিবার লোভটা সকলেরই হয়। টাকার জোরেই যখন নিম্নশ্রেণীর লোকে উচ্চশ্রেণীতে যাইয়া বসিতে পারে, তখন এই টাকা উপার্জ্জনের জন্য সমাজে একটা বিকট কাড়াকাড়ি লাগিয়া যায়। সকলেই আপনার দল ছাড়িয়া উপরের দলে উঠিবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করে। এই বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা-নিবন্ধন, নিজেকে সমাজে উঁচু করিয়া তোলাই জীবনের মুখ্য কর্ম্ম হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় জনগণের চিন্তাতে ও ভাবনায় সংসারটাই প্রবল ও পরমার্থ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেই পড়িবে,—ইহা আর বিচিত্র কি?

এই জন্যই ইউরোপ সাম্যের নামে প্রতিযোগিতার,—স্বত্বের দোহাই দিয়া সংগ্রামের প্রতিষ্ঠা করিতেছে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা এবং সংগ্রামই ইউরোপীয় সভ্যতারও শেষ কথা নহে। আমরা যেমন একদিন ত্যাগের পথে বিশ্বাত্মকত্বসাধনের দিকে যাইতেছিলাম, ইউরোপ আজ ভোগের পথে, অজ্ঞাতসারে সেই দিকেই যে চলি-য়াছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসে দেখিতে পাই, যাহারা দল বাঁধিয়া প্রথমে প্রতিবেশীর ধনসম্পদ কাড়িয়া লইতে আসিয়া, তাহার সঙ্গে লড়াই বাধাইয়া দেয়; তাহারাই ক্রমে সংগ্রাম-অন্তে সন্ধি করিয়া, আপোষে একসঙ্গে বসবাস করিতে

আরম্ভ করে। এইরূপেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী মিলিয়া বড় বড় জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ক্ষুদ্রতর স্বার্থের প্রেরণায় মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি করিতে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু এই মারামারি কাটাকাটি করিতে যাইয়াই, মারামারি কাটাকাটিটা যে কত আত্মঘাতী ব্যাপার, ইহা বুঝিতে পারিয়া, বৃহত্তর স্বার্থের প্রেরণায়, ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, কাল যে শত্রু ছিল, আজ তাহারই সঙ্গে মিত্রতা করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠে। এইরূপে মানুষের স্বার্থের গণ্ডীটা ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে, "মিশে নদী জলধিতে যেমন একাকার" হইয়া যায়, সেইরূপ স্বার্থটাই বড় হইতে হইতে, ক্রমে পরার্থে ও পরিণামে পরমার্থে যাইয়া মিশিয়া যায়। ইউরোপ ব্যক্তিগত স্বার্থের সন্ধানে যাইয়াই, ক্রমে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সুখস্বার্থকে আপনার শ্রেণীর বৃহত্তর সুখস্বার্থের মধ্যে ডুবাইয়া দিতেছে। আগে ছিল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতিযোগিতা, এখন দাঁড়াইয়াছে শ্রেণীতে শ্রেণীতে প্রতিযোগিতা। ইউরোপের সকল দেশেই কিছুদিন হইতে দুইটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি গড়িয়া উঠিতেছিল। একটা জনশক্তি, আর একটা ধনশক্তি। একটা যারা পরের কলকারখানায় জন খাটিয়া খায়, তাদের সংহত শক্তি। আর একটা ঐ সকল কলকারখানায় যারা ধন জোগায়, তাদের সংহত শক্তি। একদিন জনে জনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, ধনীতে ধনীতেও রেষারেষি ছিল। যারা জন খাটিয়া খায়, তারা একে অন্তের মজুরী লইয়া কাড়াকাড়ি করিত। যারা ধন খাটাইয়া খায়, তারাও অন্য ধনীর সঙ্গে ব্যবসায়ের মুনাফা লইয়া রেষারেষি করিত। ক্রমে জন বুঝিল, তার প্রকৃত শত্রু ধনী। আর ঐ প্রবল শত্রুর সঙ্গে লড়াই করিতে হইলে, জনের শক্তিকে দলবদ্ধ ও সংহত করা আবশ্যক। তখন জনে জনে, শ্রমজীবীতে শ্রমজীবীতে লড়াই থামিয়া যাইতে লাগিল। শ্রমজীবীরা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থকে সকলের স্বার্থ করিয়া লইল। ভিন্ন ভিন্ন শ্রমজীবী আপনার দলের স্বার্থসাধনের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে শিখিল। তারা দেখিল, ক্ষুদ্র স্বার্থের বিসর্জ্জন ব্যতীত বৃহত্তর স্বার্থের প্রতিষ্ঠা হয় না। পরার্থের প্রেরণায় নহে, শুদ্ধ স্বার্থের খাতিরে, ইউরোপের বুভুক্ষিত জনমণ্ডলী এইরূপে ত্যাগের ও বিসর্জ্জনের শক্তি অর্জ্জন করিতে লাগিল। জন যখন আপনার শক্তিকে সংহত করিতে আরম্ভ করিল, জনে জনে মজুরীর জন্য যে কাড়াকাড়ি হইত, তাহা যখন থামিয়া যাইতে লাগিল, একজন শ্রমজীবি ধনীর অত্যাচারে কাজ ছাড়িতে বাধ্য হইল, অন্য শ্রমজীবি যখন আর সে কাজে আসিল না, বরঞ্চ তার সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইবার জন্য আরও দশজন যখন ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিতে লাগিল; ধনীতে ধনীতে তখন পূর্ব্বকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগাইয়া রাখা, নিজ নিজ স্বার্থের খাতিরেই, অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন ধন-শক্তিও সম্মিলিত এবং সংহত হইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে

ইউরোপীয় সমাজে একদিকে জনশক্তি ও অন্যদিকে ধনশক্তি এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বি-শক্তি মুখোমুখি হইয়া ছাউনি গাড়িয়া বসিল।

ধন ও জন এই দুই মিলিয়া পণ্য উৎপাদন করে। কিন্তু বিপণি না হইলে পণ্য উৎপাদন নিষ্ফল হইয়া যায়। এ-রাজ্যে প্রয়োজনের পরিমাণে আয়োজন করিতে হয়, demand'এর হিসাবে supply করিতে হয়। প্রয়োজনবৃদ্ধি অর্থাৎ কিনিবার লোক বা বেচিবার বাজার বাড়াইতে না পারিলে, পণ্যের আয়োজন বৃথা হইয়া যায়। উৎপন্ন পণ্য ঘরে রাখিয়া পচাইতে হয়। ইহাতে ধনীর লোকসান, আর ধনীর ধনক্ষয়ে জনের মজুরীও কমিয়া যায়। সুতরাং দুনিয়ার বিপণিগুলি দখল করা বা দখলে রাখা, ধন ও জন উভয়েরই পক্ষে অত্যাবশ্যক হইল। প্রত্যেক সমাজের ভিতরে যেমন ধনে ও জনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিয়া উঠিয়া, ধনশক্তি ও জনশক্তিকে সংহত করিয়া একে অন্যের প্রতিকূলে প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যেও দুনিয়ার বিপণিগুলি দখল করিবার জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধিয়া উঠিল। জনে ও ধনে প্রতিযোগিতা জাগিয়া উঠিলে যেমন যারা জন খাটিয়া ও যারা ধন খাটাইয়া খায়, উভয় দলের লোকেই আপনাদের দলের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজ নিজ ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেইরূপ যখন ও যে পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে দুনিয়ার বিপণি দখল করিবার জন্য মারাত্মক সংগ্রাম বাধিয়া গেল, তখন জাতির বৃহত্তর স্বার্থের নিকটে, জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা শক্তিসঙ্ঘ সকলে, নিজ নিজ শ্রেণীর বা সঙ্ঘের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে ইউরোপের লোক ও ইউরোপীয় সমাজ সংসারের ক্ষুদ্রতম স্বার্থকে তদপেক্ষা একটু বড় স্বার্থের নিকটে, আবার সেই বড় স্বার্থকে তার চাইতে আরও বৃহত্তর স্বার্থের নিকটে, ক্রমে ক্রমে আরও বৃহত্তর স্বার্থের আহ্বানে সেই বড় স্বার্থটাকেও বিসর্জ্জন দিতে দিতে চলিয়াছে।

প্রথমে ছিল শুদ্ধ সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ। তার পর সেই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থসাধন করিতে যাইয়াই দেখা গেল, বৃহত্তর পারিবারিক স্বার্থের অধীন হইয়া না চলিলে, ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনও সম্ভব হয় না। ক্রমে দেখা গেল, এই পারিবারিক স্বার্থকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের অনুকূল ও অধীন করিয়া না রাখিলে, পারিবারিক জীবনে শক্তি ও সার্থকতাসিদ্ধি অসম্ভব হয়। ক্রমে আরও দেখা গেল যে, এই সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের অনুকূল ও অধীন করিয়া না রাখিলে সম্প্রদায়ের শক্তি ও সার্থকতাসিদ্ধি অসাধ্য হয়। এইরূপে সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, প্রবৃত্তির পথেই মানুষের স্বার্থের পরিধি উত্তরোত্তর বিস্তৃত হইয়া, তাহাকে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া, পরার্থের ও পরমার্থের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়।

স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে হইলেই সংযম শিক্ষা করিতে হয়। মানুষ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, পশুধর্ম্মসুলভ ঐকান্তিক একাকিত্বের মধ্যে যদি বাস করে, তার কোনই সংযমের প্রয়োজন হয় না, সংযম-শিক্ষার অবসর এবং ক্ষেত্রও তার মিলে না। তার পাঁচটা ইন্দ্রিয় এবং জিহ্বা ও উপস্থ যে দিকে লইয়া যায়, সেই দিকেই সে অবাধে চলিতে পারে। কিন্তু পরিবারে, আর পাঁচজনের সঙ্গে একত্র বাস করিতে গেলেই, মানুষকে কিয়ৎপরিমাণে আপনার নিরঙ্কুশ ব্যক্তিত্বকে স্বল্পবিস্তর সঙ্কুচিত করিয়া চলিতে হয়। আপনার প্রবৃত্তি সকলকে সংযত, এবং পরের সুখসুবিধার মুখ চাহিয়া নিজের সুখসুবিধাকে কিয়ৎপরিমাণে বিসর্জ্জন করিতেই হয়। এইরূপে নিবৃত্তির বা ত্যাগের বা বৈরাগ্যের পথে না যাইয়াও, প্রবৃত্তির এবং ভোগের পথ অবলম্বন করিয়াও, সংসারের সার্থকতা অন্বেষণ করিতে যাইয়া, নিজের স্বার্থের প্রয়োজনেই ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে পদে পদে বৃহত্তর স্বার্থের নিকটে বিসর্জ্জন দিয়া, মানুষ সংযমের ও ত্যাগের শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। এইরূপে একদিন যে ব্যক্তি অপরে যেখানে মজুরী খাটিয়া চারি আনা উপার্জ্জন করিতেছে, সেখানে নিজে দুই আনায় সেই খাটুনী মাথা পাতিয়া লইবার জন্য ধনীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইত, আজ সে নিজের দলের স্বার্থ বা ইজ্জৎ বজায় রাখিবার জন্য, ধর্ম্মঘট করিয়া এক টাকার রোজিয়ানা ছাড়িয়া ঘরে বসিয়া থাকিতেছে। ক্ষুধায় অন্ন নাই, শীতে আগুন জ্বালাইবার কয়লা নাই, পরিবারের হাতে একটা পয়সা, পুত্রকন্যাদের মুখে এক টুকরা রুটি দিবার সংস্থান নাই—অন্যদিকে একটু হাঁ করিলেই মুনিবে আদর করিয়া ডাকিয়া নিয়া টাকা টাকা হিসাবে রোজিয়ানা দেয়,—কিন্তু তথাপি নড়ে চড়ে না। নিজের দলের, শ্রেণীর, সঙ্ঘের, সকলের মুখ চাহিয়া, ঐ দলের সমষ্টিভূত স্বার্থের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা অসম্ভব জানিয়া, তাহারা এ সকল অসহ্য ক্লেশ, যাতনা, ক্ষতি সহিতেছে। নিজেকে নিজের দলের মধ্যে মিশাইয়া দিয়া নিজের শ্রেণীর, নিজের সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্মতাসাধন করিয়া, দলের বা শ্রেণীর স্বার্থের খাতিরে নিজের সর্ব্বপ্রকারের ক্ষতি সহ্য করিয়া, মানুষ আপনার স্বভাবগত কার্পণ্যকে দূর করিতে শিক্ষা করে। যে স্বল্পপরিমাণে আপনার ক্ষতি সহিতে পারে না, আমাদের প্রাচীনেরা তাহাকেই কৃপণ কহিতেন। স্বল্পপরিমাণেও নিজের ক্ষতি সহিবার যে অক্ষমতা, তাহাই কার্পণ্য। এই কার্পণ্যবৃদ্ধির সঙ্গে ত্যাগের শক্তিনাশ ও এই কার্পণ্যহ্রাসের সঙ্গে ত্যাগের শক্তিবৃদ্ধি হয়। ইউরোপ ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে বৃহত্তর স্বার্থের দ্বারা, ক্ষুদ্রতর সুখভোগকে বৃহত্তর সুখ ও ভোগের দ্বারা, ক্ষুদ্রতর কর্ম্মকে বৃহত্তর কর্ম্ম দ্বারা, জীবনের ক্ষুদ্রতর সম্বন্ধ সকলকে বৃহত্তর সম্বন্ধের দ্বারা আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়াই, সমাজ-জীবনে ও জাতীয় জীবনে এই কার্পণ্যকে নষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে।

ইউরোপের অতি বড় বীরপুরুষ যাঁরা, তাঁরাও আমাদের দেশের মহাপুরুষদিগের

মতন, অচ্যুত অভয়পদ প্রাপ্ত হন নাই। ইউরোপের বড় বড় ধার্ম্মিকদিগেরও দেহাত্মাধ্যাস নষ্ট হয় নাই, শমদমাদি ষট্সম্পত্তি লাভ হয় নাই, বিবেক জাগ্রত হয় নাই, বৈরাগ্যসিদ্ধি হয় নাই। আমরা শ্বেতাঙ্গ দেখিলে আতঙ্কে পালাই, কিন্তু বসন্তবিসূচিকাক্রান্ত আত্মীয়স্বজনকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া, বেতনভোগী শুশ্রূষাকারী নিযুক্ত করিয়া, আত্মরক্ষা করি না। আমরা মানুষের মতন বাঁচিয়া থাকিতে জানি না, কিন্তু বীরের মতন মরিতে পারি। এ বাহাদুরী আমাদের আছে। কিন্তু জীবনের দাম সে জানে না, মরণে তার কোনই কৃতিত্ব নাই। ইংরেজ জীবনের দাম জানে। জীবনটা তার প্রিয়। এই জন্য সে যখন সাধ করিয়া, কোমর বাঁধিয়া নিজের দলের বা নিজের জাতির বা মানবসমাজের হিত-কল্পে মরণের সম্মুখীন হয়, তার সে মরণাভিসারের মূল্য বিস্তর বেশী। প্রতিদিনের দৈনন্দিন জীবনে হোক না কেন সে ভোগী, বিরাগী নহে; হোক না কেন সে লোভী, বিবেকী নহে; হোক না কেন সে ইন্দ্রিয়ের দাস, জিতেন্দ্রিয় নহে; কিন্তু আমাদের পুরাণপুথিগত পর্ব্বতপ্রমাণ বৈরাগ্যের, বিবেকের, শমদমাদি ষট্সম্পত্তির উপদেশ অপেক্ষা, তার নিজের দলের জন্য, নিজের দেশের জন্য, বিশ্বমঙ্গলের জন্য মরণ আলিঙ্গন করিবার এই সংকল্প ও শক্তি কোটীগুণে বেশী মূল্যবান্।

বহুকাল ধরিয়া আমরা যে পথে দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, বিবেক ও বৈরাগ্যাদি লাভ করিয়া, বিশ্বাত্মৈকত্ব ও ব্রহ্মাত্মৈকত্বসাধনের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, সে পথে সকলের অধিকার নাই, শাস্ত্রকারেরাই এ কথা কহিয়া গিয়াছেন। সে পথে সকলের সিদ্ধিলাভও সাধ্যায়ত্ত নহে। যাঁরা এ পথে সত্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাঁরা মানবতার উচ্চতম চূড়াশিখরে অধিরোহন করেন, শতকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিব। শিবরাত্রির সলিতার মতন ইঁহারাই আমাদের জাতীয় জীবনের আশার আশ্রয় হইয়া আছেন। মাঝে মাঝে ইঁহাদের দেখা পাই বলিয়াই, এত দুঃখ, এত দারিদ্র্য, এত হীনতার মধ্যেও আমরা যে মানুষ, দুনিয়ার কোনও মানুষের চাইতে খাট নই, এই বোধটা অন্তরে এখনও জাগিয়া আছে। এই কার্পণ্যোপহত, এই নিবর্বীর্য্য, এই নিশ্চেষ্ট, এই কৃমি-স্বভাবাপন্ন, ঘোরতমসাচ্ছন্ন জাতির মধ্যে কি যে বীর্য্য, কি যে শক্তি, কি যে প্রাণতা লুকাইয়া আছে, এ সকল সিদ্ধ মহাপুরুষ ও মহাভাগবতদিগকে দেখিলেই প্রাণের মধ্যে তাহার প্রেরণা জাগিয়া উঠে।

কিন্তু সাহারার মাঝখানে মাঝে মাঝে, বিস্তৃত ব্যবধানের অন্তরে দু'চারিটি ওসিস বা জলশস্যপূর্ণ ভূখণ্ড আছে বলিয়া, সে মরুভূমি যেমন বাসযোগ্য হয় না, সেইরূপ ভারতের এই বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে, কালে ভদ্রে দু'দশজন সিদ্ধমহা-পুরুষ কিংবা মহাভাগবত মাথা তুলিয়া উঠেন বলিয়া, সত্যভাবে সমগ্র জাতিটাই যে

বড় আছে বা বড় হইতেছে, এরূপ কল্পনা করা যায় না। সমগ্র জাতিটাকে যদি বড় করিয়া তুলিতে হয়, তবে সকলে যাহাতে এই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ আয়ত্ত করিতে পারে, তার আয়োজন করিতে হইবে।

আর এই আয়োজন করিতে বসিয়া সকলের আগে ইহা বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে মানবতার উচ্চতম অবস্থায় উন্নত করিতে হইলে, বিবেক, বৈরাগ্য, শমদম প্রভৃতি প্রাচীন সাধনমার্গই প্রশস্ত হইলেও, সমষ্টিগত সমাজকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর স্তরে তুলিয়া লইতে হইলে, সমাজে সেই প্রয়োজনসাধনের উপযোগী কায়ব্যূহ গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমাদের দেশে নিজে নিজে, আপনাপন আন্তরিক সাধনবলে, অসীম শক্তিলাভের পথ কখনও বন্ধ হয় নাই। এই জন্যই এই যুগেও আমরা স্বামী দয়ালদাস, বাবা অর্জ্জুনদাস কিংবা পরমহংস মহাশয়ের মতন সাধু ও সিদ্ধ মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার পাইয়াছি। ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ জীবনে আপনাদের অন্তরতম কর্ত্তাপুরুষকে অন্তরের রত্নবেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বিশ্বাত্মৈকত্বলাভ ও বিশ্বমৈত্রী-সাধন করিয়াছিলেন। বাবা অর্জ্জুনদাসের চক্ষে ব্রাহ্মণচণ্ডাল এক ছিল, সকলের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রাণারাম রামকে দেখিয়া, অপূর্ব্ব প্রেমভরে, পরিচিত অপরিচিত যেই হউক না কেন, মানুষ দেখিলেই 'আ মেরা রাম! আ মেরা রাম!' বলিয়া আদর করিয়া আরতি করিতেন। স্বামী দয়ালদাস, সাধু-অসাধু-নির্ব্বিশেষে ক্ষুধিতেরে অন্ন দিয়া আপনার ইষ্টপূজা করিতেন। এমন বিশ্বাত্মৈকত্বসিদ্ধি, সর্ব্বজীবে এমন শিববুদ্ধি, দেবতাজ্ঞানে প্রাকৃত জনের এমন আরতি, ইষ্টমূর্ত্তিবোধে মানুষের প্রতি এমন ভক্তি—দুনিয়ার আর কোথাও দেখি নাই; এরূপ ভক্তির কাহিনীও আর কোথাও শুনি নাই। কিন্তু ইঁহারা নিজ নিজ সাধন-বলেই এই অপূর্ব্ব চরিত্রলাভ করিয়াছেন, সামাজিক রীতিনীতিকে উপেক্ষা করিয়াই এই বিশ্বমৈত্রী সাধন করিয়াছেন, সংসারে থাকিয়া, সংসারধর্ম্ম পালন করিয়া, এ সিদ্ধিলাভ করেন নাই। আমাদের সমাজ এ সাধনার ব্যাঘাত দেয় না, কিন্তু জনগণকে এ পথে লইয়া যাইবার অনুকূল ব্যবস্থাও আমাদের সমাজে নাই।

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিয়াছি, কলিযুগের পথ আর সত্যযুগের পথ এক নয়। কলির মানুষ অতটা সংযমসাধনে অপারগ। তপস্যার ক্লেশ কলির মানুষের সহ্য হয় না। এই জন্য কলির পথ কঠোর নিবৃত্তির পথ নহে, কিন্তু কোমল প্রবৃত্তির পথ। কলির জীব অন্যান্য দেশে এই প্রবৃত্তির পথে চলিয়াই অজ্ঞাতসারে পরমার্থের দিকে অগ্রসর হইতেছে; কিন্তু ভারতের লোক পারিতেছে না কেন? আমাদের সামাজিক বিধিব্যবস্থা, আমাদের সমাজের কায়ব্যূহ ইহার অনুকূল নহে বলিয়াই আমাদের এই দুর্দ্দশা।

কতকগুলি ধারকরা ভাবের প্রেরণায় একটা মনগড়া সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের এই কায়বূ্যহ রচিত হইবে না। ইউরোপের আমদানী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লগুড় দিয়া ভারতের পরিবার-তন্ত্র বা সমাজ-তন্ত্রকে ভাঙ্গিয়া, মাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের উপরে কলের বুননী দিয়া, সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার নগ্নপরীকে চড়াইয়া, সেই ভগ্ন পরিবারতন্ত্রের ও সমাজতন্ত্রের উপরে, আধুনিকতার বা modernism'এর ধ্বজা উড়াইলেই, সমাজের নূতন কায়বূ্যহ গড়িয়া উঠিবে না। সমাজও যে জীব। প্রত্যেক সমাজের একটা সমষ্টিগত জীবনীশক্তি আছে। আধুনিক ইউরোপীয় সমাজতত্ত্বও এ কথা বলে। সমাজও একটা organism—তারও একটা বিশিষ্ট স্বরূপ ও সেই স্বরূপের প্রকাশোপযোগী বিশিষ্ট রূপ আছে। সমাজের একটা নিজস্ব প্রাণতা, ও সেই প্রাণতার সার্থকতাসিদ্ধির জন্য উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। প্রত্যেক জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি তাহার অন্তর্নিহিত প্রাণের প্রেরণায়, সেই প্রাণকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ও সেই প্রাণের যথাযোগ্য অভিব্যক্তির প্রয়োজনেই তিলে তিলে গড়িয়া উঠে, বাহির হইতে ও উপর হইতে তাহার ঘাড়ে আসিয়া চড়িয়া বসে না। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানে এ সকল অতি জানা ও অতি মোটা কথা। সমাজজীবের আত্মপ্রয়োজনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার নব নব কায়বূ্যহ রচিত হইয়া থাকে, কথায় এ সকল গড়ে না। মানুষকে লইয়াই ত সমাজ। মানুষের জীবনে যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, সমষ্টিগত সমাজ-জীবনেও সেই সকল প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া, সমাজের বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির প্রতিষ্ঠা করিয়া তার কায়বূ্যহ রচনা করে। মানুষকে এজগতে পদে পদে আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতে হয়। এই জন্যই মানুষের ইন্দ্রিয়সকলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষুশ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এ সকল মানুষকে কেবল জগতের রূপরসাদি ভোগ করাইবার জন্যই সৃষ্ট হয় নাই, মানুষের জীবনের রক্ষী ও প্রহরিরূপেও এই ইন্দ্রিয়গ্রাম সর্ব্বদা তাহার আত্ম-রক্ষার সহায়তা করিয়া থাকে। সমষ্টিগত মানব-সমাজকেও সেইরূপ সর্ব্বদাই প্রতি-বেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের আততায়িতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয়। সমাজের এই আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই ক্ষাত্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। সেইরূপ সমাজের অন্নবস্ত্রাদির সংস্থানের জন্য বৈশ্যবৃত্তি এবং তাহার জ্ঞানবিজ্ঞানাদি সাধনের জন্য ব্রাহ্মণ্যবৃত্তির স্ফুরণ হইয়া থাকে। এইরূপে সমাজ আপনার প্রয়োজনেই দেশের শাসনসংরক্ষণের, কৃষি-বাণিজ্যরক্ষার, ধর্ম্মশিক্ষার ও পারমার্থিক তত্ত্বের অনুশীলনের জন্য এ সকল কার্য্যসাধনের উপযোগী রাষ্ট্রীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা political institutions, ব্যবসাবাণিজ্যসম্বন্ধীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিংবা economic এবং industrial institutions, এবং ধর্ম্ম ও পরমার্থ-সম্বন্ধীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিংবা religious এবং spiritual instititions এই সকল গড়িয়া তুলে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমাবেশে ও

সমবায়েই প্রত্যেক সমাজের কায়ব্যূহ বা social structure'এর প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়।

সমাজ আত্মপ্রয়োজনেই এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গড়িয়া এই বিচিত্র কায়ব্যূহ রচনা করে। কিন্তু কোনও কারণ বশতঃ সমাজের ক্ষাত্রবৃত্তি লোপ পাইলে, সমাজের লোকের মধ্যে সমগ্র সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণ-ধ্যান ও সেই অকল্যাণকে প্রতিহত করিয়া কল্যাণকে প্রবৃদ্ধ করিবার জন্য আবশ্যকীয় কর্ম্ম সাধন করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি দু'ই হ্রাস হইতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে সমাজের লোকের দৃষ্টি সমগ্র সমাজ হইতে সরিয়া আসিয়া আপনা হইতেই আপনাপন ক্ষুদ্রতর সম্প্রদায় বা জাতি-গোষ্ঠীর উপরে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপে কোনও সমাজে সমাজের বৈশ্যবৃত্তিও যদি অন্য সমাজের লোকের আয়ত্তাধীন হইয়া পড়ে, অন্য সমাজের লোক আসিয়া যদি সেই সমাজের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রকে দখল করিয়া বসে, তারাই যদি ধনী হইয়া, সমাজের লোকদিগকে জন খাটাইয়া দেশের পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে, কৃষিবাণিজ্যাদি রক্ষা করা ও তার উন্নতিবিধান করিবার দায় হইতে সমাজের লোকে মুক্তিলাভ করে। বৈশ্যবৃত্তির অনুশীলনে সমাজের ভিতরে ও সমাজের বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন বিপণির উপরে যাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, যাহারা নিজের মাথা খাটাইয়া সমাজের ধনবৃদ্ধি করিতে গিয়া, একদিকে জড়প্রকৃতির সঙ্গে, অন্যদিকে অপর প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের বৈশ্যশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার শক্তিসাধ্যকে বিশালতর ক্ষেত্রে নিয়োজিত করিত, ক্রমে সে দায় হইতে মুক্ত হইয়া, তারা ক্ষুদ্রতর স্বার্থের বন্ধনে জড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে।

এইরূপে সমাজের ক্ষাত্রশক্তি ও ক্ষাত্রকর্ম্ম—যাহাকে আমরা আজিকালি রাষ্ট্র-শক্তি ও রাষ্ট্রকর্ম্ম বলিয়া থাকি—দেশের শাসনসংরক্ষণ যার অধিকার; এবং বৈশ্যশক্তি ও বৈশ্যকর্ম্ম—দেশের কৃষিবাণিজ্যাদির ব্যবস্থা করা যার লক্ষ্য—যে ক্ষাত্রশক্তি ও ক্ষাত্রকর্ম্ম এবং বৈশ্যশক্তি ও বৈশ্যকর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া, মানুষ সর্ব্বদাই আপনার জীবনের ব্যক্তিগত স্বার্থকে অতিক্রম ও উপেক্ষা করিয়া বৃহত্তর জাতিগত স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত হয়—এ সকল শক্তি ও কর্ম্ম যখন দেশের লোকের হাত হইতে চলিয়া যায়, তখন মানুষের মন স্বভাবতঃই ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। একদিন যে স্বরাষ্ট্র-রক্ষার জন্য অম্লানবদনে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারিত, সে ক্রমে সেই বিশালতর স্বার্থের প্রেরণা হারাইয়া, ক্ষুদ্রতর স্বার্থে জড়িত হইয়া, সংকীর্ণচেতা, ভীরু এবং কৃপণ হইয়া পড়ে।

মানুষ একটা-না-একটা জায়গায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেই চাহে। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে যখন আত্মপ্রতিষ্ঠার কোনও সম্ভাবনা ও অবসর না থাকে, সংসারের

বিশালতর কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করা যখন তাহার অসাধ্য হইয়া পড়ে, তখন মানুষ আপনার প্রকৃতির প্রেরণাবশতই ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণতর স্বার্থে জড়াইয়া পড়ে। এবং এইরূপে মানুষের স্বার্থের, কর্ম্মের, চিন্তার এবং ভাবনার গণ্ডী যত ছোট হইয়া আসে, ততই তার ত্যাগের শক্তিও হ্রাস হইতে থাকে। ত্যাগের শক্তি যে পরিমাণে হ্রাস হয়, সেই পরিমাণে তার কার্পণ্যও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কার্পণ্য বৃদ্ধি পাইলে, সে সকল বিষয়েই কেবল আপনাকে বাঁচাইয়া চলিবার জন্য ব্যস্ত হয়। তখন সে

"আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি"

এই নীতি অবলম্বন করিয়া, স্ত্রীকে বিসর্জ্জন দিয়াই হউক, আর ধন বিসর্জ্জন করিয়াই হউক, সর্ব্বদা আপনার ক্ষুদ্র সুখস্বোয়াস্তিটাকে রক্ষা করিতে ব্যগ্র হয়।

চিৎপুর যে চিৎ হইয়া সকল সহিয়া থাকে, তাহা তার শাস্ত্রানুগত্যের জন্যও নহে, আচারবশুতার জন্যও নহে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র কৃপণতার জন্য। আমরা কোনও বিষয়ে নিজের ক্ষতি সহিতে শিখি না ও সহিতে পারি না বলিয়াই, ইংরাজ যাহাকে সিভিক্ ধর্ম্ম বলে, আমাদের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

আর প্রয়োজন হইলে যে আমরা শাস্ত্র ও আচারকে পায়ে ঠেলিয়া চলিতে পারি না, এমনও নয়। হয় ত বা মহাভারতের সময়ে ভারত-সমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সেকালেও দেখি, দ্রোণ ও কৃপ ব্রাহ্মণ হইয়াও অস্ত্র-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। সমাজ-রক্ষার জন্য যখন প্রয়োজন হইল, তখন পরশুরাম ব্রাহ্মণ হইয়াও, ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়দিগের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুই শত আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ণাশ্রমশৃঙ্খল-বদ্ধ মহারাষ্ট্রে যখন হিন্দুরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন উপস্থিত হইল, তখন যে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই লড়াই করিয়াছিল, তাহা নহে। পেশবাদিগের সময়ে অস্পৃশ্য-চণ্ডাল পেশবা-সৈন্যের গোলন্দাজ-বিভাগের প্রধান সেনানী ছিলেন; এবং সমরাঙ্গনে চিৎপাবন পেশবার তাঁবুর অব্যবহিত পরেই এই চণ্ডাল গোলন্দাজ-সেনাপতির তাঁবু সন্নিবিষ্ট হইত। দক্ষিণাঞ্চলে যে চণ্ডালের মুখ-দর্শনে ব্রাহ্মণকে স্নান করিতে হয়, সেই চণ্ডাল পেশবার তাঁবুর পার্শ্বে স্বগণ সমভিব্যাহারে আপনার তাঁবু স্থাপন করিতেন,—এই অসাধ্যসাধন করিল কে? সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মনগড়া বা ধারকরা আদর্শের প্রেরণায় এই সামাজিক বিপ্লব ঘটে নাই, ঘটিয়াছে সমাজের আত্মপ্রয়োজনে।

আর আজ যদি আমাদের হাতে আবার আমাদের ক্ষাত্রকর্ম্ম ফিরিয়া আইসে, আমাদিগকে যদি আজ স্বদেশের শাসন-সংরক্ষণের ভার নিজের হাতে লইতে হয়, তাহা হইলে ভারতের ব্রাহ্মণ কি ছোঁৎমার্গ আশ্রয় করিয়া, দেশ-রক্ষার ভারটা তথাকথিত হীনজাতি—বাঙ্গালার নমঃশূদ্র, কিংবা তৈলঙ্গের রেড্ডি, নায়েডু, অথবা তামিলদেশের

পারিয়াদের উপরে ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইবেন? নৌসেনা গড়িয়া ও সমরপোত নির্ম্মাণ করিয়া ভারতসাগরকে আততায়ীর অভিযান হইতে রক্ষা করিতে হইলে, হিন্দু কি বলিবেন,—"না, কলিতে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ"—সুতরাং ওকর্ম্মটা চট্টগ্রামের খালাসীদিগেরই একচেটিয়া করিয়া দেওয়া হউক? অথবা সমরক্ষেত্রে যাইয়া, সাড়ে তিন শত ব্রাহ্মণে পাঁচ শত পাকশালা নির্ম্মাণ করিয়া নিজেদের কুলরক্ষা করিয়া, পরে দেশরক্ষায় জন্য অগ্রসর হইবেন? না—দেশরক্ষাটা কুল ও জাতরক্ষা অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য অবলীলাক্রমে ক্ষুদ্রতর আচারবিচার ভাঙ্গিয়া চলিবেন? আজ যদি বিশ্ববিপণিতে স্বদেশের পণ্য প্রতিষ্ঠা করিবার কর্ম্ম দেশের লোকের হাতে আসিয়া পড়ে, তবে কি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কুলে যারা জন্মিয়াছে, তারা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে না? না পণ্যসরবরাহের জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে যাইয়া, ব্রাহ্মণ-সওদাগরের জাহাজে কেবল ব্রাহ্মণই খালাসী ও পরিচারক হইবে? এ সকল বৃহত্তর কর্ম্মভার যদি আমাদের মস্তকে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে, আমরা কি আততায়ীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার সময়, অথবা শত্রুপক্ষের উপরে চড়াও করিবার আগে, পঞ্জিকা খুলিয়া, দিনক্ষণ গুণিয়া কাজ করিব, না করা সম্ভব হইবে?

এখন আমাদের বড় কাজ নাই বলিয়াই, ছোট কাজের খুঁটিনাটি লইয়া এত ঝগড়াঝাঁটি করি। বড় কাজ আসুক, ছোট বিচারবিবেচনা আপনি সরিয়া যাইবে। বৃহত্তর স্বার্থের প্রেরণা জাগুক, ক্ষুদ্রতর স্বার্থ আপনি লজ্জা পাইয়া দূরে যাইয়া মুখ লুকাইবে। দেশমাতার ডাক পড়ুক—তখন জাতিবর্ণের ভেদ ভুলিয়া লোকে এক হইয়া তাঁর পাদপ্রান্তে যাইয়া সার দিয়া দাঁড়াইবে, কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র, এ কথা মনে জাগিবে না। রাষ্ট্রের শক্তি জাগুক, শাস্ত্রের শাসন আপনি তার পথ করিয়া দিবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

চির-সঙ্গী

সান্দ্র-নিবিড় জ্যোৎস্না-মাঝে
তোমার বুঝি বংশী বাজে
তোমার বুঝি পায়ের বাজে শিঞ্জিনী,
দখিণ হ'তে বাতাস ছুটে
তোমার তনুর গন্ধ লুটে
তাইতে কোটী ভ্রমর উঠে গুঞ্জনি'।

তোমার চোখের দৃষ্টি লাগে
তাইতে বুঝি হাস্য জাগে
অসীম নভের দৃষ্টিহারা অনন্তে,
তোমার বুঝি আঁচল দোলে
গন্ধে ছাওয়া কানন-কোলে
স্নিগ্ধ বায়ে শীতল-করা বসন্তে।

আমার বুঝি হিয়ার ভাগে
তোমার চরণ-চিহ্ন জাগে
তাইতে সেথা মুঞ্জে প্রণয়-শতদল,
আমার কোটী জন্ম-ব্যাপী
রঙ্গ তোমার পড়্ছে ছাপি'
তাইতে উঠে দুঃখ-সুখ অবিরল।

আমার সকল আশার মাঝে
তোমার বুঝি হাসি বাজে
আমার সকল ব্যথায় তোমার রঙ্গ গো,
আমার আলোয় অন্ধকারে
এই পারে কি ওই পারে
সত্য মানি তোমার চির-সঙ্গ গো।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কণ্বের কঠোর মূর্ত্তি

কণ্বের নিজের মূর্ত্তি কূটস্থ ব্রহ্মের ন্যায়, কোমল ও কঠোর দু'এ এক। কঠোর ভাবটা কোমলতায় মিশাইয়া গিয়াছে। তিনি যে কঠোর, তাহা বুঝাই যায় না। কিন্তু তাঁহার কঠোর মূর্ত্তিও আছে, তাহার মধ্যে একটি শার্ঙ্গরব। কালিদাস বাছিয়া বাছিয়া নামটিও দিয়াছিলেন শার্ঙ্গরব। শার্ঙ্গ বলিতে শিংএর তৈয়ারী ধনুক বুঝায়। সে কালে মহিষের শিং দিয়া ধনুক তৈয়ারী হইত। সে ধনুক টানা খুব কঠিন। এক অর্জ্জুনের শার্ঙ্গ-ধনু ছিল। রামচন্দ্রের শার্ঙ্গ-ধনু ছিল। তাহার শব্দ খুব কঠোর ছিল, টং টং করিয়া বাজিত। আমাদের শার্ঙ্গরবের স্বর বা রবও তেমনি কর্কশ, তাঁহার বোল বেশ কাটা কাটা। তিনি ঝগড়া করিতে—কটুকথা বলিতে বড়ই মজবুত। তাঁহার এক সঙ্গী আছেন, নাম শারদ্বত। শরৎ শব্দের উত্তর বৎ প্রত্যয় করিয়া শরদ্বৎ শব্দ হয়; শরৎকালের মত, গম্ভীর, পরিষ্কার। তাঁহারই পুত্র শারদ্বত অথবা শরদ্বান্ ও শারদ্বত একই। স্বার্থে প্রত্যয় হইয়াছে। তিনি গম্ভীর অথচ পরিষ্কার, কথা খুব কম কহেন। কিন্তু যা কহেন, তাহা একেবারে কাটা-ছাঁটা। তাহার উপর আর কাহারও কথা চলে না। তাঁহার স্বরও গম্ভীর, টং টং করে না। তিনি দুচারিটি কথা কন, তাহাতে অনেক কথার, অনেক ঝগড়ার, নিষ্পত্তি হইয়া যায়।

যখন প্রিয়ংবদা ফুল তুলিতেছেন, অনসূয়া মাঙ্গল্যদ্রব্য-সংগ্রহের জন্য গিয়াছেন, তখন নেপথ্যে শুনা গেল, "গৌতমি, শার্ঙ্গরবকে বল, শকুন্তলাকে আনুক।" তাহাতেই প্রিয়ংবদা বুঝিলেন যে, এরা এখনই হস্তিনাপুরে যাইবে। সে অমনি অনসূয়াকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "শীঘ্র আয়, শীঘ্র আয়, এদের যাবার সময় হ'ল।" সুতরাং শার্ঙ্গরব আশ্রমের সকলের কাছেই পরিচিত, ডাকা-বুকা লোক, চালাক-চটপটে, বলিতে কহিতে মজবুত, সকল কাজেই মজবুত, সকল কাজেই অগ্রসর। শকুন্তলার আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল, কণ্বমুনিও ঋগ্‌বেদের ছন্দে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তার পর কণ্বমুনি বলিলেন, "শার্ঙ্গরব কোথায়?" সুতরাং শার্ঙ্গরবই যে, যারা হস্তিনা যাইতেছে, তাদের কর্ত্তা হইয়া যাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শার্ঙ্গরব উপস্থিত হইলে, কণ্ব বলিলেন, "তোমার ভগিনীকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাও।" শার্ঙ্গরবও বলিলেন, "এই দিকে এস, এই দিকে এস।" সকলে চলিতে লাগিল। কোন কাজের ভার পাইলে যুবকেরা কাজটা যত শীঘ্র পারে, শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, শার্ঙ্গরবেরও ত তাই। খানিক দূর গিয়া একটি পুকুর দেখিতে পাইয়া শার্ঙ্গরব গুরুকে বলিলেন, "জলের ধার পর্য্যন্তই আত্মীয়-স্বজনেরা

যাইয়া থাকেন, এই ত পুকুর, এইখানে যা কিছু বলার বলিয়া আপনি ফিরিয়া যান।” কণ্ব যাহা বলিয়া দিলেন, সবই খুব মিষ্ট, খুব কোমল। কিন্তু তাহার প্রত্যেক অক্ষরে ছুরি আছে, “মহারাজ মনে মনে জানিবেন, সংযমই আমাদের ধন। মনে জানিবেন, আপনার কুল বড় উচ্চ। শকুন্তলার প্রতি আপনার স্নেহের কথাও মনে করিবেন। সে স্নেহে বন্ধু-বান্ধবের কোনও হাতই ছিল না, এবং এখনও নাই। এই সকল কথা মনে রাখিয়া অনেক পরিবারমধ্যে একটি বলিয়া আমার এই কন্যাটিকে লইবেন। ইহার পর যাহা কিছু, তাহা শকুন্তলার অদৃষ্ট। আমরা তাহা বলিতে পারি না।” আপনি সংযমী ঋষিদের আশ্রমে আসিয়া অত্যন্ত অসংযমের কাজ করিয়া গিয়াছেন, আপনি বড় বংশের লোক বলিয়া সব মানাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার এই কন্যাটি গ্রহণ করিলে আর কোন কথাই থাকিবে না। আমরা উহাকে পাটরাণী করিতে বলিতেছি না। অনেক রাণীর মধ্যে একটি করিয়া লইবেন। তাহার পর উহার ভাগ্য; আপনি লইতেও পারেন, না লইতেও পারেন, লইয়া বড়রাণীও করিতে পারেন। আমরা সে কথা বলিতে চাহি না।

কণ্বমুনির কঠোরমূর্ত্তি শার্ঙ্গরব এই “খবরের” কি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা পরে প্রকাশ হইবে। কিন্তু মূল এই, ইহার উপর অনেক টীকা-টিপ্পনী চড়িবে; অনেক ভাষ্য-বার্ত্তিক হইবে। শার্ঙ্গরব কণ্বের কথা শুনিয়া বলিলেন, “হাঁ, আমি বেশ করিয়া বুঝিয়া লইলাম।” এই যে “বেশ করিয়া” বলিলেন, তাহার অর্থ পরে প্রকাশ হইবে। কণ্ব তাহার পর বলিলেন, “রাজাকে ত অনেক উপদেশ দিলাম। শকুন্তলাকে এখন দু-চারিটা কথা বলিয়া দেওয়া উচিত। আমরা বনবাসী হইলেও সংসারের ব্যাপার একটু একটু বুঝি।” তাহাতে শার্ঙ্গরব বলিলেন, “যাহাদের বুদ্ধি আছে, তাহাদের কিছুই এড়ায় না।” তাহার পর বেলাটা বেশী হইতেছে দেখিয়া শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে শীঘ্র শীঘ্র কথাটা সারিয়া লইতে বলিলেন; তিনি ত আর কণ্ব মুনিকে বলিতে পারেন না—“মহাশয়, আর কেন, ঢের হইয়াছে, এখন ফিরুন।” কারণ, তিনি যে ঋষির শিষ্য, ঋষি যে তাঁহার দেবতা। একালকার শিষ্য ত নয় যে, গুরুমারা বিদ্যা হইবে। গুরুর মুখের উপর যা-তা বলিবে? যাহা শার্ঙ্গরব বলিতে পারিল না, তাহা ভগিনী গৌতমী বলিয়া দিলেন, “শকুন্তলা থামিবে না, তুমিই দাদা থাম।”

রাজবাড়ী উপস্থিত হইয়া যখন ঋষিরা সকলে কঞ্চুকীর সঙ্গে রাজার কাছে দেখা করিতে যাইতেছেন, তখন অনেক লোকজন দেখিয়া শার্ঙ্গরবের মনে কি ভাব হইতেছে, দেখা যাউক। এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, মহাভারতের শকুন্তলো-পাখ্যানের ঋষিরা নগরের মধ্যেই আসেন নাই। তাঁহাদের আকারপ্রকার দেখিয়া লোকে নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করায় তাঁহারা নগরের গেটের কাছ হইতেই

আশ্রমে ফিরিয়া গিয়াছিলেন; শকুন্তলা ও তাঁহার ছেলে—বয়স বার বছর,—দুজনেই নগরদ্বার হইতে রাজসভা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কালিদাসের শকুন্তলা রাজবাড়ী যাইবার সময় গর্ভবতী, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, গৌতমী এবং আরও অনেকে ছিলেন। শার্ঙ্গরব বলিলেন, "রাজাটি ত ভাল, ভাগ্যবান্, কখন অন্যায় করেন না। নিতান্ত ছোট লোকেও অপথে যায় না, কিন্তু আমার নির্জ্জনে থাকা অভ্যাস কি না, তাই এই জনাকীর্ণ জায়গাটা ঠিক যেন আগুন-লাগা ঘরের মত বোধ হইতেছে। আশ্রমে ত আগুন না লাগিলে এত লোক কখন জমা হয় না।" "নিতান্ত ছোট লোকেও অপথে চলে না", এই কথাটা পড়িলে মহাভারতে ছোট লোকে ঋষিদের উপর যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল, সেটা মনে পড়ে।

পুরোহিত যখন রাজার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "দেখ, এত বড় রাজা তোমাদের অভ্যর্থনার জন্য আগেই আসন ছাড়িয়া অপেক্ষা করিতেছেন", তখন শার্ঙ্গরব মুরুব্বিয়ানা সুরে বলিলেন, "এটা প্রশংসার কথা বটে, কিন্তু আমরা এটা একটা খুব বড় কথা বলিয়া মনে করি না। কারণ, গাছগুলা ফল হইলেই নুইয়া পড়ে। নূতন জলের সময় মেঘগুলা অনেক নামিয়া আসে। সৎপুরুষেরা সমৃদ্ধির সময়েই নম্র হয়। পরোপকারকের স্বভাবই এই।" যখন শিষ্টাচারের পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের তপস্যার ত কোন বিঘ্ন হয় নাই?" রাজা মনে করিয়াছিলেন, তপস্যার বিঘ্ন হইয়াছে বলিয়াই হয় ত ঋষিরা আসিয়াছেন। তখন ঋষিরা সকলে একসুরে বলিলেন, "আপনি যখন রক্ষা করিতেছেন, তখন তপস্যার বিঘ্ন কিরূপে হইবে? সূর্য্য প্রকাশ থাকিতে কি অন্ধকার আসিতে পারে?" রাজা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কণ্বমুনির কুশল?" তখন আবার একবাক্যে উত্তর হইল, "যাঁহারা সিদ্ধপুরুষ, কুশল ত তাঁহাদের আপনাদেরই হাতে। তিনি আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া এই কথাটি বলিয়াছেন।" রাজা "কি বলিয়াছেন?" তখন শার্ঙ্গরব বলিলেন, "আপনি গান্ধর্ববিধানে পরস্পরে নিয়ম করিয়া আমার এই কন্যাটিকে বিবাহ করিয়াছেন। তাহাতে আমি খুসী হইয়াছি এবং আপনার এই কাজের পোষকতা করিতেছি। আপনি বড়লোকের অগ্রগণ্য, শকুন্তলা সৎকার্য্যের মূর্ত্তি। অনেক দিনের পর সমানে সমানে বর ও কনে মিল করাইয়া দিয়া বিধাতা নিন্দার হাত হইতে এড়াইয়াছেন। ইনি এখন গর্ভবতী, ইঁহাকে আপনার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করুন, আর ইঁহার সঙ্গে ধর্ম্মকর্ম্ম করুন।" শুনিয়া রাজা বলিলেন, "এ আবার কি কথা?" শার্ঙ্গরব বলিলেন, "এ কি? কখন্ কি করিতে হয়, আপনারাই জানেন। স্ত্রীলোক বিবাহের পর যদি জ্ঞাতিকুলেই থাকে, লোকে নানা রকম আশঙ্কা করে। সেই জন্যই বন্ধুবান্ধবে স্বামী ভাল না বাসিলেও, তাহাকে স্বামীর কাছেই পাঠাইয়া দেয়।" রাজা যখন বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া মনেই

করিতে পারিলেন না, তখন শার্ঙ্গরব রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "কি যে কাজটা করা হইয়াছে, তাহা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া রাজার কি উচিত, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়া?" "আমি অসৎ অভিপ্রায়ে এ কথা বলিতেছি, আপনি মনে করিলেন কিসে?" তখন শার্ঙ্গরব অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "যারা ঐশ্বর্য্যে মত্ত, তাদেরই কেবল এই রকম বিকার হয়।" অর্থাৎ একবার করে, পরে বলে "না"। রাজা বলিলেন, "আপনারা আমাকে বড়ই তিরস্কার করিতেছেন।" এই সময়ে গৌতমী ঘোম্‌টা খুলিয়া শকুন্তলার মুখ দেখাইলে অনেকে অনেক রকম ভাবিতে লাগিল। কেহই কথা কহে না। শার্ঙ্গরবের দেরী সহে না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি মহারাজ, চুপ করিয়া রহিলেন যে।" রাজা তখনও মনে করিয়া উঠিতে পারিলেন না, বলিলেন, "আমার ত কিছুই মনে হয় না, তখন এই গর্ভবতীকে কেমন করিয়া 'স্ত্রী' বলিয়া গ্রহণ করি?" তখন শার্ঙ্গরব একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। "তুমি ত ঋষির উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছ। তথাপি ঋষি তোমার কার্য্যে দোষ দেখেন নাই। তুমি দুষ্কার্য্য করিলেও তিনি তোমার অনুকূলেই মত দিয়াছেন। এখন কি না তুমিই তাঁহাকে অপমান করিতে বসিলে। তুমি তাঁহার বাড়ীতে ডাকাতি করিয়াছ। তিনি চোরাই মাল তোমার হাতে সঁপিয়া দিতেছেন। তাহার পর তোমার এই ব্যবহার।"

শকুন্তলা যখন নানা উপায়ে চেষ্টা করিয়াও রাজার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলেন না এবং 'হায়, আমি পুরুবংশের রাজা বলিয়া এই কপটাচারীকে বিশ্বাস করিয়া এখন কি না স্বৈরিণী, স্বেচ্ছাচারিণী, বেশ্যা হইলাম' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন শার্ঙ্গরব আর শকুন্তলার প্রতি কোমল ভাব দেখাইতে পারিলেন না, উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "নিজে দুষ্কার্য্য করিয়াছ, এখন তাহার ফল পাইলে। এই জন্যই লোকে বলে, গোপনে প্রেম করিতে গেলে বিশেষ দেখিয়া শুনিয়া করিতে হয়। যাহার মনের ভাব জানি না, তাহার সঙ্গে ভাব করা ত নয়, শত্রুতা ডাকিয়া আনা।" শুনিয়া রাজা বলিলেন, "তোমরা ত বেশ, তোমরা উহাকেই বিশ্বাস করিতেছ,আর আমার উপরই সব দোষ চাপাইতেছ।" তাহাতে আরও রাগিয়া, আরও চটিয়া শার্ঙ্গরব বলিলেন, "শুনিলেন, আপনারা শুনিলেন, কি জঘন্য উত্তর হইল, শুনিলেন; যে লোক শঠতা কাহাকে বলে জানে না, তাহার কথায় আমরা বিশ্বাস করিব না, আর যাহারা পরকে ঠকান 'বিদ্যা' বলিয়া অভ্যাস করে, তারই কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইব?"

রাজা যখন বলিলেন, "অহে সত্যবাদি! মানিয়া লইলাম, আমরা ঠকান বিদ্যাই শিখিয়াছি, কিন্তু বল দেখি, এই বালিকাটিকে ঠকাইয়া আমার কি লাভ হইবে?"

"লাভ নিপাত।"

"পৌরবে নিপাত যায়, এ কথাটা কেহই শ্রদ্ধা করিবে না।" ক্রমে যখন শকুন্তলাকে রাজার কাছে রাখিয়া আশ্রমে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল, তখন শকুন্তলা অসহায়া হইয়া তাঁহাদের পিছনে পিছনে যাইতে লাগিলেন। তখন গৌতমী শার্ঙ্গরবকে বলিলেন, "শকুন্তলা যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। রাজা যখন নিলেনই না, তখন বেচারা কিই বা করে।"

তখন শার্ঙ্গরব বেগে ফিরিয়া আসিল এবং বড়ই রাগ করিয়া বলিল, "অরে দুশ্চারিণি, তুই আবার আপনার ইচ্ছামত কাজ করিতেছিস্। রাজা যাহা বলিতেছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে তুই ত কুলটা, তোকে নিয়ে তোর বাবা কি করিবে? আর তোর মন যদি জানে, তুই খাঁটী, তবে পতিগৃহে তোর দাস্য করাই ঠিক।" এইবার কঠোরতার চরম হইল।

এই ত গেল শার্ঙ্গরবের কথা। তাঁহার আর যে সঙ্গীটি আছেন শারদ্বত, তিনি ত কথাই কন না। তিনি আপনাকে বড়ই পবিত্র ও শুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। রাজার বাড়ীতে আসিয়া মেলা লোকজন দেখিয়া শার্ঙ্গরব যখন রাজবাড়ীটাকে আগুন-লাগা ঘরের মত মনে করিতেছিলেন, শারদ্বত তখন বলিলেন, "নগরে আসিয়া তুমি ত এইরূপ হইয়া গিয়াছ, কিন্তু আমার আর এক রকম ধারণা। স্নান করিয়া উঠিলে তেলমাখা লোককে যেমন অপবিত্র মনে হয়; যাহারা শুচি, তাহারা অশুচিকে যেমন অপবিত্র বলিয়া মনে করে; যে জাগিয়াছে, সে ঘুমন্তকে যেমন মনে করে; যে স্বচ্ছন্দে বেড়াইতেছে, সে কয়েদীকে যেমন মনে করে; আমি সুখে আসক্ত এই নগরবাসী লোককে তেমনই দেখিতেছি।" তিনি সত্যই আপনাকে এ সকলের উপরে বলিয়া মনে করেন, আর অনাসক্তভাবে ইহাদের কার্য্যকলাপ দেখেন। দেখেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার চক্ষে যেন কিছুই নয়। ইহার পর তিনি দুইবার কথা কহিয়াছিলেন। যখন শার্ঙ্গরব রাজাকে চোর ডাকাত প্রভৃতি বলিয়া গালাগালি করিতেছিলেন, তখন শারদ্বত তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি থাম, শকুন্তলা, আমাদের যাহা বলিবার, বলিলাম। রাজা এইরকম বলিতেছেন, এখন তুমিই উত্তর দাও, উঁহার যাহাতে বিশ্বাস হয়, তাহা কর।" এই কথাগুলিতে অনেক কথার মীমাংসা হইয়া গেল। মিছা ঝগড়া করিয়া আমরাই বা কি করিব, শার্ঙ্গরবই বা কি বলিবে, এ সময় একজনমাত্র কথা কহিতে পারে, সে শকুন্তলা। তাহাকে তিনি বলিলেন, রাজার যাহাতে বিশ্বাস হয়, তুমি তাহা কর। এই কথার পর শার্ঙ্গরব অনেকক্ষণ আর কথা কহেন নাই। শকুন্তলা যাহা বলিবার, বলিল; যাহা মনে করিয়া দিবার, দিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাজা শকুন্তলাকে যাহা ইচ্ছা তাই বলিলেন, শার্ঙ্গরব আবার মুখ ধরিল; শকুন্তলাকে গালি দিল। রাজাকে নিপাত দিল। তখন শারদ্বত রাজাকে বলিলেন, "আমরা গুরুর

আজ্ঞা পালন করিতে আসিয়াছিলাম, পালন করিলাম; এখন আমরা ফিরিয়া যাই। ইনি তোমার পত্নী, তা তুমি ত্যাগই কর, আর ঘরেই লও। বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব, গৌতমি, চল।" শকুন্তলার বিবাহে শারদ্বতের সন্দেহই নাই। কারণ, গুরুর উপর তাঁহার অচলা ভক্তি; গুরু মিথ্যা কখনই বলিবেন না। শার্ঙ্গরবের সন্দেহ একটু ছিল, তাই তিনি শেষ বলিয়া ফেলিলেন, "যদি রাজা যাহা বলিলেন, তাহা সত্য হয়, তুমি কুলটা, পিতা তোমায় লইয়া কি করিবেন?" তাঁহার 'যদি' আছে। শারদ্বতের 'যদি' নাই। তিনি রাজাকে বলিলেন, "ইনিই তোমার পত্নী" ইত্যাদি। শারদ্বত কণ্বের দৃঢ়তার মূর্ত্তি, শার্ঙ্গরব তাঁহার কঠোরতার মূর্ত্তি।

মহাভারতে একা শকুন্তলাই সব করিয়াছিলেন; রাজার পরিচয় লইয়াছিলেন, নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন। গান্ধর্ব্ববিধানে পুরুত ডাকাইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। কারণ, বিবাহ বিধিমত না হইলে সন্তান ভাল হয় না। পিতার কাছে বিবাহের কথা আপনিই বলিয়াছিলেন; পিতার যাহাতে রাজার উপর রাগ না হয়, সে জন্য তাঁহার নিকট বর চাহিয়াছিলেন। নিজেই পুত্রের সঙ্গে রাজবাটী গিয়াছিলেন; রাজার সহিত সদর্পে কথা কহিয়াছিলেন। রাজা কটু কথা কহিলে তাহার উপযুক্ত কটু উত্তর দিয়াছিলেন। পুত্রের হাত ধরিয়া রাজসভা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। শেষ যখন দৈববাণী হইল, তখন রাজা আপনার দোষ স্বীকার করিলেন; বলিলেন, "লোকে বিশ্বাস করিবে কেন বলিয়া আমি জানিয়াও তোমার বিবাহ স্বীকার করিতে পারি নাই। এখন দেবতারা লোকের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন, আমি স্বীকার করিলাম। তুমি আমায় কটুকথা বলিয়াছ, তাহা আমি ক্ষমা করিলাম। আমার অপরাধও তুমি ক্ষমা কর।" তাহার পর মিলন হইল। পুত্রও যুবরাজ হইলেন।

অভিজ্ঞান শকুন্তলায় সেই একজনের জায়গায় শকুন্তলাকে লইয়া ছয় জন হইল কেন? ছয় জনের কম হইলে কি হইত না? দুজন তিন জনে হইত না? মহাভারতে বারবছরের ছেলে লইয়া শকুন্তলা রাজবাড়ী গেলেন। অভিজ্ঞান-শকুন্তলায় গর্ভাবস্থায়। মহাভারতে দৈববাণী হইল রাজা ত্যাগ করার পর, আর এখানে দৈববাণী হইল, কণ্বমুনির আসার দিন। মহাভারতে ছেলে হলে দেবতারা বর দিলেন, এই ছেলে শত অশ্বমেধ করিবে, সারা পৃথিবীর রাজা হইবে। এখানে মিলনের সময় মারীচ ঐ বর দিলেন। পুরাণ গল্পটি এত বদল করা হইল কেন?

ইহার কারণ এই যে, মহাভারতে শকুন্তলার গল্পটি উপাখ্যানগল্প মাত্র, সব গল্পই কিছু নাটকে সাজে না, খাপ খায় না। তাই গল্পটিকে নাটকের মত করিয়া সাজাইয়া লইতে হয়। তাহার উপর আবার মহাভারত-রচনার সময় সমাজে একরকম অবস্থা ছিল, কালিদাসের সময় আর একরকম হইয়া গিয়াছে। এখন স্ত্রীলোকের

অতটা বাচালতা সাজে না। মন্ত্রতন্ত্রের উপর আস্থাও বোধ হয় একটু কমিয়া গিয়াছে; গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহেও পুরুত ডাকিতে হয়, সে কথা বোধ হয় লোকে ততটা পছন্দ করে না। তার পর কাব্যের রীতিপদ্ধতিও অনেক বদলাইয়া গিয়াছে; এখন বাঁধনী গাঁথনীর উপর লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কোন্‌টার পর কোন্‌টা লিখিলে ভাল শোনায়, ভাল দেখায়, সে বিষয়ে লোকের বেশ নজর আছে, এখন সামাজিক অর্থাৎ সমজদার বলিয়া একদল লোকের জ্বালায় কবিরা আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। এখন তাহারাই প্রবল; কবিকে তাহাদের খাতির করিয়া চলিতে হয়। নেহাত বৈষ্ণব কবিদের মতও নয় যে বলিবে, "যে আমার কবিতায় দোষ দিবে, তাহার মাথায় সাত জুতো।" অথবা এখনকার কবিদের মত ত নয় যে বলিবে, "যে আমার কবিতায় দোষ দিবে, সে মূর্খ" বলিয়া গাল দিয়াই জিতিয়া যাইবেন। সামাজিকের ভয়ে তখন কবি অস্থির, তাই কালিদাস যদিও মহাভারত অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিয়াছেন, মহাভারতের সব ঘটনাও রাখিয়াছেন, তবুও সেগুলি নাটকের মত করিয়া লইয়াছেন, সময়ের মত করিয়া লইয়াছেন। সামাজিকদের মনঃপূত হইবার মত করিয়া লইয়াছেন।

মহাভারতে শকুন্তলা আপনিই রাজার পরিচয় লইয়াছেন ও আপনার পরিচয় দিয়াছেন। এটা কালিদাস রুচিবিরুদ্ধ মনে করিয়াছিলেন, তাই অনসূয়ার সৃষ্টি। অনসূয়া যেন শকুন্তলার ভাট বা চারণ। শকুন্তলা লইয়াই তিনি থাকেন। শকুন্তলা ধ্যান, শকুন্তলা জ্ঞান। ভোরে উঠিয়া শকুন্তলার ভাবনা। শকুন্তলার জন্য বকুলমালা গাঁথিয়া রাখা, শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতাদের পূজা করা ইত্যাদি। তিনি শুদ্ধ শকুন্তলা লইয়াই থাকেন। আবার দেখুন, মহাভারতে আজ্য, হবি, লাজ, সিকতা, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বিবাহের যত কাজ, সবই শকুন্তলা করিয়াছেন। এ সব কালিদাসের সময়ে শকুন্তলা যদি করেন, তবে তাঁহার নিন্দা করিবে; সুতরাং ও সকলের জন্য প্রিয়ংবদার সৃষ্টি হইয়াছে। কেন, অনসূয়াকে দিয়া চলিত নাকি? না, চলিত না। কোনরূপ চিন্তা আসিয়া পড়িলে অনসূয়া গুটাইয়া যান, মনের মধ্যে মন রাখিয়া কেবল ভাবেন, তাঁহার স্ফুর্ত্তি থাকে না। তাই স্ফুর্ত্তিওয়ালা একটি মেয়ে চাই। সেটি কালিদাসের প্রিয়ংবদা—বেশ চালাক চটপটে। মহাভারতে গান্ধর্ব্ব বিবাহের উদ্যোগ—আজ্য, হবি, লাজ, সিকতা, ব্রাহ্মণ। নাটকে তাহার উদ্যোগ—মদন লেখ, পদ্মপত্রে নখের আঁচড়ে লেখা, নির্ম্মাল্য যাবে রাজার আশীর্ব্বাদের জন্য, তার সঙ্গে সেই পদ্মপাতাখানি দেওয়া, দুকলসী জল ধারে বলিয়া শকুন্তলাকে যাইতে না দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই উদ্যোগপর্ব্বের জন্য প্রিয়ংবদা চাই। গৌতমীকেও চাই। নহিলে লতাগৃহ হইতে শকুন্তলাকে কে উঠাইয়া আনিবে? অনসূয়া পারে না, প্রিয়ংবদা পারে না, সুতরাং একটা বুড়ী চাই। দাদাকে ডুমুরতলা থেকে বিদায় করা চাই। শার্ঙ্গরব পারিল

না, আর কেহ পারিল না, গৌতমী ফিরাইলেন। রাজবাটীতে রাজা যখন শকুন্তলাকে চিনিতে চাহেন না, তখন শকুন্তলার ঘোমটা খুলিয়া কে মুখ দেখাইবে? শার্ঙ্গরব পারেন না, শারদ্বত পারেন না, তাই গৌতমীর সৃষ্টি। এ তিনটির কোনটিই উপেক্ষিতা নহে; সকলেরই একটা না একটা কাজ আছে। সে কাজ শেষ হইল, অমনি সে সরিয়া গেল। ইহাকে যদি উপেক্ষিতা বলা হয়, তাহা হইলে জগতের সকলেই উপেক্ষিতা নয় কি?

মহাভারতে শকুন্তলা নিজেই রাজার সঙ্গে ঝগড়া করিলেন, তর্ক করিলেন, রাগ করিলেন। কিন্তু কালিদাস শকুন্তলার মুখে ও সকল দিতে রাজী নন, তাই সঙ্গে দুটি শিষ্য পাঠাইলেন। একটি ঝগড়া করিবে, আর একটি মিটাইয়া দিবে। এইরূপে একটির জায়গায় কালিদাসকে পাঁচটি ছয়টি করিতে হইয়াছে। কোনটি নহিলেই নাটক চলিত না। আর একটির জায়গায় ছয়টি করিয়া কালিদাস শকুন্তলাখানিকে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক করিয়া তুলিয়াছেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সে আসিল না

তাঁরে বরণ করিয়া লইব ব'লে
জ্বেলেছিনু ক্ষীণ প্রদীপ-শিখা ;
জ্বলিয়া জ্বলিয়া প্রদীপ নিভিল
আসিল না মোর জীবন-সখা।

তাঁরে পরাইব ব'লে নিভৃতে বসিয়া
গেঁথেছিনু, এই ফুলহার ;
ফুলগুলি সব ঝরিয়া পড়িল
আসিল না দেবতা আমার।

তাঁহার চরণে দিতে পুষ্পাঞ্জলি
কত ফুল রেখেছিনু তুলে ;
ফুলগুলি সব শুকায়ে গেল,
আরাধ্য-দেবতা আসিল না ভুলে।

শ্রীসুধাময়ী সেন।

কমলের দুঃখ

(হেনা— নগেন)

আবার কেন আমায় লোক পাঠিয়ে জ্বালাতন,—নিজে এসে রাতে এত কাণ্ড করা। আমি ত বলেছি, তুমি আমার এখানে আর এস না। আমার মনের অবস্থা ভাল নয়, আমার উপরেও তোমার সে মন নেই। মিথ্যা কোন দিন কি নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী করার চেয়ে ও সব মিটিয়ে নেওয়াই ভাল। তোমরা সুখের পায়রা। যেখানে সুখ পাবে, সেইখানে যাও। পায়রামটর গলায় পুরে বক্‌বকম্ করা তোমাদের ভাল লাগে। তোমাদের তাই স্বভাব—আমরা ও সব ভাল বুঝিনি। আমার আর কি; সুখের যে পথ ধ'রে চলেছ—সেই পথে চ'লে যাও,—তোমার রাসমঞ্চ যেখানে বাঁধবার ইচ্ছে, সেইখানে বাঁধ। হীরের কুঞ্জেই যাও, অথবা পীরের কাবায় যাও, আমার কাছে দুই সমান। আমার আর ও সব ভাল লাগ্‌ছে না—আর এখানে এস না,—এ পথ আমার আর ভাল লাগ্‌ছে না। আমিও খুব সুখ পেয়েছি, সুখ আর আমার ধর্‌ছে না। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত সুখের জ্বালায় জ্বলে মর্‌ছি—তা না হ'লে তোমারও চিঠির উত্তর দিতাম—তোমাদের সম্পর্ক আমি আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিনি। তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না যে, তোমাদের মত সখের প্রাণে—সুখের আবেশে আমি আর ডুব্‌তে পাচ্ছি না, আমার সে ক্রটী মার্জ্জনা কর। আর এই দেহের বিনিময়ে যে অর্থ, যে মণিমুক্ত আমায় দিয়েছ, আমি বাজরা ক'রে সাজিয়েছি—ফেরত নিয়ে যাও,দেহপণে যে সুখ কিনেছি—তাও নিয়ে যাও! আর আমার ভাল লাগে না। তুমি কি বুঝ্‌বে, কেন হেনা বেশ্যা হয়ে—আজ তার চিরদিনের আদরের—আশার—আকাঙ্ক্ষার মণিহার ফিরিয়ে দিচ্চে? সুখমত্ত, প্রাণহীন, পাষাণ-বিগ্রহ তুমি কি বুঝ্‌বে, কেন হেনা পাষাণ হয়ে—সেই পাথরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্যে আগুন খুঁজে বেড়াচ্চে? তুমি কি বুঝ্‌বে, যে চিরদিন গরল গলায় ঢেলে এসেছে, সে কেন, কেন এ মৃত্যুর হাত থেকে অমর হবার জন্যে ছুটেছে? তুমি কি বুঝ্‌বে, কেন নারী বেশ্যা হয়, আবার সেই মহাপঙ্কলেপ মুছে ফেল্‌বার জন্যে—প্রাণান্ত করে? কেন ভোগের সব উঁচু শিখরে দাঁড়িয়ে,—ভোগ ত্যাগ কর্‌তে চায়—সে তুমি বোঝ নি, সে তুমি বুঝ্‌বে না—শুধু মনে রেখ, সবই বদল হয়। আমার আর ভাল লাগে না—আর আমার ভাল লাগে না।

ইতি হেনা।

(নগেন—হেনা)

এতদিন পরে তুমি আমায় বল্‌লে, ভাল লাগে না,—এতদিন পরে কেন বল্‌লে। হেনা, তুমি কি মানুষী না রাক্ষুসী ! তোমার এ কথা বল্‌তে একটু মায়া হ'ল না ? বেশ, যেতে বারণ কর, আর যাব না—তোমার ওপর আমার কিসের জোর ! কিন্তু জেনো, তুমি যেমন আমায় মনঃকষ্ট দিলে, তেমনি হাজার গুণ বেশী মনঃকষ্ট তোমায় পেতে হবে। আমি তোমার জন্য সব কল্লাম– তোমার জন্য সব নষ্ট হ'ল—তুমি আজ বল্‌লে এস না,—এই কি তোমার ধর্ম্মে হ'ল, না এই রকমই তোমাদের ধর্ম্ম ! আগে পরে সব সমান, আগেও তারা এমনি ফিরছে, আবার আমিও ফিরলাম। যে প্রাণপাত ক'রে তোমার জন্যে ম'ল, তার দিকে ফিরে তাকালে যে অধর্ম্ম হ'বে ! সে কাজ কি কর্‌তে আছে ! যারা এমন ক'রে ক'রে মরে, তাদের দিকে ফিরে শুধু একটু হেসে চাইলে—বস্, সব ধর্ম্ম ওইখানেই শেষ হয়ে গেল ! সব নিয়ে শেষে বল্‌লে ফুরিয়ে গেছে যাঃ—মানুষের মনও কি তোমাদের নেই ? চোখের চামড়া বোধ হয় তোমাদের পাথরের মত কোন জিনিস,-- মানুষ রাগ ক'রে কত কি বলে, তাই তোমায় অমন চিঠি লিখেছিলুম। তার পর তোমার দোরে গিয়ে মাথা খুঁড়লাম, দেখা কর্‌লে না, দরজা খুলে দিলে না—কথার একটা উত্তর দিলে না, এর অবশ্য কারণ ছিল,—সে কারণও আমার বেশ ভাল লাগে, তোমার ভাল লাগে—আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে !

হায় হেনা ! আমার মাণিক ! সংসারে অদ্ভুত স্বাস্থ্য, অতুল রূপ, অগাধ অর্থ, আত্মীয়ের অযাচিত প্রাণঢালা স্নেহ, তোমার চরণে ঢেলে দিয়েছি। বিদ্যার গৌরব, স্বাস্থ্যের বল, পরিণীত অপ্সরীর মত লক্ষ্মী স্ত্রীর প্রেমের আশা সমস্ত তোমার ওই মুখ চেয়ে নষ্ট করেছি ; পাষাণের মত নিজের ভাই কমলের সঙ্গে ব্যবহার করেছি—যে ভাই আমার—শির কেটে তার শিরার রক্ত দিয়ে রোগ হ'তে বাঁচিয়েছিল,— যে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে, আমাকে বাঁচাবার জন্যে সেই মৃত্যুকে ফিরিয়েছিল। তোমার মুখ চেয়ে যারা সত্যি বন্ধু—যারা আপনার ক'রে ছেলেবেলা থেকে বুকে ক'রে খেলা ক'রে এসেছে—তাদের ত্যাগ ক'রে—হারু মাষ্টারের মত লোককে প্রাণের ইয়ার করেছি। যখন তোমার যা দরকার হয়েছে,—তাই তোমার মুখের কথা পাবার অপেক্ষা না ক'রে যুগিয়েছি, তার ফল তুমি আমায় ত্যাগ কর্‌লে—কর্‌তে পার্‌লে কি ক'রে ? বল্‌বে করেছ, তোমার নিজের সুখের জন্য—তুমি বিকিয়েছ দরে, আমিও কিনেছি দরে ! বাজার বাজার—হাটে হাটে, আদান প্রদান হাতে হাতে নগদ—ধর্ম্ম কর্‌তে বসিনি। হায় ! কি তুমি, যে

তোমার জন্যে আমার সব গেল! উঃ, সুনাম গেল, স্বাস্থ্য গেল, প্রাণের যে শান্তি তা গেল! কিসের জন্য, যা যায়, তা আর ফিরে না—আর কবে তা ফির্‌বে, দিন চ'লে গেছে, আর ফির্‌বে না—আর ফির্‌তে পারে না। রোজই ভোর হবে, আমি কিন্তু সে আলোর অবসাদ ছাড়া আনন্দ পাব না। উঃ, মাণিক, এই সংসার! বুকের রক্ত দিয়ে তাকে পুষ্ট কর, তবু একবার সে ফিরে চাবে না। আজ কেবল মনে পড়্‌ছে, সেই দোলের দিন। কেবল মনে পড়্‌ছে, সেই বসন্তের পাতায় পাতায় লাল লেখার খেলা, সেই ফাল্গুনের দিনে ফুলে ফুলে আমোদ করা। বাতাসের মাঝে তোমার গান, আর হোলির কুঙ্কুমবৃষ্টি, সে আনন্দ আমার জীবনে কখন ভুল হবে না। তাই কেবল মনে পড়্‌ছে। মনে পড়্‌ছে, গাছপালা, পাখী, ফুল, লতা-পাতা সব লালে লাল, আর বকুলের গন্ধ যেন ঢেউ তুলে চলেছে, তার মাঝে তোমার সেই গান—চারিদিকে আঁবের বোলের গন্ধ আর মৌমাছিদের ভন্‌ভনানি, তারি সঙ্গে মিশিয়ে তোমার গান—

"ফাগুনের হাওয়া লাগে গায়
সখি লো প্রাণ যে যায়, কেমনে দিব তায়।
দিতে পারি মতিহার
নিতে পারি সোহাগ তার
যা সে চায় সই দিতে সে পারি তায়
এ যৌবন রাখা তবু দায়—
সখি লো প্রাণ যে যায়
কেমনে রাখি তায়।

এ গানের প্রতি ছত্র আমার কানে সেই ভরপুর সুরের মাদকতায় সিঞ্চিত। দুঃখের দিনে সুখের স্মৃতি দুঃখকে বাড়িয়ে দেয় বটে, তবু সে বড় মিষ্ট; সেই তুমি আমার এই বুকের ওপর মাথা রেখে কেঁদেছিলে। তুমি কি সেই? হায়! মুখের পানে চেয়ে চেয়ে রাত কেটে যেত, তখন কি ছিল। ভালবাসি না, খুব ভালবাসি? এই সব মনে পড়্‌ছে। সেই তুমি সঞ্চারিণী লতার মত হাত দুখানি দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিতে—আজ যেন স্বপ্নের মত সব ভেঙে গেল; যাক্‌, সুখ জগতের জন্য নয়, সবই ক্ষণিক, সবই দুদিন পরে চ'লে যায়। যেমন নেশা করা, নেশা কাটে আর যত প্রাণের যাতনা সব আবার জেগে ওঠে। আমার মনে হ'চ্চে না যে, এ চিঠি তোমার সত্যি! যাক্‌, সংসার যেমন চ'লে যায়, তেমনি চ'লে যাবে, কেবল তোমার আমার বদল হয়ে গেল। যখন বারণ করেছ, যখন বাড়ী থেকে ফিরিয়ে দিয়েছ, তখন আবার কেন যাব —তা যাব না। বুঝেছি, জগতে কাম কামনার সার্থকতা হয় না। এই আমার অতুল

ঐশ্বর্য্য, অটুট স্বাস্থ্য, মান-সম্ভ্রম, তোমারই জন্যে নষ্ট হ'ল, তুমি তাই যেমন ছেঁড়া কাপড় লোকে ত্যাগ করে, তেমনি ক'রে ফেলে দিলে। ভাল, এর ফল কিন্তু তোমায় এক দিন পেতে হবে। আমিও তোমায় সহজে হাত পিছলে চ'লে যেতে দেব না, যতক্ষণ আমার এক কপর্দ্দক থাক্‌বে, ততক্ষণ আমি বাধা দিতে কসুর কর্‌ব না জেনো। লিখেছ, ফিরে নিয়ে যাও; থু থু, ফেলে কেউ সে থু থু মুখে ক'রে তোলে না। যখন তোমার সঙ্গে কেনা-বেচার সম্পর্ক, যখন বুঝেছি, এ বিকিকিনির হাটে আমায় ঠকিয়েছ, তখন আমিও তোমায় পরিশোধ কর্‌ব। অমন ঢের টাকা খরচ করেছি, অমন টাকার জন্যে কখন মরিনি—কখন মর্‌বও না।

আমি তোমায় বেশ্যার মত মনে করিনি। প্রাণের মত সোহাগের জিনিস ব'লে প্রাণে ধর্‌তুম, তোমার প্রাণের কি জ্বালা, আমায় কখন বলও নি, আমিও তার কোন সন্ধান করিনি। যে মণিহার লাভ কর্‌বার জন্যে এত বক্কম, আজ খুব মুখে সে হার ত্যাগের কথা শোনাতে এসেছে; তাই ওই হারের জন্য অভিমানে তিনদিন কথা কওনি। ঢের দেখ্‌লাম, সবাই অমন দিতে পারে, সবাই অমন নিতে পারে, আবার সবাই অমন ফিরিয়ে দিতে পারে—হ্যাঁ, ঢের দেখেছি! মাষ্টার তাই ঠিক বলে,—

'অমন রস্‌কে সবাই বন্ধু অমনতর সবাই,
ফস্‌কে গেলে সবাই অমন করে সে জবাই।'

দেখ্‌ব হেনা, কার কত দৌড়—আমিও দেখাব—দেখাব—দেখাব!

ইতি "ন"।

(হেনা—নগেন)

না, তোমার ও মায়া-কান্না দেখ্‌তে হবে না। ও সব কান্না-রান্না আমি ঢের দেখেছি, ও অমন চোখে আতর দিয়ে জল দেখান, অনেকদিনই শিখেছি, ও আমি বেশ জানি, তুমি আর নতুন কি দেখাবে। আমার আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? আমার কোন ধর্ম্ম নেই;—রূপ বেচ্‌তে যে বসেছে, সে কি ধর্ম্ম কর্‌তে বসেছে না কি?—আমার জন্যে নষ্ট কর্‌লে, কেন কর্‌লে? তুমি একা নও গো একা নও,—অমন ঢের সুন্দর আমার জন্যে অন্দর ছেড়ে, এই আঁচলের ছায়ায় ঘুর ঘুর ক'রে বেড়িয়েছে। আমার জন্যে অমন অনেকে ভিখিরী হয়েছে, এ সবাই জানে। আমি ত কাকেও ডাক্‌তে যাইনি। সবাই ত আপনি পতঙ্গের মত ঝাঁপ দেয়, পুড়ে মরে। আমি কি তোমায় সেধে ডাক্‌তে গিয়েছিলাম? উপুড় হয়ে পড়ে পা জড়িয়ে ধরেছিলুম? চুম্বুক লোহাকে আকর্ষণ করে, সেই তার ধর্ম্ম, তা লোহা আসে কেন ছুটে? আমার রূপের ঢেউ

বয়ে যাচ্ছে, উঠ্‌ছে, তোমরা এসে অমন ঝাঁপ দিয়ে পড় কেন? আমি ত বলি নি।

তোমার আর আমার এখানে আসা হবে না। আমিও ঢের টাকা দেখেছি, মনে কর্‌লে ও রকম টাকা শুধু এই চোখের চাওনিতে টেনে আন্‌তে পারি—তোমার টাকা ফিরিয়ে দেবার শক্তি আছে কি না দেখো। আর আমায় কোন চিঠিপত্র লিখো না। তোমার কাপড়গুলো সব পাঠিয়ে দিলেম। আমার এখানে কেউ আসে, এ আমি চাইনে। আমার আর কাউকে ভাল লাগ্‌ছে না। কারও আস্‌বার দরকার নেই, সবাই স্বার্থপর! সুখের পায়রাদের জন্যে যে ব্যোম, আর খোপ তৈয়েরি করেছিলুম—সে ভেঙে ফেলেছি। সব পায়রা এখন ডালগোলা চরে বেড়িয়ে বেড়াক্। আমার এখানে আর কারও জায়গা নেই—কেউ নয়—যাও! তোমাদের সে ভালবাসা ও মোছলমানের মুরুগী পোষা—কেবল দেহের রস রক্ত হাড় মাংসের জন্যে, ও আমি বেশ বুঝেছি। ও সব কিছু নয়। তোমাদের স্ফুর্ত্তি নিয়ে কাজ, যেখানে স্ফুর্ত্তি পাবে, সেখানে যাও। ঢের আছে সন্ধানে ফের, অনেক পাবে। মাষ্টার আছে, অনেক শেখা শেখাবে। টাকা দিলে, গাড়ী দিলে, মুক্ত হীরে জহরাৎ দিলে, যদি ভালবাসা হ'ত, তা হ'লে আর ভাবনা হ'ত না গো! অত সোজা জিনিস ভালবাসা নয়, তা হ'লে আর অমন হ'ত না। এত সহজে ভালবাসা হ'লে এ আস্‌নাইয়ের বাজারের রোসনাই অনেক দিন নিবে যেত, তা হ'লে আর এমন ক'রে রূপের বাজারে রূপ বেচবার ছড়াছড়ি পড়ে যেত না। তা হ'লে আর আরব্য-উপন্যাসের সিরাজ সহরের হাটের মত, রক্তের মত লাল সিরাজীভরা পানপাত্র হাতে ক'রে গলায় ফোটা ফুলের মালা পরে, রূপ প্রেম একহাটে বেচত না। এত সহজে প্রেম-মিল্‌লে অনেক দিন হাট উঠে যেত। চোখে সুরমা—গালে আল্‌তা,—মুখে চূণের দেয়ালে কাপড়ের নুটী ঘসে মুখের আঁচড়, চোখের কালি ঢাকা, আর গায়ে পচা আতরের গন্ধ মেখে দাঁড়াত না। তা হ'লে অমন হিমের দিনে, শীতের রাতে ছেঁচতলায় দাঁড়িয়ে দু চার পয়সার জন্যে দেহ বেচ্‌তে যেত না, তা হ'লে আর বাজার করা চল্‌ত না।

বল্‌তে পার, 'কেন, আমি কি তোমায় ভালবাসিনি'—হ্যাঁ, বেসেছিলে, তাই এ রূপের ঢেউ সামলাতে পার্‌লে না, টাল খেয়ে পড়ে ঘূর্ণি খেলে, সত্যই বেসেছিলে, সে আমাকে নয়—নাগর, আমাকে নয়, আমার ভিতরে যে আছে, তাকে নয়, আমার এই দেহ, এই রূপ, আমার ঠোঁটের নিঙড়োন সোহাগ। আমার এই বুকের ফুলের আবেশ, আমার এই এই, আর কত বল্‌ব, আমায় ভালবেসেছিলে! হাঃ, হাঃ! সবাই ভালবাসে গো—সবাই অমন ভালবাসে। কিন্তু কখন এমন হয়েছে যে—যাকে ভালবাসি, তাকে দেখে বুক পেতে দিতে পার—পাছে তার পায় একটা কাঁটা ফোটে—তার

জন্যে বুক পেতে দিতে পার, নিজের প্রাণ দিতে পার। তোমার ভাই তোমায় রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছিল, সে ভালবাস্‌তে জানে, তাই জগৎ তাকে ভালবাসে ; তুমি যদি জান্‌তে, তা হ'লে তার পায়ের তলে লুটিয়ে থাক্‌তে। তুমি তোমার অমন ভাইকে ভালবাসতে পার নি। তুমি তোমার অমন সুন্দরী স্ত্রীকে কখন ভালবাসতে পার নি—তুমি আমায় ভালবেসেছ শুন্‌লে হাসি আসে।

ঘরকে কর্‌লে পর বন্ধু, পর্‌কে কর্‌লে ঘর

ঘর্‌কে যে পর করে, তার পরও ঘর হয় না। নিজেকে পর কর্‌লে কি কখন ঘর হয়? তা হয় না। তা হয় না—নাগর,—তা হয় না! অনেক গুণের সাগর না হ'লে নাগর হয়ে উঠা যায় না—বুঝ্‌লে? এ দুনিয়ার রাজত্বে প্রাণের দাম প্রাণ; প্রাণের দাম টাকা নয়। টাকার কথা—মুক্তোর মালার কাহিনী আর আমায় শোনাবার দরকার নেই। তবে তোমার অনেক খেয়েছি, নেমকহারামী কর্‌ব না—আর বেশ্যার প্রেমের জন্যে ঘুরে বেড়িয়ো না, আর সুখ খুঁজে বেড়িয়ো না। সংসারী হও, ভদ্র হও, ইতর-সংসর্গ ত্যাগ কর। আমাদের ভগবান্ মেরেছে, কাউকে যে ভালবাস্‌ব, কারু যে আপনার হব, তাতে বিধাতার অভিশাপ আছে! সে দিন আর এ জগতে হবে না! তোমায় সত্য বল্‌ছি, আমাদের এ সব অনেকই ভাণ; সুখের জন্যে—টাকার জন্যে এ সব করি, হয় ত আবারও তাই কর্‌ব,—তবু জেনো, এ ভাণ কর্‌বার যে প্রাণ, সে সত্যিই খোঁজে, সে ভাণ চায় না। তাই তোমাদের ও স্ফূর্ত্তির ধ্বজা তোলা ছুঁচোর কের্ত্তন আর আমার ভাল লাগে না; তাই, বলেছি এস না। সুখ ত আমার কাছে অনেক নিয়েছ, কিন্তু কখন দুঃখ নিয়েছ কি? জান, কি অন্তর্জ্বালায় জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে বেশ্যা পরকে তার দেহ বিক্রয় করে? জান, কি দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে নিজের সুখের প্রবৃত্তিকে তোমাদের কাছে সে বিকায়? জান, কি ভীষণ যাতনার ব্যথা চেপে তোমাদের কাছে হাস্‌তে হয়। যদি সে এক ফোঁটাও এ দুঃখ বুঝ্‌তে, তবে বুঝতাম, তোমার প্রাণ আছে—আমার নেই! প্রাণ নেই বলেই মৃতকে জীবনের ভাবে নিয়েছিলে। তোমরা যদি সুখটুকু নেবার জন্যে এত সাজ-সজ্জা কর্‌তে পার, এত টাকা বাজিয়ে জাঁক দেখাতে পার, আমরা তার বদলে সাজ-সজ্জা দেখিয়ে তেমনি সুখের সন্ধান কর্‌ব না কেন? কিন্তু গোড়ায় ভুল যে,—নেওয়ায় সুখ নেই, দেওয়ায় সুখ। তুমি দিতে আসনি, নিতে এসেছিলে, তাই আজ তোমায় আমার ভাল লাগে না। তুমিও দাও নি, আমিও দিই নি। সব মিটে গেছে! আবার কেন? তুমি নিজে বুঝে দেখ, আমার জন্যে তোমার নষ্ট হয় নি—তোমার নিজের জন্যে তোমার সব গেছে। যাক্ অত কথায় আমারই বা কি কাজ! তবে বল্‌লুম কেন, তুমি অনেক শুনিয়েছ ব'লে। তোমাতে

আমাতে এই পর্য্যন্ত। আর নয়। তুমি আমার মুখ চেয়ে কোন্ কাজটা করেছ—একটিও না। যা আমায় করেছ, তাও তোমার মুখ চেয়ে। তোমার জুড়ির বাহার তোমার নিজের জন্যে; তোমার পাঁচটা ইয়ার গাধা মোসাহেব, সে তোমার স্ফূর্ত্তির রস যোগাবে ব'লে; আমায় রেখেছিলে তোমার সুখের ঢারায় রস যোগাব ব'লে। আমার মুখ চেয়ে তুমি কি করেছ,—কিছুই নয়। তোমার বুকের উপর মাথা রেখে কেঁদে-ছিলুম, কেন কেঁদেছিলুম শুনবে?—মনে হয়েছিল, এ দেহকে কেমন ক'রে পরের সুখের জন্যে দুখানা খোলামকুচি নিয়ে বিক্রী করছি। মনে হয়েছিল, কি সুখ নষ্ট করে পেটের জন্যে তোমার সুখ যোগাচ্ছি। মনে হয়েছিল, ভগবান্ এ প্রাণহীন দেহের মধ্যে কেন তবে প্রাণ দিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল, দু'মুঠো ভাত আর পরণের একখানা কাপড় হলে যার চলে যায়, সে কেন এতর জন্যে এমন সুখ নষ্ট করে। তাই অমন কেঁদে-ছিলুম, নইলে তোমায় পেয়ে সেই ভালবাসার সুখে ডুবে, ভাবের ঘোরে কাঁদিনি। তোমার জন্যে কাঁদিনি, কোন মানুষের জন্যে কাঁদিনি, নিজের জন্যে কেঁদেছিলুম, অত সহজে—ভাবের নেশায়—এ পাথরকুচির প্রাণ ফেটে জল বেরোয় না।

কেউ কাকে ঠকাতে পারে না—নিজে নিজেই ঠকে; আমিও অনেক ঠকেছি। দুখানা চকচকের বদলে অনেক ঠক্‌তে হয়েছে। ঠকে থাক, শোধ নিয়ো যত পারো। জান, আজ এতদিনের যা আশার উল্লাসের ছিল, গরবের মনে হ'ত, সে মণিহার পর্‌তে আজ বিষের জ্বালা উপভোগ হচ্ছে! মনে হচ্চে, এ সব আমার পাপের চিহ্ন, এ সব আমার পাঁক-মাখা কাজের ফল—এখন যেটা ছুঁচছি, সেটাতেই যেন ছুঁচ বিঁধছে! যেমন এক জায়গায় কতকগুলো রং জড় কর্‌লে চোখে কেমন জ্বালা ধরে, তেমনি তোমার দেওয়া ও অন্যের দেওয়া এই সব রংকরা সুখের শয্যা দেখ্‌ছি, আর গায়ে আগুন লাগছে।—আর আমার এ পাপের সহায়, আর আমার এ নূতন রঙ-করা ঘর ভাল লাগ্‌ছে না; সব ফিরিয়ে দিচ্ছি—তোমার টাকা ও মণিহার ফিরিয়ে দিলাম,—দেহপণে প্রাণের মাঝে যে পাপ কিনেছি, দেখি কিসে তাকে ধোয়া যায়! এতদিন আমার সুখের মুখের দিকে চেয়েছিলাম, এখন অন্যের দিকে চেয়ে দেখি, তায় এ পাপ ধোয়া যায় কি না? কিসে হয়, তাই দেখ্‌ব। জিজ্ঞাসা করেছিলে, কেন সুধীরবাবুর বাড়ী গিয়ে-ছিলাম—কিন্তু তার ঠিক উত্তর যদি দিই, তবে তুমি তা শুনে কি চুপ ক'রে থাক্‌তে পার্‌বে—তোমার কি তোমার ভায়ের মত অত বড় বুকের জোর আছে যে, সইতে পার্‌বে; পার্‌বে না—তাই বলি নি—কিন্তু আজ সে সত্য বল্‌তে—আর আমার নিজের প্রাণের মধ্যে যে লুকোন সত্য আছে—তা বল্‌তেও সঙ্কুচিত হব না, কেন না, ভালের পোষাকটা আমি আমার গা থেকে খুলে ফেল্‌তে চাই। গিছলাম ঝাঁটার শোধ তুল্‌তে—দেখে এলাম,

পুজো করে এলাম।—কেন করলাম জান? যার ধ্যানে বেশ্যার বেশ্যাত্ব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যার ধ্যানে প্রাণে নতুন আলো আসছে, তারি মূর্ত্তির সামনে—তারি প্রতিকৃতির সামনে, দেখলাম, তোমার স্ত্রী হাঁটু গেড়ে পুজো করছে—এক রাত্রিতে আমি প্রেম ও প্রতিশোধ বুকের মধ্যে পুরেছিলাম;—এক নিমিষে দেখলাম,—প্রেম প্রতি-শোধের জন্যে নয়—নিলে প্রেম হয় না—দিতে হয়। সর্ব্বস্ব তাকে দিতে হয়—তাই আজ সব ফেলে তাকে পাবার জন্যে ছুটেছি। তুমি পাষাণ প্রাচীর! তুমি কেবল রোদের তাপে তপ্ত হতে পার,—যে তোমার কাছে যাবে, তাকে তাপে জ্বালিয়ে দিতে পার;—কিন্তু তুমি এর কি বুঝবে। তুমি শোধ নিতে চাও, শোধ নিয়ো—তাতে আর ভয় করি নি, আর সুখের পাখী হয়ে খাঁচার ভেতরে পড়া বুলি বলবার জন্যে—ননী-ছানা খেতে চাই নে। অনেক দেখেছি, অনেক ভেবেছি, অনেক জ্বালা এ জীবনে ভোগ করেছি;—সুখের জ্বালাই সব চেয়ে জ্বালা—সুখ সওয়া যায় না, দুঃখ সওয়া যায়। আজ যদি তাকে রক্ষা করবার জন্যে এ কলুষিত দেহের সার রক্ত প্রাণ দিতে হয়—অব-হেলে তার মুখ চাইতে চাইতে দিতে পারি। আমায় আর কি দেখাবে নাগর! আমি আগোড় ভেঙে বাইরে এসে পড়েছি, আর দেখাদেখির ভয় রাখি নে। আর সে প্রাণের দরদ নেই গো দরদিয়া! হেনা গাছ থেকে ছিঁড়লেই নেতিয়ে পড়ে—গন্ধ যায়, আমি নিজেকে ছিঁড়ে ফেলেছি, আর কিসের ভয়, আর কিসের ভাবনা? সকল রকমের দুঃখকে আমি বরণ করেছি। হেনা মরেছে, এখন সে মাটীর।

হেনা।

(মায়া—শৈল)

বড় দি!

আজ কুন্নী এসেছিল, বললে, "বাবু কাঁদচে—তুমি না গেলে কি হয় বৌদি! এ কি গা, সোয়ামী ইষ্টিগুরু, তাঁর মনে কষ্ট দেওয়া! আমরা বৌদি ছোট নোক—অত শত বুঝি নি—এ যে অকল্যাণ হয়। চল, তুমি হলে ঘরের লক্ষ্মী!"—বড় দি! সত্যি তিনি ভাল হয়েছেন, ভাল হয়েছেন ফিরেছেন। তাই হোক্। কিন্তু আমি কি করব—আমি কি করব! আমার তাতে কি আসে যায়, আমি আর যাব না; জান ত সকল কথাই। এ মন নিয়ে আবার কি কোরে সেখানে যাব,—কি ক'রে দ্বিচারিণী হব। তিনি ভাল হয়েছেন ভাল,—আমার তাঁর সঙ্গে কিসের সম্পর্ক, একটা ফুল ফেলার—সে আমি মানি নি। ভাল হয়ে থাকেন, তাঁরই ভাল, আমার আর কি? আমায় ও সকল শোনাবারও ত কোন প্রয়োজন নেই। কল্যাণ অকল্যাণ ভাল মন্দ আর কিছুই নেই।

ইন্দু দিদির শরীর একেবারে ভেঙে গেছে, আমাদের দুই বোনের করুণকাহিনী কত আর বল্‌ব। দিন যায়, রাত হয়, ভোর হয়, যা হয় ক'রে কেটে যায়, সে ত আর কারো হাত ধরা নয়। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছ মাস হতে চল্‌ল—সেই আবার আমরা উঠ্‌ছি, ঘরের কাজকর্ম্ম করছি, খাই দাই সবই করি। শোক এমনিই দাঁড়িয়ে যায়। তবে সে মনে আর এ মনে কত তফাৎ। তখন ভাবতুম এক, এখন হ'ল এক। আজ কালো, কাল লাল—আবার পরে পরে কত রঙ।

তুমি ত আর এলেই না, ভাল; সবাই এখন আমাদের ফেলে দিয়েছে। যারা যারা দেখ্‌ত, কেউ তারা আর আস্‌তে চায় না। সুধীর আজ কয়দিন আসেন নি। কি যে তিনি হয়ে গেছেন,—তাঁর দিকে আর তাকান যায় না। মুখ যেন কালিতে ঢেলে দিয়েছে। তার উপরে শুনিছি নাকি মদ ধ'রেছে। কোথা থেকে কি হ'য়ে যায়। কি ছিল, আমাদের কি হ'ল।

তুমি কি সত্যিই আর আমাদের এখানে আস্‌বে না? গহনার বাক্সের চাবি আলমারিতে দেখো—সে গয়নায় আমার প্রয়োজন নেই, যার দেওয়া গয়না, তাকেই ফিরিয়ে দিও—আমার প্রণাম নিও।

ইতি মায়া।

(নগেন—মায়া)

প্রিয়তমে,

কলঙ্কের বোঝা মাথায় ক'রে তোমার কাছে আবার আমি ফিরে এসেছি—তুমি কি এ হতভাগ্যকে ফিরে দেখ্‌বে? আজ আমার সকল অপরাধ, সকল দুর্ব্বলতার বোঝা—সমস্ত হৃদয়ের ক্ষত জ্বালা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি, তুমি কি পূর্ব্ব-সব ভুলে আমায় হাত ধ'রে তুলে নেবে? লক্ষ্যহীন, প্রাণহীন আপাতঃমধুর সুখের আবেশকে চরম লক্ষ্য ক'রে, যেখানে ছুটেছিলাম, সে ভুল আজ আমার ভেঙেছে,—আমি আজ তা' বেশ বুঝেছি। তুমি আমার সে সব কলঙ্কের পঙ্কলেপ মুছে, তুলে নেবে কি? তুমি ত আগে অনেক বুঝিয়েছ, আজ এই ঘোর নিদারুণ অবস্থায় এসো সান্ত্বনা দিবে কি? এসো—ফিরে এস—জীবনের এ মুমূর্ষু মুহূর্ত্তে একবার এসো প্রিয়া—আমি আমার ভুল বুঝেছি, তাই আমায় ফেলে দিয়ে চ'লে গেছ। আজ এই

সংসারের কাঁটার পথে তোমার হাত ধর্‌তে চাই—প্রিয়া আমার, আমার সমস্ত সন্তাপ নিবারণ ক'রে এস প্রিয়া।

ইতি—'ন'

(মায়া—নগেন)

সান্ত্বনা—হা হা—কিসের—যে নরকের আগুন জ্বেলেছে, সে তাতেই পুড়ে মর্‌বে এই তার ঠিক বিচার—বলেছিলে না যে, আমার হৃৎপিণ্ডের শোণিতে এর শান্তি হবে—তবে আবার কেন? আমি ত তোমার নই—তবে কেন এ ডাক পাড়াপাড়ি। বহুদিন—বহুদিন পূর্ব্বে যে অকস্মাৎ অন্ধকার গহ্বরে পড়ে গিয়েছিলেম, তা হ'তে অনেক যুদ্ধের পর নিজেকে তুলেছি—আর ফিরে কে সাধ ক'রে অন্ধকারে নিজেকে নিয়ে যাবে? কে তোমার প্রিয়া—কে তোমার প্রিয়া? উন্মাদ পথিক! পথে চ'লে যেতে এতই ভুল—একবার এ—একবার সে—দেখ কোথায়—আবার খোঁজ, নিজের ভাষাকে সংযত কর—প্রিয়া সকলে হয় না। আবার কেন এ জ্বালাতন করা!...

ইতি—'ম'।

(নগেন—মায়া)

বাঃ বাঃ! এ বেশ চমৎকার অনুভূতি। কিছু বল্‌বার নেই, খুব সত্য, এ সত্যের চেয়ে খাঁটী সত্য আর নেই। আমার বিবাহিতা স্ত্রী অন্যের; বাঃ! খুব ভাল! আমি আমার সমস্ত দোষ সমস্ত কালি মুছিয়ে হাত ধুয়ে তুলে নেবার জন্তে এত সাধ্‌লাম—পায়ে ক্রীতদাসের মত মাথা লুটিয়ে দিলাম, আমার যে স্ত্রী—সে বল্‌লে—আমি তোমার স্ত্রী নয়, ভাষা সংযত কর—যে আগুন জ্বেলেছে, সেই আগুনে পুড়ে মরে। যখন ভালবাসায় ভাষা সংযত হয়ে আসে, তবে তখন প্রিয়াকে চুম্বনে আকুল করে, আর যখন ঘৃণায় ভাষা বন্ধ হয়ে আসে, তখন তার কি প্রকাশ হয় জান—জান না, এইবার জান্‌বে। আমি যখন মিশ্‌তে চাই দেহে মনে—তখন দেখি, জগতে দেহ মন কিছুই আমার অধিকারে নয়—তখন দেহ মন নষ্ট করতে মায়া কিসের! দিন কেটেছে, দিন কাটিবে—আমি এর মূল হ'তে উৎপাটন কর্‌ব। এতে যদি সয়তানের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে হয়, এতে যদি ভবিষ্যতে জীবনের রক্ত ঢেলে দিতে হয়, তাও করব। ওই ঘোর ক'রে মেঘের অন্ধকারে বজ্রের গর্জ্জন, অমনি ঘোর বর্ব্বর ভীষণ উদগ্র অশনির মত যদি এ সমাজের মাঝে না পড়ি, যদি তোমার ওই সুখের, আকাঙ্ক্ষার, উল্লাসের, গর্ব্বের প্রদীপ না নিভাতে পারি, তবে আমার মনুষ্যজন্মই বৃথা! আজ

সব ভাল ক'রে বুঝেছি—কার জন্যে আমার এ সংসারে এত দুঃখ—আজ থেকে তার মূল উচ্ছেদ করতে যত্নবান্ হব। আমি এত দিন বিশ্বাস করি নি হেনার কথা, আমি এতদিন বিশ্বাস করি নি কুন্তীর কথা, মনে মাঝে মাঝে কত আঁধারের ছায়া জেগে উঠ্ত ; আগে ভেবেছিলাম, আমার দোষে তুমি আমায় ত্যাগ করলে, আজ দেখছি তা নয়, তোমারই দোষে আমার এই অবস্থা। তোমার দোষের মূলে আবার যে আছে, তাও আজ বুঝেছি ; জীবনের পথে অনেক কাঁটা—এবার সেই কাঁটার সমস্ত নষ্ট করতে হবে, অন্ধকার নিশির শেষ মুহূর্ত্তে যখন সারানিশার সুখজাগরণের পর বাড়ী ফিরেছি, নিস্তব্ধ নিশির ঘুমে-জড়ান-ভাব তখন তাঙে অথবা ভাঙেনি—দেখেছি কি যেন লতায় পাতায় ঘেরা জানলার ধারে অলস নয়ন, ক্লান্ত তনু জড়াতে জড়াতে কার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে ; সম্মুখে পদচ্ছায়া, দূরে পদশব্দ, সম্মুখে পিছনে অন্ধকার, দূরে উষার একটুখানি রেখা টানা—তার মাঝে শালতমালের মত অন্ধকার দীর্ঘচ্ছায়া : আজ বুঝ্তে পেরেছি, সে ছায়ার অর্থ কি ? ছায়া—ছায়া—ছায়ার পিছনে জীবন মনে ক'রে ছুটেছি—আজ ছায়া স'রে যাচ্ছে, চোখের ওপর থেকে সে যবনিকা আমার স'রে যাচ্ছে। নেশার ঘোর মনে ক'রে তখন ভুলে যেতাম, এক একবার পদচ্ছায়া দেখে সেই দীর্ঘচ্ছায়াকে জীবনের প্রত্যক্ষ মনে ক'রে ছুটে গিয়েছি—দেখেছি—আমার প্রাণের ভাই—যে আমায় তার শিরার রক্তে জীবন দান করেছিল। নেশা—নেশার ভুল-দেখা মনে ক'রে সঙ্কুচিত হয়ে স'রে গিয়েছি—কিন্তু আজ বুঝেছি! তখন সেই দেখেছি—সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, যেই সে পায়ের দাগে চেয়েছি—পায়ের তলা থেকে যেন পৃথিবী খসে যেতে যেতে টলমল্ করেছে—তখন ভেবেছি, নেশায় ; আজ বুঝেছি সে নেশায় নয়। দীর্ঘদিনের দুঃস্বপ্নের আজ অবসান হয়েছে—স্বপ্ন নয়—আর এখন এ স্বপ্ন নয় ; সত্যি সব সত্যি। হো! হো! সুরা! সুরা! যে সুরা একদিন মাদকতায় টলটলায়মান করেছিল—আজ সেই সুরা আমায় বল এনে দিচ্ছে, অবস্থাবিভেদে মস্তিষ্কের এত প্রভেদ হয়—সমস্ত স্নায়ু আজ আমায় বদ্ধপরিকর করছে, সিংহের মত শত বজ্রে আর এ কেঁপে উঠ্ছে না। জেনো—সুরা! সুরা! হো! হো! যাতে টল্‌টল্ দল্‌মল্ করে, আজ তাই আমায় বজ্রদৃঢ় ক'রে তুলেছে—আজ আর হাত কাঁপ্‌বে না—ছায়া—ছায়া- অন্ধকারের ভেতর অন্ধকারেরই ছায়া—অন্ধকার দীর্ণ ক'রে সে ছায়াকে ধরণীর অন্ধকারে ঠেসে রেখে দিতে হবে—যেখানে সূর্য্যালোক কখন প্রবেশ করে না, যেখানে এ হৃদয়ের স্পন্দন পৃথিবীর নাড়ীতে শোনা যায় না, যেখানে এ বুকের রক্ত শিরায় শিরায় চলাচল করে না, যেখানে উত্তাপে—শুধু গলিত গন্ধক তরল অগ্নি প্রস্রবণে অণুপরমাণুকণার স্তরে স্তরে বয়ে যায়—যেখানে অগ্নির সমস্ত জ্বালারাশি এক জায়গায় জড় হয়ে

থাকে—দীর্ণ ক'রে বের হ'তে চায়—পারে না, সেই জ্বালার ভেতরে প্রেরণ করব। যেখানে এই পদচ্ছায়া অঙ্কনের শক্তি রাখে না—যেখানে পদশব্দ দূর-শ্রুত স্মৃতিরও আভাস দেয় না—সেইখানে—নারী! নারী! সেইখানে অনন্ত মুর্ম্মুরদাহে ওই সেই হৃৎপিণ্ড উপড়ে সেইখানে আঁধার গহ্বরে রেখে আস্‌ব। আর সান্ত্বনা চাই নে, যন্ত্রণাই আমার মহাসুখ। সুরা! সুরা! কি মনোরম, কি গরম, কি এ অগ্নির লেলিহান শিখাই জ্বালাতে পার! বালকে যেমন টুকটুকে গোলাপের পাপ্‌ড়ি দু হাতে দিয়ে ছিঁড়ে মাটিতে রগ্‌ড়ায় আর হাসে, এমনি ক'রে এ ফুল ছেঁড়ার তৃপ্তি লাভ ক'রে হাস্‌ব। সোনার কৌটায় শুক্‌নো ফুলের রাশি আগুনে দিয়ে দেখ্‌ব—কেমন ভস্ম হয়—সেই ভস্ম উড়ুরে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে দেখ্‌ব, গাছের পাতা-ঝরার সঙ্গে কেমন মানায়। কে চায় তোমারে, কে আর তোমারে চায়—আছে সুরা, আছে প্রাণ—ঢাল্ ঢাল্ প্রাণ, অগ্নিতে অগ্নি ঢাল্, সমস্ত বিশ্ব জ্ব'লে যাক্! গ্রহ তারকা সূর্য্য চন্দ্র নভ হ'তে খসে যাক্, মহাপ্রলয়ের একাকার আসুক, সেই একাকারে তোমার ও বরাঙ্গ ছিন্ন-ছিন্ন ক'রে বায়ুতে মিলায়ে দিই! নারী! পাপ রচনা করেছ—পাপের জ্বালা গ্রহণ করেছ—বিশ্বের বিস্মৃতির উপরে এক মহা জিনিস ছিল ক্ষমা—তা দান কর্‌তে পার্‌তাম—তা হবে না, রক্ত—রক্ত—আপনার রক্ত আপনি চাই। রক্ত-মাংসের শরীর—রক্ত-মাংসের সম্পর্ক—রক্ত-মাংসের ঝঞ্ঝনায় বাজিয়ে—এ গানের শেষ কর্‌ব। রক্তের তৃষ্ণা জেগেছে—শোণিত পান কর্‌বেই—চাই চাই—নিবৃত্তি চাই—তৃষার শান্তি চাই! হো! হো! সুরা! সুরা! ঢাল্ ঢাল্—ভেঙে ফেল এ হৃৎপিণ্ড। সৃষ্টি কর্ লোপ! ভাব্‌ছ এ সব মাদকতার উন্মাদ প্রলাপ।—না?—হা! হা! প্রলাপই প্রলয়ের সখা—মাস্তিষ্কের মাঝে যা প্রলাপ, তাই সৃষ্টির পথে প্রকৃতির প্রলয়। একই কথা!

ওঃ, অসহ্য! অসহ্য! ভাই! ভাই! এই শিরায় তারি রক্তে বেঁচে রয়েছি। প্রাণ দিয়েছে—ভাই! ভাই! অসহ্য—অসহ্য এ নারী! প্রলয় ও প্রলাপ দুই সখা বড় ও ছোট ভাই। রুদ্ধ নিশ্বাসে সমস্ত হৃদয়টাকে—হিরণ্যকশিপুর বিদীর্ণ হৃদয়ের মত রক্ত পান কর্‌তে হৃদয়টাকে দীর্ণ কর্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে! অসহনীয়! অসহনীয়! হে অন্ধকার, তুমি আমার সহায় হও। হে প্রলয়ঙ্করী ভীমা নিশা, তুমি আমায় অন্ধকারে সেই অন্ধকারের ছায়া দেখিয়ে নিয়ে চল। দেখি—আমার এ উন্মাদ প্রলাপ প্রলয় কর্‌তে পারে কি না। শোন নারী—ভাই ভাই নয়, স্ত্রী স্ত্রী নয়। প্রলাপ কাকে বলে—প্রলয় কাকে বলে—ওই দূর তারকার জ্বলন্ত পদধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছি। বল্‌ছে, ওই মেঘে যে এমনি ক'রে আগুনের খেলা খেলে যা। চিরে চিরে বজ্রের মত বজ্রের জ্বালা দিয়ে! কি মধুর! কি মনোরম! কি গরম এই সুরা! ঢাল্ ঢাল্, আগুন জমিয়ে নিয়ে

আর। বড় তাজা আগুন জ্বেলেছে। প্রাণ এইবার ভাল করে আগুনের খেলা খেলুক। অনেক দিন অনেক সুখের আশায় ছুটেছি, এ আজ এ নূতন সুখ। এ আজ এক রক্তের নূতন আনন্দ—এ আর বন্ধ মান্‌তে চায় না।—সুরা বড় মিঠা—তায় যদি রক্তের রাঙা ছিটা থাকে—সফেন দ্রাক্ষারসে যদি এক ফোঁটা রক্তের—বুকের রক্তের সংমিশ্রণ থাকে—তবে সে কি আনন্দ, কি মনোরম, কি মধুর, কি গরম এই সুরার স্রোত। দেখেছি, তার পায়ে শিরীষ ফুল ঝরে পড়েছে, সে পা সরিয়ে নিয়েছে, আমি নেশার ঘোরে মাড়িয়ে গিয়েছি—আজ বুঝেছি,ফুল কেন জানালা থেকে ঝরে পড়ে। আজ তাই আকাশের তারা-ফুলও ওপড়াতে চাই—ব্রহ্মাণ্ড একাকার কর্‌তে হবে! প্রলাপ এসেছে; নারী, তোমার জন্যে প্রলয় সৃষ্টি হবে জেন! তুমি এই প্রলাপ এনেছ, আমি সেই প্রলয় সৃষ্টি করব। দূর-দুরান্তরের জ্যোতিষ্ক—দূর-দুরান্তরের মানব—এ প্রলয়ের ভয়ে দূরে লুকাবে—আঁধার আঁধারের উপর রোল ক'রে গড়িয়ে যাবে। শুন্‌তে পাবে, অন্ধকারের পদশব্দ আলোকের উপর—অন্ধকার তোমায় মহা-তমান্ধকারে গ্রাস ক'রে নেবে। তখন বুঝ্‌বে, জীবনের যন্ত্রণা কেমন; তখন বুঝবে নারী—পুরুষের মন। ওহো! সুরা! সুরা! কি জ্ঞানই এনে দিয়েছ—অতীতের সমস্ত ছবিগুলো একখানার পর একখানা ক'রে ধ'রে দিচ্ছে—জ্বলন্ত জীবন্ত! তাই বিয়ের পর অত হাসির মাঝে দেখে-ছিলাম তার, দুই ফোঁটা চোখের জল। তাই গভীর নিশীথে বাতি-নিভান অন্ধকার ঘরে জানালা হ'তে আকাশের পানে উদাসভাবে চাওয়া—সেখানে তারা পানে চেয়ে দু ফোঁটা চোখের জল। তুমি চোখ দিয়ে চোখের জল কিনেছ, আমি রক্ত দিয়ে চোখের জল কিনেছি—কার দাম বেশী। মানুষের রক্ত-মাংসের শরীরে এ জ্বলন্ত মনের হাটে কার দাম বেশী? চোখের জলের, না রক্তের জলের? সমস্ত দুনিয়াই যখন আদান-প্রদান, তখন দাম চাই! হেনা বলেছে কি জান, প্রাণের দাম প্রাণ, আচ্ছা; তাই চাই, তাই হবে। আজ এই চার বছর ধ'রে যে বই প্রকৃতি লিখ্‌ছিল, অকস্মাৎ তার একখানা পাতায় অনেক লেখা পড়া গেল—দেখ্‌লাম, যেন আগুন দিয়ে সব আগুনের মত জ্বল্‌ছে। প্রত্যেক পাতাটা প্রতি ফুলে—প্রতি ধূলিকণায় বলে দিচ্ছে, সংহার—সংহার! সংহারই মানুষের ধর্ম্ম! সেই আমার এখন মূলমন্ত্র! জগৎ আমায় ঠকিয়েছে—আমি পূর্ণমাত্রায় তার শোধ নেব। প্রকৃতি লিখেছে নারী কামনার ফাঁস। মর্ত্তে শুধু মরণের ইন্ধন সংগ্রহ ক'রে দেয়, কেবল প্রলাপ রচনা করে; সৃষ্টি নষ্ট করাই,—সংহারই পুরুষের ধর্ম্ম। বাঃ বাঃ! এত দিন এ পাতাখানা কেন খুলিনি—দেখিনি বাঃ!

(কমল—সুধীর)

অনেক দিন পরে তোমায় চিঠি লিখ্‌ছি। তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাই আমার আর কি আছে—দিলেই বা প্রাণ বুঝ্‌বে কেন? তবু বল্‌তে হয়, যে গেছে, সে ত

আর ফিরবে না—তার জন্তে কাঁদি কেন, কেঁদে ত আর তাকে পাব না ; তবে কেঁদে কি হবে ? সে যখন স্বর্গে গেছে, তখন সে এ ধরার চির-নিয়মের বাঁধার মাঝখান থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছে, তার দুঃখের নিবৃত্তি হয়েছে, তবে কাঁদি কেন ?—মার প্রাণ বোঝে না তাই কাঁদে। কাঁদলে যদি তাকে ফিরে পাওয়া যেত, তবে প্রাণ ভরে জন্মভোর কাঁদতাম—একবার তাকে ফিরে দেখবার আশায়। সে আশা কারো মেটে না—কেঁদে আর কি করব। তবে নাড়ীর টান—এ কি কখন ছেঁড়া যায় গো!

ইন্দু দিদি বড়ই শোকার্ত্ত হয়ে পড়েছেন, পুত্রশোক, কার প্রাণে না শেল বাজে ? তবে বুক পেতে বাজ না নিতে পারলে আর কি হ'ল। জন্ম হ'লেই মরে—তবে কেউ বলে, সময় অসময় আছে। ওর আর সময় অসময় কি, সে লুকিয়ে চুপি চুপি আসে, জানিয়ে আসেও না, জানিয়ে যায়ও না। কি করব, হাত ত নেই, হাত থাকলে কি কেউ সোনার পুতুল প্রাণ ধ'রে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে পারে ? এই হয়—এমনি ক'রে সবাই আসে, সবাই ভেসে যায়। হাত কোথায় বল ?

আমি তোমাদের ওখানে যেতে পারি নি, তার কারণ তোমায় ভেঙে বলতে হবে না। কি করব, সেখানেও আমার হাত ছিল না—আমি দেখছি, সবই এক অনির্দ্দিষ্ট পথে চলেছে—এ-কে ইচ্ছা দিয়ে সব সময় ফেরান যায় না। যদি ইচ্ছা জগতে সব করতে পারত, তবে তাকেও মোড় ফিরিয়ে দিতাম। তা হয় না। সীমার মানুষ, তার কাজও সীমাবদ্ধ। তবে দার্শনিকতা মমতাকে মুছতে পারে না—মরা ছেলেকে ফিরায়ে দিতে পারে না! যা যায় তা যায়, আমরা শুধু হায়! হায়! ক'রেই মরি। এ সংসারে আসি একা, যাই একা ; আসি উলঙ্গ, যাইও উলঙ্গ। তবে কার শোক। আসি যখন, তখন আগে ছিলাম ; যাই যখন, তখন পরেও থাকব ;—সবাই তাই, তবে শোক করি কেন ? মিহির ছিল, এসেছে—মিহির গেছে—আছে, তবে তার জন্যে শোক কেন করি ? সকল শোকার্ত্ত সকল পরিশ্রান্ত, সকল ক্লান্ত নয়ন যেখানে স্নেহকোলে বিরাম শান্তি উপভোগ করে, পরিশ্রান্ত বালক পথ চ'লে যেতে কষ্ট হয়েছে, তাই সেইখানে গেছে ; আমরাও যখন পথ চ'লে যেতে বড় শ্রান্ত হব, তখন সেই মার কোলে গিয়ে শ্রান্তি দূর করব, তবে শোক করি কেন ? সবাই ত এক জায়গায় যাব। তবে আর শোক কিসের ?

প্রতিক্ষণেই ত দেখছি, এই যে রয়েছে, সে আর নেই—যারা ছিল, তারাও নেই, যারা আসবে, তারাও যাবে। আসে যায়। জানি না, এ আসা যাওয়ার পিছনে কি আছে, কে আসে, কেই বা যায় ; সে কে ? তা বুঝিনি। জীবনে তাই শান্তি মেলে না—তাই কাঁদি, তাই দুঃখ পাই—এ দুঃখের শেষ করতে পারি নি। এত আঁকড়ে যাকে যাকে বুকে ক'রে রেখেছিলাম—তাকে আগুনের কোলে সঁপে দিলাম—তখন

মনের ভিতর যে ভাব হয়েছিল, সে বর্ণনাতীত। বলেছিলাম অগ্নিকে—'হে সর্ব্বশুচি, তোমার ও জ্যোতির্ম্ময় তপ্ত বাহু দ্বারা একে বুকে তুলে নাও। হে অগ্নি, যেখানে পিতৃগণ, জরা-মরণের অতীত হয়ে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে বিরাজ করছেন, এ বালককেও সেই অমরপ্রতিম রূপ দান কর; এও যেন সেই পিতৃগণের সঙ্গে নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় ধাম প্রাপ্ত হয়।' ফিরে এলাম, যেন জন্মজন্মান্তরের চেতনা—জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক আমার ভিতর দিয়ে তাতে পৌঁছুতে লাগ্‌ল। তুমি আমি, মায়া, এ বিশ্বসংসার সবই অমনি ক'রে যাবে। তবে শোক কেন করি? জন্ম হ'লেই মৃত্যু—আগে আর পরে। ভাব্‌বার কথা—তবে কেমন ক'রে জন্ম-মৃত্যুর হাত হ'তে এড়াতে পারা যায়? সেই মানুষের শ্রেষ্ঠ কামনা। জানি না, এ মানুষ তা পারে কি না—যদি জন্ম-মৃত্যুর হাত হ'তে এড়াতে পারা যায়, তবেই দুঃখ বোঝে, নইলে ওই স্বর্গের কামনা—মনের প্রবোধ। দুঃখ-শোক—ভোলবার উপায়। জানি না সত্য কি! এখন দেখ্‌ছি, ভাবনায় কিছু হয় না। এ মহাকালের খেলা—সীমার মাঝে হাসি-কান্না থাক্‌বেই থাক্‌বে। হায় মন! ঝরাপাতার ভালবাসায় এত মুগ্ধ হয়! এত তার টান! যা মুহূর্ত্তের, তার জন্যে এমন ক'রে মরি কেন? দার্শনিকতা নয় বন্ধু চাই—সত্য, তা না হ'লে জীবন জীবনই নয়। সত্যের মুখের পানে চোখ তুলে চাইতে সাহস হয় না, তাই এই সত্যে এত ভয়—নইলে মৃত্যু কি? সে সত্য, তাই তার পানে চাইতে ভয়। ভয় পেয়ে পেয়ে এমন হয়ে গেছি যে, মিথ্যা ভয়ে ভয় পাই। ভয়ও মিথ্যা, তা ভুলে যাই। এমনি মোহের ভুলে ডুবে আছি। জন্ম হলেই দুঃখ—নইলে যেমন জন্ম, অমনি আঘাত, অমনি কান্না—এই ধরায় যেখানে জন্মেই কাঁদ্‌তে হয়, সেখানে ত চিরদিনই কাঁদ্‌তে হবে। যখন ঘুমায়, মাঝে মাঝে শিশু হাসে, মা তার সেই হাসি দেখে হাসে। ঘুমঘোরেই হাসি, স্বপ্নেই হাসি—স্বপ্নই সুখ, সুখই স্বপ্ন; তাই ধরার প্রত্যক্ষ সত্য ফেলে স্বপ্নের ঘোরে অত ডুবে থাকি, তাই সত্যের কঠিন মুখের দিকে তাকাতে পারি নি—তাই কাপুরুষের দেশে বল্‌তে শিখেছি, অপ্রিয় সত্য বল না—জীবনে, কর্ম্মে, ভাবে, স্বপ্নেও তাই মিথ্যাকে আশ্রয় ক'রে চলেছি। এই ত ক্ষণিক জীবন। এই দুঃখ—দুঃখনিবৃত্তির উপায় চাই; নইলে ব্যর্থ নিষ্ফল ও মনুষ্য-জীবন। কান্নাই যে জীবনের সাক্ষী—সে জীবনে লাভ?

তুমি বল্‌বে, ও গাঁজনি গাঁজনতলায় গাও—এখানে নয়। এখানেই হয়, তাই বল্‌ছি। যে দেহের মধ্যে আমি, সে দেহের মায়া ত্যাগ করা বড় কঠিন। পুত্র নিজ দেহ হ'তে ভিন্ন নয়—তাই এত মায়া, তাই এত কাঁদি। দেহ পেয়েই কেঁদেছি, যত দেহ পাব, ততই কাঁদ্‌ব। একটা দেহে যদি এত কান্না হয়, যখন পুত্র-পৌত্র হবে, তখন ত আরও কাঁদ্‌ব। কান্না ত ফুরায় না—তাই খুঁজ্‌ছি, তাই

ভাবছি, দেহ ছাড়া আর কিছু আছে কি না? কে সে আসে, কে সে যায় কে এমন ঊষায় রঙে খেলা করে, কে এমন আঁধার মেঘে বজ্র হানে, কে এমন শোভন নীল আকাশ রচে, কে এমন ভয়ঙ্করী অমানিশায় দিক্ ভুল করিয়ে দেয়। আবার কে এমন ছোট ছোট মণিমাণিক্য ছড়িয়ে তারামালা পরে, ধ্রুবতারার টিপ কপালে দিয়ে, অকূল সমুদ্রে দিক্-হারা যাত্রীকে নীরব অঙ্গুলিতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। ভাব্‌ছি তাই, কে সে! তুমি আমি এ রহস্যে ডুব্‌ছি, উঠ্‌ছি, ভাস্‌ছি; কে, সে যে আমাদের এমন হাসি-কান্নার মাঝে দোলায় ভাসায়, চুবন দেয়, আর এত বড় দুনিয়াটাকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখি—মুখে বাক্ সরে না, অবাক্ করিয়ে রেখে দেয়। আমার এখন মনে হয়, ও পরিশ্রান্তের শান্তি, ও ক্লান্ত নয়নের ঘুম, ও সব আমাদের মনের রচা কথা। এ ছাড়িয়ে যদি যেতে পারি, তবেই যদি মেলে—জানি না, তারও ভরসা আছে কি না? অনেক দিন হ'ল মা গেছে, সে তখন আমি কত ছোট মনে পড়ে অথচ পড়ে না। তখন জান্‌তাম না মৃত্যু কি--ছেলে মানুষের মন বিচার করে না। অত সব জিনিসের সঙ্গে বাঁধন দিয়ে সে দেখ্‌তে শেখে না। যা সে দেখে, সবই ছাড়া ছাড়া—সবই তার কাছে সম্পূর্ণ—সে অত ধারার খবর রাখে না। শুধু মা হলেই তার হ'ল, তার পর দিন যায়, সংসারের সকলের সঙ্গে সে বাঁধন দেয়, নিজেকে জড়াতে আরম্ভ করে। গাছপালা লতা-পাতা, পশু-পাখী, মানুষ সবার সঙ্গে তার নূতন নূতন গাঁথনি হয়; তার পর একদিন সেই বহুপূর্ব্বের শিশু মুখ তুলে চায়—দেখে, সবই ওই রেখায় মিলিয়ে যাচ্ছে, সবই দূরে, তখন সে বোঝে, জীবন-মরণের পারে কোথায় সে—কি সে—কে তাকে ডাকে, কে আসে যায়, কে ওই ফোটা ফুলে মধু গন্ধ, কে ওই ঝরা ফুলের শুক্‌নো হাসি। জীবনের সন্ধ্যায় যখন রক্তরাগচ্ছটা ধীরে ধীরে মুছে আসে, জীবনের প্রথম পঁইঠায় কেঁদে সারা জীবন হাসি-কান্নার ভিতর দিয়ে এসে, শেষ পঁইঠায় এমন কান্না আসে—যা ভাষায় ফোটে না। চোখের জল তখন সব শুকিয়ে গেছে, শিরায় রক্ত তখন অতি ক্ষীণ বয়ে চলেছে, তখনও খুঁজে মরি, কে—কে—কে—কোথায়? তখনও দেখে, নীরব অঙ্গুলি দেখাচ্ছে—পারে—পারে—পারে। তবে আর ভাবি কেন ভাই, সবই পারে—পারে। তুমি বল্‌বে, শেষ পঁইঠে এলে, তখন তো; শেষ পঁইঠে ত সবাই দাঁড়িয়ে ভাই! কে কখন্ যাবে, তার ঠিকানা ত নেই। শুধু ওই পারের দিকে সবাই চায়। শীগ্‌গির শীগ্‌গির সব সুখ সেরে নিতে সবাই চায়—সব দুঃখ ভুল্‌তে সবাই চায়। বৈতরিণীর তীরে সবাই দাঁড়িয়ে।—সবাই কেই দেখাচ্ছে পারে—পারে—নইলে চার বছরের শিশু, সেও পারে যায় কেন?

ইতি তোমার কমল।

মায়ের ডাক

(১)

ঝির্‌ঝিরিয়ে সাঁঝের হাওয়া বইছে নদীর কূলে কূলে,
হাওয়ায় নাচে শাখাগুলি হাওয়ার সাথে দুলে দুলে ;
ফোটা ফুলের সুবাসে তায় উঠ্‌ছে ভোরে'.পরাণখান,
ওই শোনা যায় মনমাতানো দূরের গাছে পাখীর তান।
এমন সময় নদীর ধারে "যেদিন সুনীল" কে গায় গান,
নদীর জলের কুলুকুলু ধ্বনির সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ !

(২)

জগন্মাতা মা আমাদের, খবর তাঁহার রাখি না তো,
কোথায় তিনি, কেমন তিনি, স্বরূপ তাঁহার জানি না তো ।
জানি না তো মা আমাদের আছেন সে কোন্ দীনের ঘরে,
জানি না তো দেখতে মাকে যেতে হবে কত দূরে।
মায়ের আদর, ভায়ের স্নেহ, ভুলে গেছি অনেকদিন,
তাই বুঝি আজ কাঁদ্‌ছে হিয়া—তাই বুঝি আজ শক্তিহীন।

(৩)

সংসারেরি কোলাহলে, জগতেরি আন্দোলনে,
ভায়ের কথা গেছি ভুলে, মায়ের কথাও নেইকো মনে।
আরাম তরে বিরাম তরে ব্যগ্র অতি আমরা আজ,
মোহের বশে, সুখের আশে, ফেল্‌ছি ঠেলে আসল কাজ।
মায়ের বাণী শুনেও মোরা শুন্‌তে কভু নাহি চাই,
ডুবিয়েছি সব বিস্মৃতিতে অতীত সকল মহিমাই।

(৪)

মরম তারে বারে বারে বাজ্‌ছে বীণায় একটি সুর,
"পরকে ভালবাসতে শেখ—স্বার্থটারে কর্‌ না দূর।"
গভীর রবে সমান ভাবে বাজে সে সুর হৃদয়-মাঝে,
এখনো কি খেলাধূলা ? কপটতা আর কি সাজে ?
বোধনশঙ্খ উঠ্‌ল বেজে, শুনিস্‌ না কি মায়ের ডাক ?
অকাজ যত জমাট আছে, ওরে অবোধ ! ফেলেই রাখ।

(৫)

ওরে অবোধ আয় রে ছুটে, রুগ্ন কোথা ? শক্তি নিবি ?
শক্তিময়ী মা আমাদের, তাঁয় ছেড়ে আর কোথা যাবি ?
হাত বাড়িয়ে স্নেহভরে ডাকেন মাতা শোন্‌রে শোন্‌,
দেশের কাজে দশের কাজে দেরে সঁপে পরাণ মন।
মায়ের স্নেহে উঠ্‌বি বেঁচে, মানুষ হবি মায়ের বরে,
মায়ের নামে মায়ের ছেলে কাজ কোরে যা এ সংসারে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ বি, এ।

ভূতের বেগার

(১)

"মোলেম ভূতের বেগার খেটে ;
আমার কিছুই সম্বল নাই মা গেঁটে।"

শ্রাবণের মেঘমেদুর অপরাহ্নটা বড়ই নিরানন্দময় হইয়া উঠিয়াছিল। ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, ডোবার পাশে বেঙ ডাকিতেছিল, ঠাণ্ডা পূবে বাতাস বাঁশগাছের মাথা দোলাইয়া বহিয়া যাইতেছিল। এমনি সময়ে পরাণ বারিক ঘরের সামনে ছোট চালাটিতে বসিয়া, কোঁচার খুঁট্টা গায়ে জড়াইয়া শণের দড়ি কাটিতে কাটিতে আপন মনে গাহিতেছিল,—

"মোলেম ভূতের বেগার খেটে ;
আমার কিছুই সম্বল নাই মা গেঁটে।
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে,
আমি দিন-মজুরী নিত্য করি পঞ্চভূতে খায় মা বেঁটে।"
মোলেম ভূতের বেগার খেটে।"

"আমি কার বেগার খাট্‌চি বারিক ?"

একটা ভাঙ্গা টোকা মাথায় দিয়া আহ্লাদী আসিয়া চালায় উঠিল, এবং ভিজা কাপড়ের খুঁট্‌টা নিঙ্‌ড়াইতে নিঙ্‌ড়াইতে সহাস্যে বলিল, "আমি কার বেগার খাট্‌চি বারিক ?"

পরাণ বাঁ হাতে শণের আগা এবং ডান হাতে ঢেরাটা ধরিয়া, সহাস্য দৃষ্টিতে আহ্লাদীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার।"

ঠোঁট ফুলাইয়া আহ্লাদী বলিল, "ইস্, আমার বোয়ে গেছে তোর বেগার খাট্‌তে।"

পরাণ হাসিয়া বলিল, "তবে বিষ্টিতে ভিজে ভিজে মত্তে এলি কেন ?"

আহ্লাদী বলিল, "মত্তে আসি নাই, তার এখনও দেরী আছে। তোকে বেগার খাটাতে এসেচি।"

"তবু ভাল" বলিয়া পরাণ মৃদু হাসিল, তার পর ঢেরায় পাক দিয়া বলিল, "বেগারটা কি রে আহ্লাদি ?"

"খুব শক্ত বেগার ; পার্‌বি ?"

"আমি আবার না পারি কি ?"

"বিশেষ আমার জন্যে।"

"কেন, তুই কি?"

"তোর আঁধার ঘরের মাণিক।"

"দূর পোড়ারমুখি।"

আহ্লাদী টোকাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "তবে চল্লুম।"

পরাণ সে দিকে না চাহিয়া, দড়ি গুটাইতে গুটাইতে বলিল, "যা।"

টোকাটা পুনরায় রাখিয়া আহ্লাদী বলিল, "বিষ্টিটা বড্ড চেপে এসেছে।"

পরাণ বলিল, "তবে বোস্।"

আহ্লাদী বলিল, "কোথায় বসি? তোর ঘরে কি বস্‌বার কিছু জায়গা আছে?"

পরাণ খড়ের বিঁড়াটা তাহার দিকে সরাইয়া দিল। আহ্লাদী সেটা পা দিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "তুই বোস্। আমি কি খড়ের বিঁড়েয় বস্‌তে পারি?"

ঈষৎ হাসিয়া পরাণ বলিল, "তোর তরে রাজসিংহেসন চাই নাকি?"

ঠোঁট ফুলাইয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে আহ্লাদী বলিল, "কপাল তোর, আমাকে সিংহাসনে বসাবি। নিজে মরিস্ ছেঁড়া চেটায় শুয়ে।"

"ছেঁড়া চেটাই আমার সিংহাসন।"

"তোর সিংহাসন তোরি থাক্, আমি তার ভাগ চাই না।"

"ভাগ চাইলেও আর পেলি কোথায়? ভাগ তো পেয়েই ছিলি, কিন্তু বিধি যে—"

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই পরাণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। আহ্লাদীর মুখখানা ভারী হইয়া আসিল। সে সরিয়া গিয়া হাত বাড়াইয়া ছাঁচার জল লইয়া উঠানে ছড়াইতে লাগিল। পরাণ জোরে জোরে ঢেরায় পাক দিতে থাকিল।

সহসা আহ্লাদী পরাণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এমন বাদ্‌লায় তামাক খাস্ না যে?"

পরাণ বলিল, "কে সেজে দেয়?"

আহ্লাদী ঘাড় নাড়িয়া, চোখ নাচাইয়া বলিল, "ইস্, বাবুকে আবার তামাক সেজে দিতে হবে?"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া পরাণ বলিল, "আমি কাউকে সেজে দিতে বলি নাই।"

আহ্লাদী চুপ করিয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিল; হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটা খুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তামাক কোথায়?"

পরাণ বলিল, "ঘরের ভিতর চোঙ্গায় আছে। উনানে আগুন না থাকে তো খড়ের নুটী পাকিয়ে—"

"ও সব আমার কাজ নয়" বলিয়া আহ্লাদী বিরক্তভাবে কলিকাটা ঠুকিয়া বসাইয়া দিল, এবং ব্যস্তভাবে টোকাটা তুলিয়া লইয়া উঠানে নামিল। ঈষৎ হাসিয়া পরাণ বলিল, "তোর তো কাজ নয়, তা জানি, কিন্তু আমার কাজ কি, তা ব'লে গেলি না?"

আহ্লাদী ফিরিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "বল্‌বো আবার কি? ঘরে জল পড়্‌চে।"

পরাণ। কাল ভাতখাবার ছুটীতে এসে সেরে দেব। খড় আছে?

আহ্লা। না।

পরাণ। আচ্ছা, আমিই এক বোঝা নিয়ে যাব।

আহ্লাদী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তা হ'লে ঐখানেই তো খাবি?"

পরাণ ব্যস্তভাবে বলিল, "না না, খেতে হবে না, আমি খেয়েই যাব।"

আহ্লাদী তীব্রদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পরাণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তার পর চড়া গলায় বলিল, "তোর যেতে হবে না। আমরা অন্য লোক দিয়ে ঘর সারাব, না পারি, জলে ভিজ্‌বো, তোর যেতে হবে না।"

আহ্লাদী দ্রুতপদে চলিয়া গেল। পরাণ ঢেরাটা ধরিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তার পর ঢেরায় পাক দিতে দিতে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল,—

"মোলেম ভূতের বেগার খেটে;
আমার কিছুই সম্বল নাই মা গেঁটে।"

(২)

পরাণকে বাস্তবিকই ভূতের বেগার খাটিতে হইতেছিল। সংসারে ভূতের বেগার অনেককেই খাটিতে হয়, কিন্তু পরাণের মত বেগার খাটিতে কাহাকেও হয় নাই। অল্প-বয়সে বাপ মারা গেলেও পরাণের কষ্ট পাইবার মত অবস্থা ছিল না। দুই পাঁচ বিঘা ধান-জমি ছিল, খেয়া ঘাটের জমা ছিল, তিন চারিটা পুকুর ভাগে দেওয়া ছিল। কিন্তু এই ভূতের বেগার খাটিতেই তাহার সব গেল, পাড়ার অপর সকলের মত দিন-মজুরী করিয়া তাহাকে দিন চালাইতে হইল।

কুক্ষণে পরাণ আহ্লাদীকে বিবাহ করিবার জন্য জেদ ধরিয়াছিল। বুড়া পিসী অনেক বারণ করিয়াছিল, আহ্লাদীর চেয়ে খুব ভাল মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিল, কিন্তু পরাণ বুড়ীর কথা শুনে নাই। সেই যে সে এক এক দিন স্তব্ধ মধ্যাহ্নে খেয়া ঘাটে তালপাতার কুঁড়ের ভিতর পড়িয়া একা ঘুমাইত, আর আহ্লাদী চুপে চুপে গিয়া তাহার নাকে খড়ের ডগা গুঁজিয়া দিত, পায়ে সুড়্‌সুড়ি দিত, আর পরাণ উঠিয়া ধরিতে গেলেই কালো ঠোঁট দু'টিতে মৃদু হাসির তরঙ্গ তুলিয়া চঞ্চলপদে

ছুটিয়া পলাইত, তাহার মাথার খাটো খাটো চুলগুলিতে বাতাসে ঢেউ খেলিতে থাকিত, কোন দিন শান্ত-শিষ্ট মেয়েটির মত গিয়া তাহাকে তামাক সাজিয়া দিত, আবার কোন দিন বা তামাক সাজিতে বলিলে কলিকা আছড়াইয়া, তামাক ছড়াইয়া, হুঁকা ফেলিয়া একটা কাণ্ড করিয়া বসিত, শেষে পরাণের হাতের চড় খাইয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া, ঠোঁট ফুলাইয়া তীব্রদৃষ্টিতে পরাণের দিকে চাহিয়া থাকিত। আর পরাণ বসিয়া মনে মনে একটা সঙ্কল্প আঁটিত।

তার পর যখন আহ্লাদীর বিবাহের কথা উঠিল, তখন পরাণ নিজেই উপযাচক হইয়া আহ্লাদীর পাণিপ্রার্থী হইল; বুড়া পিসীদের নিষেধ, প্রতিবাসীদের বাধা কিছুই মানিল না।

তা আহ্লাদীর মায়ের ইহাতে কোন আপত্তি ছিল না। সে আশার অতিরিক্ত সাড়ে পাঁচ গণ্ডা টাকা পণ চাহিয়া পরাণের মত ভাল ছেলের হাতে মেয়ে দিতে সহজেই রাজী হইল। বিবাহের পণ ঠিকঠাক হইয়া গেল। কিন্তু যত গোল বাধাইল তারিণী চৌধুরী।

সেই যে তিন বৎসর আগে চৌধুরী মহাশয় একটা মারপিটের মোকদ্দমায় পরাণকে সাক্ষী মানিয়াছিলেন, কিন্তু পরাণ হলপ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজি হয় নাই, তাঁহার মুখের উপর সাফ জবাব দিয়া তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছিল, সেই হইতে চৌধুরী মহাশয় এই পাজী ছোট লোকটাকে শিক্ষা দিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তার পর যখন আহ্লাদীর সঙ্গে পরাণের বিবাহ হইতেছে শুনিলেন, তখন তিনি আহ্লাদীর খুড়া বীরুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "পরাণের সহিত আহ্লাদীর বিবাহ না দিয়া তাঁহার চাকর খুনীরামের সহিত বিবাহ দিতে হইবে।" বীরু ইহাতে মত দিতে পারিল না। কেন না, আহ্লাদীর বিবাহে তাহার মাতারই কর্ত্তৃত্ব, বীরুর তাহাতে কোন হাত নাই। একান্নে থাকিলেও অনেকটা হাত থাকিত। কিন্তু বড় ভাই বাঁচিয়া থাকিতেই সে পৃথক্ হইয়াছিল।

চৌধুরী মহাশয় আদেশ দিলেন, "আহ্লাদীর মাকে বুঝিয়ে ঠিক কর্।"

বীরু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সে বুঝ্বার মেয়ে নয় বড় কর্ত্তা।"

চৌধুরী মহাশয় রাগে আগুন হইয়া বলিলেন, "না বোঝে, মাগীকে ঘরে বন্ধ ক'রে ঘরে আগুন ধরিয়ে দাও।"

কিন্তু ইংরাজ-রাজত্বে কাহাকেও ঘরে বন্ধ করিয়া পোড়াইয়া মারা যে সহজ অপরাধ নয়, ইহা মামলাবাজ চৌধুরী মহাশয়ের অজ্ঞাত ছিল না, সুতরাং মুখে বলিলেও কাজে তিনি এতটা করিতে পারিলেন না। তিনি বীরুকে লইয়া অন্য উপায়ের উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

উপায় উদ্ভাবিত হইল, কিন্তু বাহিরের লোকে তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। সেই দিন জানিল, যখন পরাণ বরবেশে ঘটের সম্মুখে বসিয়াছে, পুরোহিত ফুলের মালায় আহ্লাদীর হাতের সঙ্গে তাহার রোমাঞ্চিত হাতটা বাঁধিয়া দিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন, আর আহ্লাদীর মা সেই দুরুচ্চার্য্য সংস্কৃত মন্ত্র কোনরূপে উচ্চারণ করিয়া বর কন্যার হস্তে কুশবারি নিক্ষেপ করিতেছে, সেই শুভ বাসরে, সেই মঙ্গলময় মুহূর্ত্তে যেন ডাকাত আসিয়া পড়িল। দশ-পনেরো জন লোক উন্মত্তভাবে আসিয়া তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিল। আহ্লাদীর মা চীৎকার করিয়া উঠিল. এক জন তাহাকে টানিয়া আনিয়া মুখ চাপিয়া ধরিল; আর এক জন পরাণকে বরের আসন হইতে তুলিয়া দিয়া সেখানে খুদীরামকে বসাইয়া দিল। বীরু আসিয়া সম্প্রদাতার আসনে বসিল। তার পর ভীতিকম্পিত পুরোহিতের মুখ হইতে সম্প্রদানের মন্ত্র উচ্চারিত না হইতেই জোরে জোরে শাঁক বাজিয়া উঠিল। খুদীরামের সহিত আহ্লাদীর বিবাহ হইয়া গেল।

উত্তেজিত পরাণ পরদিনই আদালতে গিয়া খুদীরাম ও চৌধুরী মহাশয়ের নামে নালিশ রুজু করিয়া দিল। মোকদ্দমা প্রায় এক বৎসর চলিল। পরাণের যাহা কিছু সঞ্চয় ছিল, সব বাহির করিল, খোরাকীর ধান বেচিল, জমি বাঁধা দিল, তথাপি মোকদ্দমায় জয়ী হইতে পারিল না। গ্রামে সাক্ষী-সাবুদ তেমন পাইল না। শেষ আশা ছিল পুরোহিতের উপর। কিন্তু তিনি যখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া হলপ পড়িয়া বিপরীত কথা বলিতে লাগিলেন, তখন পরাণ মুখ নীচু করিয়া আদালতের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। হাকিমের রায়ে খুদীরামের সঙ্গেই আহ্লাদীর বিবাহ সাব্যস্ত হইয়া গেল।

রায়ের নকল লইয়া পরাণ উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়াই শুনিল, আজ সকালে খুদীরামের মৃত্যু হইয়াছে। এখনও তাহার দাহ হয় নাই, আহ্লাদী ও আহ্লাদীর মার চীৎকারে পাড়ার লোক অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

পরাণ গিয়া খুদীরামের দাহকার্য্যের ব্যবস্থা করিল।

(৩)

পরাণ কেবল খুদীরামের দাহকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াই অব্যাহতি পাইল না, আহ্লাদীর ও আহ্লাদীর মায়ের পেট চলিবার ব্যবস্থাও তাহাকে করিতে হইল। তাহাদের তখন দিন চালাইবার কোন উপায় ছিল না। খুদীরামের মৃত্যুর পর আহ্লাদীর মা পরাণের নিকট প্রস্তাব করিল যে, পরাণ আহ্লাদীকে লইয়া ঘর-সংসার

করুক, আসল বিবাহ তো তাহার সঙ্গেই হইয়াছে। পরাণ শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "উহুঁ, লোকে কি বল্‌বে।"

তখন আহ্লাদীর মা দেবরকে গিয়া ধরিল; বলিল, "কি হবে ঠাকুরপো?"

বীরু বলিল, "মেয়ের সাঙ্গা দাও, আমি বর খুঁজে দিচ্ছি।"

আহ্লাদী শুনিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ছিঃ!"

যখন আর কোন উপায় নাই, তখন পরাণকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপায়বিধান করিতে হইল। সে আহ্লাদীর মাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভয় কি, আমার একমুঠো জোটে তো তোমাদেরও জুটবে।"

পরাণ দুইটা পেট চালাইবার ভার লইল বটে, কিন্তু তখন তাহার নিজের পেট চালানই ভার হইয়া উঠিয়াছিল। জমার জমি সব গিয়াছিল, খাজনা বাকী পড়ায় খেয়া ঘাটও অন্য লোকে ডাকিয়া লইয়াছিল; মোকদ্দমার সময় দেখা-শোনা করিতে না পারায় পুকুরের ভাগও ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। এখন শুধু দিন-মজুরীর উপর নির্ভর। এই দিন-মজুরীর উপর নির্ভর করিয়াই পরাণ স্বেচ্ছায় আহ্লাদী ও আহ্লাদীর মায়ের ভার লইল।

বুড়া পিসী গজ্-গজ্ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার গজ্‌গজানী পরাণকে বেশী দিন সহ্য করিতে হইল না। শীঘ্রই সংসারের অপর পার হইতে বুড়ীর ডাক আসিল। সে ডাকে বুড়ী চলিয়া গেল, পরাণও অব্যাহতি পাইল।

পরাণ বুড়ীর হাত হইতে অব্যাহতি পাইল বটে, কিন্তু আর একটা ভারী দায়ে ঠেকিল। আগে পরাণ খাটিয়া আসিয়া এক মুঠা তৈরী ভাত পাইত, এখন কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের পর ক্ষুধার দুঃসহ তাড়না চাপিয়া, রাঁধিয়া খাইতে হয়। সে যে কি নিদারুণ কষ্ট, তাহা পরাণ ছাড়া আর কেহ বুঝিতে পারে না। কোন দিন হাঁড়ি ভাঙ্গে, কোন দিন উনান জ্বলে না, কোন দিন ভাত ধরিয়া যায়; আর শ্রমক্লিষ্ট ক্ষুৎপীড়িত পরাণের চোখের জলে বুক ভাসিতে থাকে।

কোন দিন খাওয়া হইত, কোন দিন হইত না। কেবল খাওয়ার ব্যাঘাত নয়, ঘর-দ্বার অপরিষ্কার হইল, উঠানে ঘাস জন্মিল, ঘরে কি আছে না আছে, কিছুই ঠিক রহিল না। দুপুর-বেলা আসিয়া রান্না চাপাইয়া দেখিত, ঘরে নুণ নাই, সন্ধ্যা দিতে গিয়া দেখিত, ভাঁড়ে তেল নাই, জল খাইতে গিয়া দেখিত, কলসীতে জলাভাব। পরাণ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। আহ্লাদীর মা প্রস্তাব করিল, পরাণের হাত পোড়াইয়া খাইবার দরকার নাই, তাহাদের ঘরেই খাওয়া-দাওয়া করুক্। পরাণ কিন্তু ইহাতে সম্মতি দিল না। আহ্লাদীর ইহাতে রাগ হইল, দুঃখ হইল, পরাণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না।

আহ্লাদী কিন্তু রাগ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে মধ্যে মধ্যে আসিয়া পরাণের ঘর দ্বার পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইত, থালা-ঘটীগুলা নোংরা হইলে মাজিয়া দিত, পরাণের ফিরিতে বিলম্ব হইলে তাহার ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া যাইত। পরাণ ইহাতে আপত্তি করিলে আহ্লাদী বলিত, "তা হ'লে বারিক, তোর একটা পয়সা যদি খাই, তবে আমি বাপের বেটীই নই।" অগত্যা পরাণ আর আপত্তি করিতে পারিত না।

লোকে বলিত, "পরাণ, বিয়ে কর্।"

পরাণ উত্তর করিত, "নিজের পেট চলে না, বিয়ে ক'রে কি ক'রবো?"

লোকে বলিত, "নিজের পেট চলে না তো উপরি দুটো পেট চালাচ্চিস্ কি ক'রে?"

পরাণ হাসিয়া উত্তর দিত, "কে কার চালায়; যে চালাবার সেই চালাচ্চে।"

তাহার এই বিসদৃশ উত্তর শুনিয়া লোকে মুখ মুচকাইয়া হাসিত। আর পরাণ আপনার ছোট চালাটিতে খড়ের বিড়ার উপর বসিয়া আপন মনে গাহিত,—
"মোলেম ভূতের বেগার খেটে।"

(৪)

পরাণ বলিল, "আর ভাল লাগে না আহ্লাদী, তোকে সাঙ্গা করি আয়।"

আহ্লাদী উঠান ঝাঁট দিতেছিল; সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল্ দেখি?"

পরাণ বলিল, "কেন আবার কি? সাঙ্গা হ'লে দুজনে মিলে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-ঘরকন্না ক'রবো।"

আহ্লাদী হাতের ঝাঁটাটা মাটীতে ঠুকিতে ঠুকিতে মুখ নীচু করিয়া বলিল, "তোর বড় কষ্ট হচ্চে, না বারিক?"

পরাণ বলিল, "আমার কথা ছেড়ে দে, কিন্তু তোর এই বয়েস—"

আহ্লাদী ঘাড় উঁচু করিয়া রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "দেখ্, মুখ সাম্লে কথা কইবি।"

পরাণ মৃদু হাসিল, আহ্লাদী জোরে জোরে উঠান ঝাঁট দিতে লাগিল।

পরাণ ডাকিল, "আহ্লাদি!"

আহ্লাদী মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিল, "কি?"

প। আমাদের বিয়েটা যদি সত্যি হতো?

আ। তা হ'লে কি হতো?

প। তা হ'লে আজ তুই আমার কত আপনার।

আ। এখন কি আমি পর?

প। ঠিক পর না হ'লেও তবু তেমনটা নয়। মনে কর্, তা হ'লে আজ আমাকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হতো না, ঘর-দোরও এমন লক্ষীছাড়ার মত হয়ে থাক্‌ত না। তা হ'লে আমি খেটে খুটে আস্‌তাম, তুই রেঁধে বেড়ে আমার জন্তে পথ চেয়ে ব'সে থাক্‌তিস্। আমি খেতে বস্‌লে তুই কাছে ব'সে—"

আহ্লাদী ঝাঁটাটা ফেলিয়া দিয়া ছুই হাতে চোখ রগড়াইতে লাগিল। পরাণ জিজ্ঞাসা করিল, "চোখে কি হলো?"

আহ্লাদী ভারী গলায় উত্তর করিল, "ধুলো উড়ে পড়্‌লো। তোর উঠানে যে ধুলো!"

পরাণ ঈষৎ হাসিল; বলিল, "সাধে কি বল্‌চি আহ্লাদি, সাঙ্গা করি আয়।"

আহ্লাদী চোখ ছুইটা কপালে তুলিয়া তীব্র তিরস্কারের স্বরে বলিল, "আজকাল বুঝি তুই এই সব কুকথা ভাবিস্?"

পরাণ বলিল, "কুকথা নয় আহ্লাদি, খুব ভাল কথা।"

আহ্লাদী রাগিয়া ঘাড় দোলাইয়া বলিল, "তোর ভাল কথা তোরই থাক্, আমাকে এ সব মাণিকপীরের গান শোনাতে আসিস্ কেন বল্ তো?"

সহাস্তে পরাণ বলিল, "তোকে শোনাবো না তো আর কাকে আমি শোনাব?"

"যমকে" বলিয়া আহ্লাদী মুখ ফিরাইয়া পুনরায় স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। পরাণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার ডাকিল, "আহ্লাদি!"

আহ্লাদী উত্তর দিল না। পরাণ বলিল, "আচ্ছা আহ্লাদি, আমি যদি একটা বিয়ে করি?"

আহ্লাদী বলিল, "তা হ'লে আমি পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদি।"

পরাণ। কিন্তু তুই সাঙ্গা কর্‌লে আমি হাসি।

আহ্লাদী। মাইরি?

পরাণ। মাইরি।

আহ্লাদী। তবে তো আমাকে শীগ্‌গির একটা সাঙ্গা ক'রে দেখ্‌তে হবে।

পরাণ। সত্যি কর্‌বি?

আহ্লাদী। সত্যিই কর্‌বো।

পরাণ। আমার দিব্যি ক'রে বল্ দেখি।

আহ্লাদী ঝাঁটাটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল ; ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "এই রইলো তোর কাজ। তোর ঘরে যদি আর আসি—"

কথাটা শেষ না করিয়াই আহ্লাদী জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। পরাণ খুঁটী ঠেস দিয়া বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

(৫)

পরাণ দুই তিন দিন আহ্লাদীর দেখা পাইল না। ভাবিল,"আহ্লাদী রাগ ক'রেছে। তা করুক্, তার রাগ বেশী দিন থাকবে না। আবার আপনিই ছুটে আস্‌বে।" কিন্তু চার পাঁচ দিনেও আহ্লাদী যখন একবারও দেখা দিল না, তখন পরাণ নিজেই তাহার সহিত দেখা করিতে গেল। দেখা করিতে গিয়া সে দেখা পাইল না। শুনিল, আহ্লাদী তারিণী চৌধুরীর বাড়ীতে ঝিগিরির কাজ লইয়াছে। সারাদিন সেখানে থাকে, রাত্রে ঘরে শুইতে আসে। পরাণ ভাবিল, "এ আবার আহ্লাদীর কি খেয়াল!"

রাত্রিতে পরাণ আসিয়া আহ্লাদীর সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং তাহার এই অদ্ভুত খেয়ালের কারণ কি জানিতে চাহিল। আহ্লাদী চড়া সুরে স্পষ্ট কথায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে, গতর থাকিতে সে কেন পরের রক্ত-ওঠা পয়সা বসিয়া বসিয়া খাইবে? ইহাতে অধর্ম্ম হয়, পাঁচজনেও পাঁচ কথা বলে। ক্ষমতা থাকিতে সে কেন এমন অন্যায় কাজ করিবে? সে আর পরাণের পয়সা খাইবে না। পরাণও যেন আর তাহাকে সাহায্য করিতে না আসে, তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখে।

উত্তর শুনিয়া পরাণ স্তম্ভিত হইল। সে বুকের ভিতর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া ফিরিয়া গেল।

পরাণের গৃহ অনেক দিন হইতেই শূন্য ; কিন্তু আজ যেন তাহার বড় বেশী বেশী শূন্য বোধ হইতে লাগিল। আজ তাহার চিরপরিচিত ঘরখানা যেন ঘরই নয়, যেন তাহা জনমানবশূন্য স্তব্ধ অরণ্যানী। আজ আর সেখানে একটুও আসক্তি নাই, একটুও আকর্ষণ নাই, বিন্দুমাত্র মমতা নাই ; সব যেন একটা প্রলয়ের অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, শুধু তাহার ভস্মস্তূপের ভিতর হইতে একটা প্রচণ্ড উত্তাপ আসিয়া পরাণের দীর্ণ ভগ্ন বুকটাকে ঝলসাইয়া দিতেছে।

ঘরের ভিতর শুইয়া পরাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। সে উঠিয়া আসিয়া ভিজা চালায় ধূলার উপর খড়ের বিড়াটা মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িল। মেঘের গর্জ্জন, বায়ুর হুহুঙ্কার, বৃষ্টির প্রচণ্ড তাণ্ডব, সকলই যেন তাহার নিকট স্বপ্নের একটা বিচিত্র দৃশ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন পরাণের কম্প দিয়া জ্বর আসিল। জ্বরের সময় তৃষ্ণার প্রকোপে অধীর হইয়া পরাণ কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া কলসী হইতে জল গড়াইতে গেল; কিন্তু কলসীতে এক বিন্দুও জল ছিল না। পরাণ রাগিয়া কলসীটাকে মেঝের উপর আছাড় দিল। মাটীর কলসী শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া ছড়াইয়া পড়িল, কিন্তু তাহা হইতে এক বিন্দু জল বাহির হইল না। পরাণ আসিয়া পুনরায় শয্যার উপর শুইয়া পড়িল; আকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "একটু জল দে আহ্লাদি, একটু জল দে।"

আহ্লাদী তাহার সে চীৎকার শুনিতে পাইল না। প্রাণঘাতী তৃষ্ণার তীব্র যাতনায় পরাণ ছটফট্ করিতে লাগিল।

রোগ-শয্যায় শুইয়া পরাণ প্রতিজ্ঞা করিল, "চুলোয় যাক্ আহ্লাদী, ভাল হয়ে উঠে আগে বিয়ে কর্‌বো, তার পর অন্য কথা।"

রোগমুক্ত হইয়া পরাণ বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিল। একটি এগার বছরের মেয়ে পাওয়া গেল। পরাণ পণের ও ঘর-খরচার জন্য চিন্তামণি পালের হাতচিঠায় ঢেরা সই দিয়া সাড়ে পাঁচ গণ্ডা টাকার সংগ্রহ করিল।

(৬)

"কি হবে বারিক?"

সে দিন বিবাহ। পরাণ একখানা হলুদমাখা নূতন আটহাতি কাপড় এবং গলায় এক ছড়া নূতন কাঠের মালা পরিয়া, খড়ের বিঁড়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিল, এবং তামাক টানিতে টানিতে অনেক দিন আগেকার এমনই একটা ব্যগ্রতাপূর্ণ দিনের কথা বুঝি মনে মনে ভাবিতেছিল। এমন সময় আহ্লাদী ধীরে ধীরে আসিয়া দাবার এক পাশে পা ঝুলাইয়া বসিল, এবং কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, "কি হবে বারিক?"

পরাণ হুঁকা হইতে মুখ সরাইয়া আহ্লাদীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে আহ্লাদি?"

মুখ নীচু করিয়া আহ্লাদী বলিল, "আমার পাপের প্রাচিত্তির হ'য়েছে।"

পরাণ বিস্মিত দৃষ্টিতে আহ্লাদীর দিকে চাহিয়া রহিল। আহ্লাদী বলিল, "তারিণী বাবু আমাদের চাল কেটে তাড়িয়ে দেবে।"

হুঁকাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া পরাণ বলিল, "তোদের অপরাধ?"

আহ্লাদী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি তার কথায় রাজি হই নাই।"

পরাণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা আহ্লাদি?"

আহ্লাদী একবার ছল ছল চোখে পরাণের মুখের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল পরাণ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "সে কি কথা?"

আহ্লাদী চোখে আঁচল চাপা দিল; অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সে বড় নোংরা কথা বারিক, সে কথা আমি তোর সাম্‌নে—"

আহ্লাদী আর বলিতে পারিল না, ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরাণ হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

বসিয়া বসিয়া পরাণ গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "আহ্লাদি!"

আহ্লাদী মুখ তুলিয়া চাহিল। পরাণ বলিল, "তুই দু'দিন আগে কেন বল্‌লি না আহ্লাদী? আজ যে আমার বিয়ে।"

আহ্লাদী চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ তোর বিয়ে ব'লে মনে ছিল না বারিক! তবে আমি যাই।"

আহ্লাদী চলিয়া যাইতেছিল, পরাণ বলিল, "শোন্‌।"

আহ্লাদী ফিরিয়া দাঁড়াইল। পরাণ বলিল, "সাঙ্গা কর্‌বি?"

আহ্লাদী ঈষৎ রুদ্ধস্বরে বলিল, "কা'কে? তোকে?"

পরাণ। যাকে তোর ইচ্ছা।

আহ্লাদী। কেন বল্‌ দেখি?

পরাণ। আমি তো দু'টো সংসার চালাতে পার্‌বো না।

আহ্লাদী তীব্র দৃষ্টিতে পরাণের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না, তুই একটা সংসারেরই চেষ্টা দেখ্‌। আমার বরাতে যা আছে, তাই হবে।"

আহ্লাদীর স্বরটা যেন অভিমানে জড়াইয়া আসিল। সে আর দাঁড়াইল না, মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

পরাণ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর উঠিয়া গলার মালা ছড়াটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল; হলুদমাখা কাপড়খানা ছাড়িয়া একখানা পুরাতন কাপড় পরিল, এবং ঘরে চাবী দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেই দিন নির্দ্দিষ্ট পাত্রীর অন্য বরের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। পরাণ চিন্তামণি পালের টাকাটা ফেরত দিয়া পুনরায় আগেকার মত মজুরী খাটিয়া দিন চালাইবার সঙ্কল্প করিল। কর্জ্জের টাকার কিছু খরচ হইয়া গিয়াছিল। পরাণ স্থির করিল, এই টাকাটার যোগাড় করিয়া দেনার সমস্ত টাকা একেবারে ফেলিয়া দিবে।

সঙ্কল্প পূর্ণ করিবার আগেই পরাণ হঠাৎ এক দিন বদমায়েসী অজুহাতে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইল। গ্রামের অনেকেই তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। তারিণীবাবু নিজে আদালতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পরাণের বদমায়েসী সম্বন্ধে এমন কত কথা বলিলেন,

যাহা পরাণের কল্পনাতেও কখনও উদয় হয় নাই। সে সকল কথা শুনিয়া পরাণ স্তম্ভিত হইল। পরাণ স্তম্ভিত হইলেও হাকিম কিন্তু এমন সম্ভ্রান্ত সাক্ষীর সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি পরাণের আড়াই শত মুচলেখার তলব করিলেন; মুচলেখা দিতে না পারিলে দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড। পরাণ মুচলেখা দিতে পারিল না, জেলে গেল। তারিণী বাবু বাড়ী ফিরিয়া পাঁঠা কাটিয়া বিশালাক্ষীর পূজা দিলেন, এবং ছাগ-মাংস ও লুচী-সংযোগে পরিপাটীরূপে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দিলেন। আহারান্তে ব্রাহ্মণগণ দীর্ঘ উদ্গারের সহিত তারিণী বাবুর প্রতি এমন সকল আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, তারিণী বাবুর জীবনে তাহার শতাংশের একাংশ ফলিলেও যথেষ্ট হইত।

(৭)

দুই মাস পরে পরাণ যখন জেল হইতে খালাস পাইয়া বাড়ীতে ফিরিল, তখন আহ্লাদী তাহার কাছে আসিয়া সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "সব শুনেছিস্ বারিক ?"

পরাণ উত্তর করিল, "শুনেছি।"

আহ্লাদী মুখ নীচু করিয়া পায়ের নখ দিয়া মাটী খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "দুঃখ্যু করিস্ না বারিক, দায়ে পড়েই—"

ম্লান হাসি হাসিয়া পরাণ বলিল, "দায়ে পড়েই হোক্ আর ইচ্ছা করেই হোক, সাঙ্গা ক'রে খুব ভাল ক'রেছিস্ আহ্লাদি। আর কোন বেটা বেটী একটা কথা বল্‌তে পার্‌বে না।"

একটু থামিয়া পরাণ বলিল, "সে দিন আদালতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারিণীবাবু যে সব কথা বল্‌লে; ছি ছি, ও ভদ্দর লোক না ছোট লোক? এম্‌নি তখন ইচ্ছে হলো—"

আহ্লাদী বলিল, "ও ভদ্দর লোক না হাড়ী। তুই জেলে যাবার পর এক দিন রেতের বেলায় বাড়ী চড়াও হ'য়ে যে কাণ্ডটা ক'রেছিল, ভাগ্যে ভাগ্যে বঁটিখানা হাতের কাছে ছিল, তাইতেই রক্ষা। তার পরই ধর্ম্ম রাখ্‌বার জন্তে এই কাজ ক'রে ফেলেছি বারিক!"

পরাণ গুম্ হইয়া বসিয়া ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। সেই দিন গভীর রাত্রিতে একটা বিকট কোলাহলে পরাণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাহিরে আসিল। আসিয়া দেখিল, কায়েত-পাড়ার দিক্ হইতে অগ্নির

লেলিহমান প্রচণ্ড শিখা উত্থিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। পরাণ উর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে ছুটিল।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া পরাণ দেখিল, তারিণীবাবুর বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। বড় ঘরের চাল্‌টা ধূ ধূ শব্দে জ্বলিতেছে, চালের বাঁশ-কাঠ জ্বলিতে জ্বলিতে ফট্‌ ফট্‌ শব্দে ফাটিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে স্ফুলিঙ্গরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, গোঁ গোঁ শব্দে গর্জ্জন করিয়া অগ্নি দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিতেছে।

বাহিরে অনেক লোক জমিয়াছে। তাহাদের মধ্যে তারিণীবাবু মাথায় হাত চাপ্‌ড়াইয়া পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া চীৎকার করিতেছে, "ওরে, আমার বাক্সটা এনে দে। পাঁচ শো টাকা দেব, আমার বাক্সটা এনে দে, আমার দলীলপত্র সব যায় রে।"

পরাণ একবার তাঁহার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, গোঁ ভরে বাড়ীর ভিতর—প্রজ্বলিত বহ্নিস্তূপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

অল্পক্ষণ পরে কে একজন বাক্সটা তারিণীবাবুর পায়ের কাছে আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জনতার মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহা কেহই ঠিক লক্ষ্য করিতে পারিল না।

পরদিন তারিণীবাবু লোকের কাছে বলিতে লাগিলেন, "এ পরাণ বাগ্‌দির কাজ। বেটা কাল জেল থেকে খালাস পেয়ে এসে, রাগে আমার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কি বল্‌বো, সাক্ষী-সাবুদ নাই, নইলে বেটাকে ফের জেলে পুরে দিতাম।"

পরাণ লোকের মুখে কথাটা শুনিয়া মৃদু হাসিল, কোন প্রতিবাদ করিল না। সে পূর্ব্ববৎ আপনার ছোট চালাটিতে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে গুণ গুণ স্বরে গাহিতে লাগিল,—

"মোলেম ভূতের বেগার খেটে ;
আমার কিছুই সম্বল নাই কো গেঁটে।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শিশির-বিন্দু

১

ওহে নব শ্যাম দূর্ব্বা
কি মহান্ তব প্রাণ,
পতিতা আমাকে তুমি
বুকেতে দিয়েছ স্থান।

২

নিজেকে ভাবিনি ছোট
ধরাকে জেনেছি সরা
সুগন্ধ বহিয়া বায়ু
রাখিয়াছে মাতোয়ারা।

৩

তৃষাতুরে কোন দিন
দিইনি হৃদয়-বারি,
সেফালি-পতন দেখি
করেছি আনন্দ ভারি।

৪

গরবের পরিণাম
পতন পিছনে প্রভু,
আছে যে গো লুকাইয়ে
সে কথা ভাবিনি কভু।

৫

তার পর এ কি দেখি
রাখিতে নারিল কেহ,
ছাড়িতে হইল সাথী
মান গর্ব্ব মায়া স্নেহ।

৬

সারাটি জীবনে প্রভু
তোমারে ভাবিনি আমি
আজি শুখাবার বেলা
তবু বক্ষে নিলে তুমি।

শ্রীহেরম্বনাথ পণ্ডিত।

প্রাচীন রাজগৃহ

পঞ্চ-পর্ব্বত-বেষ্টিত প্রাচীন রাজগৃহ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। আন্দাজ পাঁচ শত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে মগধরাজগণ কর্ত্তৃক ইহা রাজধানীরূপে পরিত্যক্ত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান * যখন রাজগৃহে আসিয়াছিলেন, তখন ইহা একেবারে জনশূন্য ছিল। কিন্তু ফা-হিয়ান ও অন্যতম পরিব্রাজক হিউয়েন-সিয়াং এই পঞ্চ-পর্ব্বত-বেষ্টিত স্থানকেই রাজা বিম্বিসারের প্রাচীন নগর বলিয়া পরিগণিত করেন এবং উভয়েই ইহার অভ্যন্তরে, অথবা ইহার সহিত বিশেষরূপে সংস্পৃষ্ট চারিটি স্তূপ দর্শন করেন। এই চারিটি স্তূপ বুদ্ধদেবের জীবনের চারিটি ঘটনার চিহ্নস্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সংক্ষেপে এই চারিটিকে নিম্নোক্ত ভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে;—(১) রাজপ্রাসাদের উত্তর-দ্বারের বহির্দ্দেশে যে স্থানে অজাতশত্রু মদোন্মত্ত হস্তীকে † মুক্ত করিয়াছিলেন, (২) ইহারই উত্তর-পূর্ব্বে যে স্থানে সারিপুত্র ‡ অশ্বজিৎকে ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী দেখিয়াছিলেন, (৩) উত্তরে, অনতিদূরে সুগভীর গর্ত্ত বা পয়ঃপ্রণালী নিকটে, যে স্থানে শ্রীগুপ্তের অগ্নিকুণ্ড অবস্থিত ছিল এবং (৪) ইহার উত্তর-পূর্ব্বে নগর-প্রাচীর যে স্থানে বক্র হইয়াছে, তথায় জীবকের ¶ ধর্ম্মপ্রচারার্থ কক্ষের নিদর্শন।

---

* 'সমসাময়িক ভারত' অষ্টম খণ্ড ৯৩ পৃষ্ঠা।

† বুদ্ধকে সংহারার্থ মগধরাজ অজাতশত্রু মদোন্মত্ত হস্তী প্রেরণ করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

‡ বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য। সারিপুত্র নালন্দায় বাস করিতেন। সারিপুত্রের নির্ব্বাণলাভ হইলে বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য অনাথপিণ্ডদ তথাগতের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সারিপুত্রের দেহের ভস্মাবশেষ লইয়া উহার উপর শ্রাবস্তীতে এক স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। সারিপুত্র তথাগতের দক্ষিণদিকে বসিতেন বলিয়া দক্ষিণহস্ত শ্রাবণ নামে অভিহিত হইতেন। 'সমসাময়িক ভারত,' অষ্টম খণ্ড ৪৭, ৯৩, ৯৫ ও ১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

¶ বিম্বিসারের পুত্র অভয়ের ঔরসে ও কোন নগরশোভিনীর গর্ভে রাজগৃহে জীবকের জন্ম হয়। জীবক তক্ষশিলায় আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। পরে রাজগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া নরপতি বিম্বিসারের কোন দুশ্চিকিৎস্য রোগ মুক্ত করেন। এক সময়ে বুদ্ধের আমাশয় রোগ জন্মে। জীবক একটি পদ্মের মধ্যে ঔষধ রাখিয়া ঐ

উল্লিখিত কোন স্থানই এযাবৎ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। প্রাচীন নগর-বেষ্টনকারী প্রাচীর এক্ষণেও যথেষ্ট পরিমাণে অবশিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু এই প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান বর্ত্তমানে নিবিড় বনভূমি-পূর্ণ। বস্তুতঃ পক্ষে প্রাচীরের মধ্যস্থলে অবস্থিত মনিয়ার-মঠ নামে পরিচিত স্থান ব্যতীত আর কিছুই বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

সকল পর্য্যটকই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই স্থানে একটি সুপ্রাচীন নগর অবস্থিত ছিল, কিন্তু কেহই সুনিশ্চিতভাবে করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। ডাক্তার বুকানান্ * নামক সুপ্রতিষ্ঠিত পর্য্যটক রাজগৃহে ১৮১২ সালের ১৮ই হইতে ২০শে জানুয়ারী অতিবাহিত করেন। দুঃখের বিষয়, মণ্টোগোমারী মার্টিন এই পুস্তক-সম্পাদনকালে এই অংশ পরিহার করেন। ফলে মুদ্রিত পুস্তকে বুকানান্-লিখিত রাজগৃহের বর্ণনার স্বল্পাংশমাত্রই মুদ্রিত হইয়াছে। "India Office Library"তে বুকানানের সমগ্র পাণ্ডুলিপি আছে। ইহাতে দৃষ্ট হয় যে, বুকানানের পর্য্যটনকালে নিকটবর্ত্তী অধিবাসিবৃন্দ প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানকে "হংসপুর নগর" নামে অভিহিত করিত এবং তাহারা মনে করিত যে, প্রাচীনকালে এই স্থানে এক বৃহৎ নগর ছিল। তথাপি বুকানান্ তাঁহার যে সকল সহকারীদিগকে "মনিয়ার মঠ" অনুসন্ধান করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রিপোর্ট অনুযায়ী এই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "নগরের আকারের সামান্য নিদর্শন বা নগরের উপযোগী বিন্দুমাত্র চিহ্নও পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ শুষ্ক পর্ব্বতমালা এই স্থানকে বাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী করিয়াছে এবং ইহাও একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ভারতবর্ষে এই সকল স্থান সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর।"

পদ্মটি বুদ্ধকে ভক্ষণ করিতে দেন এবং ইহাতেই বুদ্ধ ব্যাধিমুক্ত হন। তথাগতের বুদ্ধত্বলাভের বিংশতি বর্ষ পরে জীবক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধকে প্রত্যহ তিনবার দেখিতে পাইবেন আশায় স্বীয় উদ্যানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করেন; ঐ বিহার তিনি বুদ্ধকে প্রদান করিয়াছিলেন।

* ১৮০৭ সালে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের কতকাংশ জরীপ করিবার উদ্দেশ্যে ডাঃ ফ্রান্সিস্ বুকানান্ নামক এক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। বুকানান্ পরে বুকানান্ হ্যামিল্টন্ নামগ্রহণ করিয়াছিলেন। জরীপের সঙ্গে সঙ্গে বুকানান্ ঐ সকল স্থানের অধিবাসী, ভূভাগের উৎপন্ন দ্রব্য, সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়েরই তথ্যানুসন্ধান করিয়া এক সুবৃহৎ পাণ্ডুলিপি লিপিবদ্ধ করেন। ১৮১৬ সালে এই পাণ্ডুলিপি বিলাতে পৌঁছে এবং ইহার সম্পাদনভার মণ্টোগ্‌মারী মার্টিনের উপর ন্যস্ত হয়। মার্টিন স্বেচ্ছানুযায়ী "ছাঁট-কাট" করিয়া "Estern India" নাম দিয়া পাণ্ডুলিপির কতকাংশ প্রকাশিত করেন। এই Estern India বহু মূল্যবান্ পুস্তক ও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

যদি ডাক্তার বুকানান্ হ্যামিল্টন এই স্থান অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহেই স্বীয় মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইতেন। প্রাচীন গৃহাদির প্রস্তর-ভিত্তি এক্ষণেও বহুস্থানে দৃষ্ট হয় এবং বর্ত্তমান রাজগৃহ গ্রামের রাজপথের উত্তরদিকে এই সকল চিহ্ন প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুকানানের উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি স্বয়ং পর্ব্বত-বেষ্টিত স্থানে গমন করেন নাই; কেবল তিনি "সোন্ ভাণ্ডার" গুহা এবং উষ্ণ প্রস্রবণের সন্নিকটস্থ বিপুর ও বৈভার গিরিদ্বয় মাত্র দেখিয়াছিলেন।

১৮৪৭ সালে কাপ্তেন কিট্টো * (Captain Kittoe) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঐ স্থানকে স্থানীয় লোকে "হংসতৌর" বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু, বর্ত্তমানে এই নাম ও বুকানান্-লিখিত "হংসপুর" বিস্মৃতি-গর্ভে গিয়াছে। গিরিয়ক স্তূপের ঊর্দ্ধস্থ যে স্তূপকে কানিংহাম † হিউয়েন-সিয়াং-কথিত "হংসস্তূপ" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহার সহিত এই দুইটি নামের বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পরলোকগত ডাক্তার ব্লক ‡ কয়েক বৎসর রাজগৃহ-পরিদর্শন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মতে পর্ব্বত-বেষ্টিত উপত্যকার নগরে সকল সময়ে লোকে বাস করিত না; কেবল বিপদ্‌কালেই ইহা ব্যবহৃত হইত।

প্রত্নতত্ত্ববিভাগ হইতে ১৯০৫ সালে একটি মানচিত্র প্রকাশিত হয়। ইহা দুর্ম্মূল্য হইলেও আমরা ইহার একটি প্রতিলিপি প্রদান করিতেছি। ইহাতে প্রাচীন রাজগৃহের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরাদি প্রদত্ত হইয়াছে। নিবিড় অরণ্যানী-পূর্ণ বলিয়া অভ্যন্তরস্থ প্রাচীন নগরের চিত্র প্রদান সম্ভবপর হয় নাই। কয়েক বৎসর যাবৎ পাটনাকলেজের অধ্যক্ষ, সুবিখ্যাত, প্রত্নতত্ত্ববিৎ জ্যাক্‌সন্ এই অরণ্য-বেষ্টিত স্থান অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, এবং তিনি ১৯১৩—১৪ সালে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া নিজব্যয়ে এই স্থান জরীপও করিয়াছেন। খনন (Excavation) ব্যতীত যতদূর সম্ভব, প্রায় সকল স্থানই জ্যাক্‌সন্ সাহেব নির্ণয় করিয়াছেন। অবশ্য, খনন ব্যতীত এই সকল স্থানসম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ, মৃত্তিকার উপরে অবস্থিত প্রাচীরের ভিত্তিগুলি প্রাচীন নগরেরই অংশভূত বা আধুনিক, তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় না এবং অন্যত্র এই শ্রেণীর ভিত্তিগুলি যেরূপে প্রোথিত, তাহাতে এই সম্বন্ধের সঠিক কোন

* প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অন্যতম সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মচারী।

† সেনাপতি কানিংহাম—প্রত্নতত্ত্ববিভাগের "আদিপুরুষ।" ইহাঁর "ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোল" ও প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় রিপোর্টগুলি পুরাতন হইলেও বহু মূল্যবান্।

‡ অন্যতম প্রত্নতত্ত্ববিৎ।

নির্দ্দেশ করিতে যথেষ্ট সন্দেহ উদ্রেক করে। পক্ষান্তরে, ইহাঁও প্রতীয়মান হয় যে, পরীক্ষিত স্থানের দক্ষিণদিকে মৃত্তিকা অধিক পুঞ্জীভূত হয় নাই। প্রমাণ-স্বরূপ ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনেক স্থলেই ভূগর্ভস্থ পর্ব্বতভূমির অত্যন্ত সন্নিকটে অবস্থিত এবং কোন কোন স্থলে ইহা সমতল ভূমির উপরেও দেখা দিয়াছে।

যে মানচিত্র আমরা প্রদান করিলাম, তদ্দৃষ্টে নিম্নোক্ত স্থানগুলির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারিবে।

(১) বহির্দ্দেশস্থ প্রাচীর ও দ্বারসমূহ—প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন রাজগৃহের উত্তর-দিকস্থ প্রাচীর বর্ত্তমানে আর নাই—অন্ততঃ ইহা সকল স্থলে দৃষ্ট হয় না। রত্নগিরি ও বিপুলগিরিমধ্যস্থ বর্ষাকালের নদীদ্বারা এই প্রাচীর দূরীভূত হইয়াছে। যে কয়েকটি ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাও দ্রুতবেগে লোকচক্ষুর অন্তরালে গমন করিতেছে। ১৯১৩ সালের অত্যধিক বৃষ্টি প্রাচীরগুলির অত্যন্ত দুর্দ্দশা করিয়াছে। ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসেও যে প্রাচীরের পূর্ব্বাংশ দেখা গিয়াছিল, তাহাও এই ঘন-বৃষ্টিতে ধৌত হইয়া গিয়াছে এবং পশ্চিমদিকেরও অনেকখানি "ধসিয়া গিয়াছে।" ইহার ফলে ১৯১২ সালে দৃষ্ট দুইটি স্তম্ভ (খুঁটী) ঢাকিয়া গিয়াছে। এই দুইটি স্তম্ভ যে সুপ্রাচীন, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

নগরের উত্তরপশ্চিম কোণের মন্দির-স্তূপের পূর্ব্বদিকে প্রায় ৫০ ফীট দূরে প্রাচীন রাজগৃহের উত্তর-দ্বার ছিল।

সোন্‌ভাণ্ডার * পর্য্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম-প্রাচীরও লুপ্ত হইয়াছে। দক্ষিণ-বাহিনী সরস্বতীনদীর শাখাই ইহার কারণ। এক্ষণে আর পশ্চিম-দ্বারের কোন নিদর্শনই দৃষ্ট হয় না। এই পশ্চিম-প্রাচীরের অবশিষ্টাংশ এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকস্থ প্রাচীর-দ্বয় সম্পূর্ণরূপেই অতীত কালের চিহ্নস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

দক্ষিণদিকস্থ প্রাচীরই সর্ব্বোচ্চ—উপত্যকা হইতে ইহা ৩০, কোন কোন স্থানে ৪০ ফিট উচ্চ। এই প্রাচীরে তিনটি সুনির্দ্দিষ্ট ছিদ্র দৃষ্ট হয় এবং এই তিন স্থানেই প্রাচীন রাজপথের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সোণাগিরি হইতে সোন্‌ভাণ্ডার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত যাত্রিগণের ব্যবহৃত পথ ইহারই একটি ছিদ্র হইতে বহির্গত হইয়াছে। চিত্রে ইহা ৩ নং বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সম্ভবতঃ জেতবনে যাইবার ইহাই দক্ষিণ-পশ্চিম দ্বার ছিল। এই প্রাচীরের মধ্যস্থলে আরও একটি ছিদ্র আছে এবং নগরের দক্ষিণ-দ্বার যতদূর অনুমিত হয়, এই স্থানেই ছিল। বাণগঙ্গা নদী হইতে

---

* কেহ কেহ অনুমান করেন যে, রাজগৃহস্থ সঙ্গীতির এই গুহায় অধিবেশন হইয়াছিল।

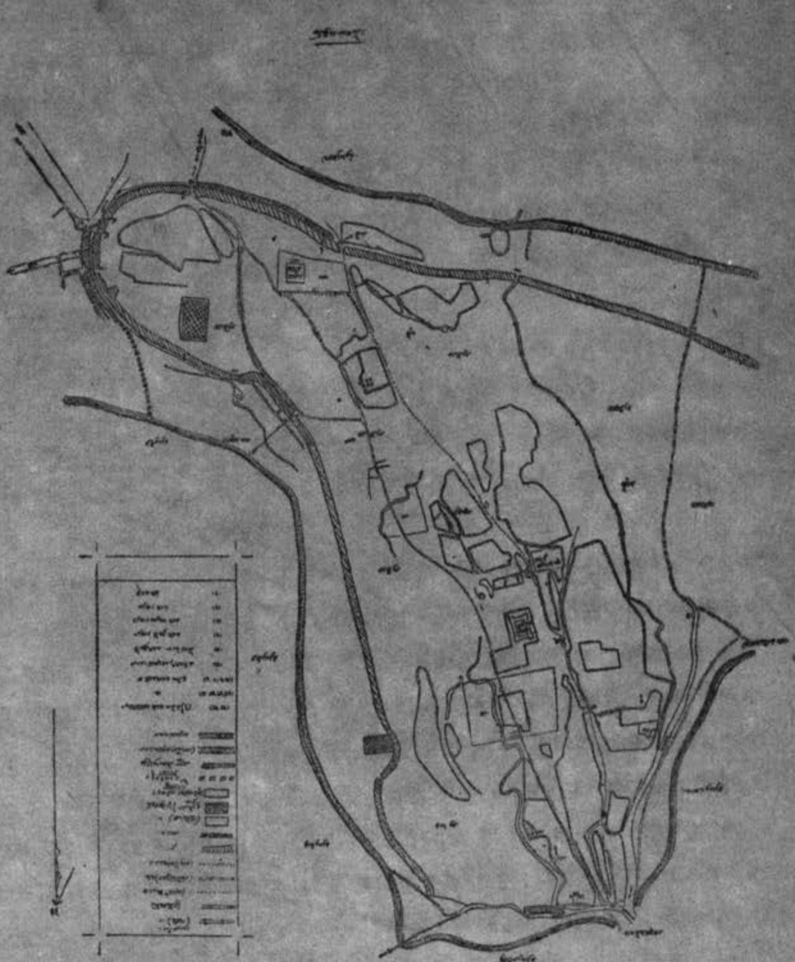

প্রাচীন রাজগৃহ

[৮৮৩ পৃষ্ঠা

একটি পথ সুন্দররূপে নির্দ্ধারণ করা যায়। ইহা মনিয়ার মঠের পূর্ব্বপ্রাচীর পর্য্যন্ত ব্যাপৃত। এই স্থান মানচিত্রে ... করিয়া চিহ্নিত হইয়াছে এবং ইহা অনেকটা সঠিকরূপে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা প্রধান রাজপথ ছিল।

আরও পূর্ব্বদিকে (যে স্থান হইতে রাজগৃহের বর্ত্তমান পথ দৃষ্ট হয়) আর একটি ছিদ্র দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে, এই ছিদ্র আধুনিক। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, এই স্থানেও প্রাচীনকালে একটি দ্বার ছিল এবং ইহার মধ্য দিয়া যে রাস্তা আছে, বর্ত্তমানে যাত্রিগণ রত্নগিরি আরোহণে যে রাস্তা ব্যবহার করে, বিশেষ তাহার সহিত ঐক্য আছে।

এই প্রাচীরে আরও একটি ছিদ্র আছে। মানচিত্রে ইহাকে ৬ বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া বর্ত্তমানে সোনাগিরি হইতে নির্গত একটি ধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই ছিদ্রটি দ্বারনির্দ্দেশক কি না, বলা যায় না; ইহার অব্যবহিত দক্ষিণে একটি পথ রহিয়াছে; এই পথ পর্ব্বতের উপরও উঠিয়াছে এবং ইহার সমতল ক্ষেত্রে স্তূপের ও দুর্গাদির ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে।

নগরের পূর্ব্বদিকস্থ প্রাচীর দর্শনীয় অবস্থায় রহিয়াছে এবং জ্যাক্সন সাহেব অনেক জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এই প্রাচীর পরিদর্শন-যোগ্য করিয়াছেন। এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, উদয়গিরি হইতে বিস্তৃত বাঁধই পূর্ব্বে নগরপ্রাচীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং নগর-প্রাচীরের বহির্দ্দেশস্থ কোন পরিখা দ্বারা গিরিয়ক উপত্যকার জলনিষ্কাশন হইত। স্থান দৃষ্টে মনে হয় যে, এই পরিখা উত্তর-বাহিনী ছিল। পরিখার প্রস্থ ছয় শত হাত পর্ব্বত খনন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহা ১৫ হইতে ২০ ফিট গভীর। জলপ্লাবনে এই বাঁধের অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্য গিরিধারা দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রাচীন নগর প্রাচীরের ক্ষতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীনকালে পরিখার উপরে স্থাপিত সেতুও গিরিয়ক উপত্যকা গমনাগমনে একমাত্র পথ ছিল। মানচিত্রে ইহা ৫ নং বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এই দিকে আর একটি দর্শনীয় দ্রব্য হইতেছে, গৃধ্রকূট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও একমাইলের অধিক দীর্ঘ বাঁধ। গৃধ্রকূটে ইহা উপত্যকাস্থিত অন্য একটি বাঁধের সহিত মিলিত হইয়া "বিন্দুসার রাজপথে"র সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। হিউয়েন-সিয়াংয়ের বর্ণনা পাঠে ইহা পরিষ্কাররূপে প্রতিয়মান হয়। কতকাংশ রাজপথের জন্য এবং কিয়দংশ গিরিয়ক উপত্যকা উত্তরদিক্ হইতে রক্ষার্থ—এই বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছিল। নগর-বহির্ভাগে অবস্থিত হইলেও ধ্বংসাবশেষাদি দৃষ্টে অনুমান হয় যে, এই স্থানে অনেক অধিবাসী বাস করিত।

অধ্যাপক জ্যাক্সন পূর্ব্বদিকস্থ প্রাচীরের অপরাংশ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া

উঠিতে সমর্থ হয় নাই। বনভূমি পরিষ্কার করা সম্ভবপর হয় নাই বলিয়াই এরূপ হইয়াছে। রত্নগিরি পর্য্যন্ত বিস্তৃত পথের সহিত সংযুক্ত এই প্রাচীরে যে দ্বার ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। পর্ব্বতের ঊর্দ্ধে অবস্থিত জৈন মন্দিরের নিকটস্থ কক্ষে এই পথ শেষ হইয়াছে। সম্ভবতঃ, যাত্রিগণ যে ছিদ্র দিয়া গমনাগমন করে, সেই ছিদ্রই প্রাচীন দ্বারের অবশিষ্ট। এই ছিদ্রের নিকটেই ক্ষুদ্রতর আর একটি ছিদ্র আছে; ইহার পার্শ্বদেশ প্রস্তরমণ্ডিত এবং ইহার মধ্য দিয়া একখানি পাল্কী অনায়াসে যাইতে পারে। নূতন রাজগৃহের দক্ষিণ-প্রাচীরেও এইরূপ একটি ছিদ্র দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত স্থান রাজগৃহের ডাকবাঙ্গলার নিকটবর্ত্তী। এই প্রাচীরস্থ বৃহৎ ছিদ্রের অব্যবহিত পশ্চিমস্থ বৃহৎ ছিদ্রপথেই বর্ত্তমান রাজপথ চলিতেছে।

পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ইহার উত্তরের কোণে একটি পুষ্করিণী রহিয়াছে। পুষ্করিণীটি প্রাচীরবহির্ভাগে অবস্থিত। সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এই স্থান চৈনিক পরিব্রাজকগণ-উল্লিখিত জীবকের উদ্যান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

(২) নগরমধ্যস্থ উচ্চস্থান-সমূহ—নগরমধ্যে কয়েকটি স্থান অপরাংশ হইতে যে উচ্চ, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। এই সকল উচ্চস্থানে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তর ও গৃহাদির ভিত্তিমূলের অবশেষ দৃষ্ট হয়। নিম্নস্থান-সমূহে এই সকল চিহ্ন লক্ষিত হয় না। মানচিত্রে যে সকল স্থান জঙ্গলপরিপূর্ণ বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই নিম্ন এবং এই সকল নিম্নস্থানে উল্লেখযোগ্য কিছু দ্রষ্টব্য আছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করা বহুব্যয়সাধ্য—একপ্রকার দুঃসাধ্য। শুধু নিবিড় বনভূমিপূর্ণ বলিয়া নহে—এই সকল স্থানে মৃত্তিকা পুঞ্জীভূত হইয়াছে এবং এই জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি-মধ্য দিয়া যে সকল স্রোতস্বতী প্রবাহিত হয়, তাহারাও এই প্রাচীন স্থানের অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে।

উচ্চ স্থানগুলি মানচিত্রে প্রদর্শন করা হইয়াছে। অনেক উচ্চস্থানের শীর্ষদেশে প্রান্তসীমা-নির্দ্ধারক প্রাচীর রহিয়াছে। ইহার অনেকগুলি কৃত্রিম উপায়ে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এইগুলি দেখিতে প্রাচীন রাজগৃহের চতুর্দ্দিকে যে বহু দুর্গাদি দৃষ্ট হয়, তাহাদেরই ন্যায়। অন্যগুলি প্রাচীন ইষ্টকাদি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথমোক্তগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ক) মনিয়ার মঠের উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ ভূমি,—ইহা প্রায় পঞ্চদশ শত ফিট দীর্ঘ ও পাঁচশত ফিট প্রস্থ মধ্যস্থলে শুষ্ক পুষ্করিণী।

(খ) মনিয়ার মঠের প্রায় আটশত গজ দক্ষিণপূর্ব্বদিকে অবস্থিত চতুর্ভুজাকারের ভূখণ্ড; ইহার মধ্যে আহীরগণের একটি পীঠস্থান রহিয়াছে, বন্যজন্তুর আক্রমণ

হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই তাহারা এই স্থানে প্যটদেবীর পূজা করে। প্রাচীন প্রধান রাজপথ হইতে ইহা প্রায় ৩০ ফিট উচ্চ এবং উক্ত রাজপথ এই ভূখণ্ডেরই পশ্চিমে অবস্থিত। এই চতুর্ভুজস্থানের উত্তরে ও পূর্ব্বে নিম্নভূমি রহিয়াছে।

(গ) ইহার সন্নিকটে এবং নগরের দক্ষিণ-প্রাচীরের দক্ষিণে একটি সমকোণ চতুর্ভুজ দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়—এই দুর্গের ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর সাড়ে আট ফিট প্রস্থ এবং দুর্গের কোণে গোলাকার বপ্র রহিয়াছে। দুর্গ জ্যাক্‌সন সাহেবের উদ্যমে ও ব্যয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে—পূর্ব্বে ইহা বনভূমিমধ্যে লুক্কায়িত ছিল। ৬০ জন লোক চারি ঘণ্টা অবিরত পরিশ্রমের পরে জঙ্গল কতকাংশে পরিষ্কৃত করিলে প্রাচীরের ভিত্তিমূলের পরিমাণ লওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহা হইতে জঙ্গলের নিবিড়তা কতক পরিমাণে উপলব্ধি হইবে। এই দুর্গ যে অতি প্রাচীন, তাহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হয় এবং প্রাচীন রাজগৃহের কেবল এই স্থান হইতে গৃধ্রকূট দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই প্রসঙ্গে পুত্র অজাতশত্রু কর্ত্তৃক পিতা বিম্বিসার কারারুদ্ধ অবস্থায় গৃধ্রকূট পর্ব্বতে বুদ্ধকে দেখিতে পাওয়ার ঘটনাটি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৩) রাজপথাদি—প্রাচীন-নগরমধ্য দিয়া প্রাচীন রাজপথগুলি নির্দ্দেশে দুইটি বিষয় আমাদিগকে সাহায্য করে। প্রথম, এই পথগুলি প্রাচীন ভগ্নাবশেষগুলির অভ্যন্তর হইয়া যায় নাই এবং এইগুলি অনেকাংশেই প্রস্তরাদিবিহীন। দ্বিতীয়, এইগুলি নিম্নভূমি দিয়াই চলিয়াছে এবং ইহাদের উভয় পার্শ্বেই উচ্চ স্থান রহিয়াছে। নগর-বহির্ভাগে, সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে যে সকল রাজপথ রহিয়াছে, সেইগুলির উভয় পার্শ্বেই ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এককালে ঐ রাজপথসমূহ প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। ১৮১২ সালে, পূর্ব্বলিখিত বুকানান্ নূতন রাজগৃহের দক্ষিণ-দ্বার হইতে উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত দুইটি প্রাচীরের নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল চিহ্ন বর্ত্তমানে দৃষ্ট না হইলেও, প্রাচীন রাজগৃহ হইতে বাণগঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজপথের উভয় পার্শ্বেও এইরূপ ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়।

নগরমধ্য হইয়া যে প্রাচীন প্রধান রাজপথ রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। দুই স্থানে (মানচিত্রের ১১ ও ১২) এই রাজপথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রমধ্য হইয়া অগ্রসর হইয়াছে। সম্ভবতঃ এইগুলি নগরমধ্যস্থ দ্বারদেশেরই চিহ্ন এবং ইহার একটি রাজপ্রাসাদপূর্ণ নগরের উত্তর-দ্বার বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইহারই পূর্ব্বে আরও একটি রাজপথ রহিয়াছে—এইটি প্রাচীন গৃহ ও প্রাচীরমধ্য হইয়া অগ্রসর হইয়াছে। আরও কিছু পূর্ব্বদিকে আর একটি প্রধান রাজপথের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ইহা উত্তরপূর্ব্বে বিস্তৃত। এতদ্ব্যতীত নগর-প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া যে আরও রাজপথ ছিল, তাহারও চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এইগুলি প্রায়ই নগরমধ্যে অবস্থিত। কিন্তু, প্রাচীর-বহির্ভাগেও একটি

সুনির্দ্দিষ্ট রাজপথ দৃষ্ট হয়। ইহা দক্ষিণ-প্রাচীরের মধ্যদেশ হইতে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত। রাজপথের বহির্ভাগে অপেক্ষাকৃত নীচু একটি প্রাচীর দৃষ্ট হয়।

(৪) কূপ—মনিয়ার মঠের সন্নিকটেও উহার উত্তরে অবস্থিত একটি কূপ আছে। কিংবদন্তী এইরূপ যে, এই স্থানে ধনরত্নাদি লুক্কায়িত ছিল। এই কূপ গোলাকার ও ইহার চতুষ্পার্শ্ব ইষ্টক-নির্ম্মিত। বাণগঙ্গার নিকটস্থ প্রাচীন রাজপথের পার্শ্বস্থ কূপে এক্ষণে ও জল রহিয়াছে। আরও কয়েকটি চতুষ্কোণ কূপ আছে। প্রাচীন দক্ষিণ-দ্বারের ঠিক বহির্ভাগে একটি দশ ফিট প্রস্থ ২০ ফিট গভীর কূপ রহিয়াছে। মনিয়ার মঠের নিকটে নিম্নদেশ চতুষ্কোণ ও উপরের এক-তৃতীয়াংশ গোলাকার একটি কূপ আছে।

(৫) প্রাচীর-ভিত্তি—মানচিত্রে প্রদর্শিত প্রাচীরগুলি ৪ হইতে ৪॥০ ফিট উচ্চ। এইগুলি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত। সমকোণ ভূমিখণ্ডগুলির সীমানির্দ্দেশকরূপে অনেক প্রাচীর-ভিত্তি দৃষ্ট হয়। মনিয়ার মঠের প্রাচীর ৯০ গজ দীর্ঘ ও ৬২ গজ প্রস্থ। ইহার উত্তরপূর্ব্বস্থ খণ্ড মানচিত্রে ১০ বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। মানচিত্রের ১৪ নম্বরের মধ্যস্থিত স্রোতস্বতী সীমানির্দ্দেশক প্রাচীরের অনেকাংশ লইয়া গেলেও, যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাতেই উহার আকার অনুমিত হয়। এই প্রাচীরগুলি পূর্ব্ব-পশ্চিম বা উত্তর-দক্ষিণ হইলেও ঠিক সোজা নয়—মধ্যে মধ্যে দুই হইতে চতুর্দ্দশ ডিগ্রীর ভ্রম দৃষ্ট হয়।

(৬) গৃহাদি—মানচিত্রে গৃহাদির ভিত্তি-প্রদর্শনের বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। গৃহগুলি সাধারণতঃ ক্ষুদ্রাকারের ছিল—দশ বর্গ-ফিটের অধিক নহে। কোন কোন স্থানে গোলাকার ভিত্তিও লক্ষিত হয়।

দক্ষিণদিকে অবস্থিত প্রস্তর দুর্গের পার্শ্বে আর একটি সুদৃঢ় গৃহ বা প্রাচীর (মানচিত্রের ৯ নং) ছিল। ইহা পশ্চিম প্রাচীরের সন্নিকটে অবস্থিত। এবং রাজগৃহ প্রবেশের দ্বার ও সোন্‌ভাণ্ডারের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই স্থানে ভিত্তি প্রায় পাঁচ ফিট প্রস্থ ও এই গৃহ বা দুর্গ ১১০ বর্গ-ফিট ছিল। ইহার উত্তরপশ্চিমকোণে ৩৬ ফিট ব্যাসের অর্দ্ধ গোলাকার বপ্রের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

নগর প্রাচীরের উত্তরে সমান্তরালভাবে অন্য একটি গৃহ দৃষ্ট হয়—মানচিত্রে ৭ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা প্রস্থে প্রায় ১২ ফিট এবং ইহার উত্তরদিকের প্রাচীরে-১৬০ ফিটের নিদর্শন ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৭) কারুকার্য্যসমন্বিত প্রস্তর—মৃত্তিকাগর্ভে বা ভগ্নাবশেষমধ্যে কারুকার্য্য-সমন্বিত কোন প্রস্তর পাওয়া যায় নাই।

(৮) স্থান-নির্দ্দেশ—ফা-হিয়ান ও হিউয়েন-সিয়াং-বর্ণিত চারিটি স্তূপের স্থান নির্দ্দেশের পূর্ব্বে নগর ও জীবকের উদ্যানের স্থান নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। প্রত্নতত্ত্ববিৎ

কানিংহাম প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের রিপোর্টের মানচিত্রে এই স্থান দুইটি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাসাদ-সমন্বিত নগরের উত্তরের দ্বার তিনি নগর-প্রাচীরের উত্তরপূর্ব্বকোণে অবস্থিত ক্ষুদ্র মন্দির হইতে দক্ষিণদিকে তিনশত গজ অবস্থিত স্থানে, বর্ত্তমান রাজপথের উপরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই উত্তর-দ্বারকে তিনি 'হস্তিনাপুর-দ্বার' বলিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ নির্দ্ধারণের কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। উত্তর-প্রাচীরের বহির্দ্দেশে ও বিপুলগিরির পাদদেশে তিনি জীবকের উদ্যানের কেন্দ্র বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

যদিও জ্যাক্‌সন সাহেবের জরীপে ঐ দুইটি স্থান কানিংহাম-উল্লিখিত স্থানের নিকট-বর্ত্তী বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে, তথাপি প্রাচীন রাজপথেই মন্দিরের ছয় শত গজ দক্ষিণে একটি দ্বারের চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং সন্নিকটে ইষ্টকাদি ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই ছিদ্র বা গেট প্রাচীন রাজগৃহের উত্তর-পূর্ব্বকোণে অবস্থিত। আমাদের মনে হয় যে, এই ভূখণ্ডই প্রাসাদ-সমন্বিত নগরের স্থান। কারণস্বরূপ দুইটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজপ্রাসাদ অবশ্যই সুরক্ষিত ও নগর-প্রাচীরের দ্বার হইতে যে দূরে অবস্থিত ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণনা হইতে দৃষ্ট হয় যে, পর্ব্বতোপরি অবস্থিত নগরের উত্তর-গেট হইতে উক্ত রাজপ্রাসাদ-সমন্বিত নগরের উত্তর-গেট বা দ্বার এত দূরে অবস্থিত ছিল যে, তাঁহারা প্রথমে চারিটি স্তূপের বর্ণনান্তে ও পর্ব্বতোপরি অবস্থিত নগরের উত্তর-দ্বারের সহিত সংসৃষ্ট করণ্ডবেণুবন প্রভৃতির বর্ণনার পূর্ব্বে গৃধ্রকূট বর্ণনা করিয়াছেন।

জীবকের উদ্যানের জন্য দুইটি স্থান উল্লেখ করা যাইতে পারে। হিউয়েন-সিয়াং উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহা রাজপ্রাসাদ-সমন্বিত নগরের উত্তর-দ্বারের উত্তরপূর্ব্বে অব-স্থিত ছিল। কিন্তু অন্যতম লেখক বলিয়াছেন যে, ঐ উদ্যান নগর ও পর্ব্বতমধ্যস্থ বেষ্টনীমধ্যে অবস্থিত ছিল। যদি উক্ত উদ্যানটি নগর-প্রাচীরের উত্তরপূর্ব্ব কোণের দিকে বা ঠিক প্রাচীর-বহির্ভাগে (যে স্থানে প্রাচীর বক্র হইয়াছে) অবস্থিত ছিল, তাহা হইলে উপরি-উক্ত দুইটি মতই সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। নিবিড় বন-ভূমির মধ্যে এই দুইটি স্থান-সুনির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে। সম্ভবতঃ আমরা পূর্ব্বে যে জল-শূন্য পুষ্করিণীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহার নিকটেই জীবকের উদ্যান ছিল।

গেট ও জীবকের উদ্যানের জন্য যে স্থান-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তথায় যাইতে হইলে, একটি স্রোতস্বতী উত্তীর্ণ হইতে হয়। এই স্রোতস্বতী মানচিত্রে দেখান হইয়াছে। ইহা অগভীর এবং ইহারই নিকটবর্ত্তী গভীর গর্ত্তকে শ্রীগুপ্তের অগ্নিকুণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

রাজগৃহ বৌদ্ধগণের অত্যন্ত পবিত্র স্থান। বুদ্ধ এই স্থানে অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইহা জৈনদিগের প্রিয়ভূমি। রাজগৃহের প্রত্যেক প্রস্তর,

প্রত্যেক ইষ্টক, প্রত্যেক ধূলিকণার সহিত মহাভারত হইতে বৌদ্ধযুগের শেষ সময় পর্য্যন্ত স্মৃতি বিজড়িত। ভীম ও জরাসন্ধের মল্লভূমির চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আজ রাজগৃহ পরিত্যক্ত, জনশূন্য—কেবল স্মৃতিটুকুই বাকী আছে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

বিজয়া

সেই অতীতের দিন সাগরের তীরে
পূজিবারে চেয়েছিলে দেবী ভবানীরে
নেত্র ইন্দীবর দিয়া! মনে পড়ে আজ
বিজয়ার পুণ্য সাঁঝে ওগো রঘুরাজ!
কত কাল কেটে গেছে; তবু আজো কেন
বিজয়ার বাঁশী বাজে সকরুণ হেন
বর্ষে বর্ষে অশ্রু ফুটে নয়নের কোণে?
বিজয়ের বর লভি জেগেছিল মনে
যে দীর্ঘ বিরহ ব্যথা; দুটী চক্ষু ভরি
যে অশ্রু ঝরিয়াছিল বিন্দু বিন্দু করি
সেই ব্যথা সেই অশ্রু সে দীর্ঘ নিশ্বাস
বিশ্বমাঝে হেরি আজ সর্ব্বত্র প্রকাশ!

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি, এ।

বেদনার বৈচিত্ত্য

বেদনার বৈচিত্ত্য বাখানিব, সে বড়াই রাখি না। এ জগতে এ বৈচিত্ত্যভোগ কয়-জনের ভাগ্যেই বা ঘটে! কয়জনই বা এর বিরূপ ছেড়ে বিমোহন রূপ দেখ্‌তে পায়? কয়জনই বা এর আঘাতের কাছে আনন্দকে দাবী করতে জানে? অথচ এ জীবনটা কাটিয়ে দিলাম এই যাদুকরের যাদুরী ফেরে। সুখ-শান্তির দিকে বড় একটা ঘেঁসতে পেলাম না, ঘেঁসবার মত মনও আমার ছিল না। কি জানি কেন, এই শান্তি-সুখের দিব্য আরামে ঘুমিয়ে পড়্‌বার ভয়টা আমার বড় বেশী।

তোমরা ঠোঁট হেলায়ে হাস্‌ছ; বল্‌ছ, "কেন, ঘুমনো এত কি দোষের?" দোষ-গুণের কথা জানি না, কিন্তু ঘুমের ঘোর! উঃ, ভাব্‌তেই আমার আতঙ্ক লাগে। তা ব'লে কি আমি চোখ চেয়েই থাকি? দুই চক্ষু আর বুজি না? তা হ'লে ত এদ্দিনে বেদনার আর তর্‌ফা বিকারের হাতে গিয়ে পড়্‌তাম। তা নয়, কেবল কি চোখ বোজা আর চোখ না বোজাতেই ঘুমন্ত আর জাগ্রতের পরিচয়? প্রেমের ঝাকুনি, ঝিমুনি, কৈতবের চোখ চাউনি, চোখে হাত বুলানি কত কিছুও ত আছে? আমি ত কত কত দিন পক্ষ্ম-পংক্তি খুলে রেখেই এমন ঘুম ঘুমই যে, ডাকাডাকির সুর-গোল মোটেই আমার কানে পৌছায় না। আবার চোখের পাতা এঁটে-সেঁটে এমন সজাগ থাকি যে, অবান্তর জলের আওট্‌ পর্য্যন্ত টের না পেয়ে পারি না। তা হ'লে তোমরা সুখী জনেরা কেবল আঁখি মুদে প'ড়ে থাক, এমন কথা আমি বল্‌ব?

ঘুম বল্‌তে আমি বুঝি, আমার প্রাণের কাছে পাহারার প্রতিষেধ। আপনা প্রাণের চেয়ে ত প্রিয় বস্তু সংসারে আর দ্বিতীয় নাই (এমন প্রেম-পাগ্‌লা তোমাকে দিয়ে যাই কেন বলিয়ে নিচ্ছ না) সেই প্রাণের খবরদারি করা, তাকে চোখে চোখে রাখা বড় মিঠা-কড়া কাজ। আয়েসে তা হয় না। তাতে তজ্‌বিজ চাই, তাতে হুঁসিয়ার হওয়া লাগে। তাই ত প্রাণ কবুল করেও এই জাগরণনিষ্ঠের জিম্মায় আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি।

তা ব'লে কি এর ভুলচুক্‌ নাই? সব সময়ই কি এ সব বুঝে চল্‌তে জানে? তা জানে না, বরং আরো উল্টা। কারবারই হ'ল এর প্রাণটাকে নিয়ে। তাতে কচি প্রাণ, কাঁচা প্রাণ, পাকা প্রাণ, ডব্‌কা প্রাণ, তাজা প্রাণ, মরিয়া প্রাণ, রসাল প্রাণ, রঙ্গীল প্রাণ, বিন্দু প্রাণ, বিশাল প্রাণ, রকমারি ত আছে। তা ওর ঐ এক কথা

"ঘা না বসালে টেঁকসই জানবে কেমন?" এই ঘা বসানো নিয়েই যত সব গলদ! কত কত সময় একেবারে প্রাণের দফা নিকাশ!

না হবে কেন? কচি-কাঁচা প্রাণ অমনিতেই দেহের পরবশ; সেই দেহ, দেহীর ভোগ-যাতনা দেখে পাঠ ওঠাতে চাইলে আর ত মানা নাই। তখন বেকুব বনতে বেদনা-কেই। আর ডব্‌কা প্রাণ জানই ত দেহের সাথে আপোসে কাজ চালায়; একের ধাক্কা অন্যকে সামলে নিতেই হয়, দেখেও বেদনা বেত্রহস্তে এদের ধাঁধাঁ নাচন নাচাতে চায়। কিন্তু তাজা প্রাণের তাগতের কাছে দেহই যেখানে জুজু হয়ে আছে, সেখানে বেদনা জুলুম করতে যায় কোন্ সাহসে বল? তা ছাড়া মরণের দুয়ারে যে প্রাণ দেহকে বান্ধা রেখে দিয়েছে, সেখানে বেদনার কশাঘাত ত বিদ্রূপের ব্যাপার! তবে রসাল প্রাণ, রঙ্গীল প্রাণ, এদের নিয়ে এর রঙ্গ চলে বটে, রোথ্‌শোধ ত চলে না। কিন্তু যেখানে পরিণত বিশাল প্রাণের বিবৃতি ব্যাপৃতি লয়ে, তুমি ঘা খেতে ঘাড় পেতে দিতে শিখেছ, যখন বেদনাকে ভোগেরি বস্তু জেনে তাকে আকাঙ্ক্ষা করতে পেরেছ, তখন তার বৈচিত্ত্যি তার জাগ্রত স্ফূর্ত্ত মূর্ত্তি তোমরা বেদনার বাদী-যুমন্তেরা দেখ্‌তে পাবে কেমন ক'রে? যখনি চোখ খোল তোমারা দেখ তার রুদ্ররূপ, তোমরা দেখ আপনাদের লাঞ্ছনাভোগ! তা মারপিট ওর স্বভাব, কি করবে তুমি?

কেন? মেজাজী নিয়ে কি তোমরা কারবার কর না? কিন্তু এ রুদ্রেরও যে হৃদয় আছে, সেও যে তোমার শুভ খোঁজে? না হয় ওর শুভাশুভের আকার আলাদা, আচরণ বিভিন্ন।

ধর না, এই না একচোট্ খুব কান্দালে, যখন দরদর দু'নয়নে ধারা, যখন ধারায় ধারায় বক্ষ তোমার ভেসে গেল, যখন বক্ষের স্নিগ্ধ সিক্ত পরশে তুমি নিভৃত প্রাণের সাড়া পাচ্ছ, তখন অতি সন্তর্পণে নজর-সর্ব্বস্ব নয়ন তোমার, প্রাণের কাছে এসে ধরা দিল, দেখ, পরাণে আর নয়নে মিলে এখন কত বেগার খাট্‌ছে। তোমাদের আনন্দ উল্লাসেও নয়ন গলায় বটে, কিন্তু সে গলুনি বক্ষঃস্থল অবধি পৌঁছায় না যে। শক্তি একরত্তি হ'লে উৎস তার ছোটে কি? সে জলের ফোঁটা পুঁছে ফেল্‌লেই আঁখিতে আবার যে প্রাণ-ফাঁকি-দেওয়া-নজর, সেই নজর। মোট কথা, তোমরা হ'লে চোখ বাঁচিয়ে মানুষ, আর আমি হলাম চোখের বালাই নিয়ে মানুষ। কাজেই তোমরা বেদনাকে বেদনা ব'লেই জান, বেদনাতে বেদনাই পাও, তাই বেদনাকে এত তোমরা ডরাও।

চোখের কোণ ভিজা দেখ্‌লে তোমরা অমনি এস আদর ক'রে তা পোঁছাতে। আমি ভাবি, এ কি মমতা? না নিষ্ঠুরতা? যে কাঁদিয়েছে, সেই যে মমতার জন হয়েছে, ত কি এরা জানে না? কথাই হ'ল, যদি মমতাকে বিশ্ব-জোড়া করতে

চাও, তবে দাও তাতে বেদনার অশ্রু ঢেলে দেও। মা সন্তানকে কাঁদায় কখন্? যখন কাঁদানো ভিন্ন সন্তানকে বাড়ন্তে ধরে না। মা জানে তার সন্তান বেদনারি দান। সন্তানকে বুকে ক'রে মা বেদনাকেই আঁকড়ে ধরে। তাই ত অনাদি-কাল হ'তে এই বেদনাই বিশ্বজয়ী হয়ে যাকে জগৎমাঝারে সবার উঁচুতে দাঁড় ক'রে রেখেছে। কারো সাধ্যি নাই, এই বেদনার হাত এড়ায়ে যাকে নীচুতে নামায়।

আর বঁধু! তুমি ত জান, বেদনাই বঁধুর প্রাণ, বেদনাতেই তার বেঁচে থাকন। তাই ত বিহ্বল প্রেম এই দণ্ডধারীর দণ্ড ছুঁয়ে বল্‌ছে—

"বঁধু যদি দেয় বেদনা, স্বর্গ-সুখ কি তার তুলনা!"

ঐ দিকে বৈভবের ভোগীকে দেখ না, বেদনা তার সুহৃদ্ কি না। সম্পদের রগ্‌ড়া পথে যদি তার পা ফস্‌কেছে, তখন বেদনা ছাড়া তার চেতনা কে রাখে বল? এই বেদনার প্রসাদেই না তাপস যাজ্ঞা কর্‌ছে "দেগো দয়াল! দহন দে, জীবন থাক্‌তে একবার বাঁচার মত বেঁচে নি।" সে জানে, এ দহনীতে পুড়ে ছাই করে না, এ দহনী যে গর্‌দা কেটে বের ক'রে দেয়। তখন সাঁচ্চা সোনা হয়ে আপনা জিল্লাতে জগৎ মাৎ কর্‌ছে দেখে তস্করেরা তাজ্জব।

বল্‌ব কি, যখনি হৃদয়কে বরখাস্ত ক'রে তুমি স্বার্থের মোসাহেবি কর্‌তে লেগে গেছ, তখনি সে ভণ্ড প্রচণ্ড তোমার সব সুপারিসি রদ ক'রে হৃদয়কে মোতায়েন রেখেছে। যদি পরাণে তোমার পাষাণের ধাঁত লেগেছে, যদি শীতল অসাড় হয়ে পড়েছ, দেখ্‌বে, কোন ফিকিরে সে যাদুকর ঐ পাষাণে স্রোত বহায়ে তোমার দিল্‌কে দরিয়া ক'রে দিয়েছে। আর তুমি সে পুণ্য-প্রবাহে গণ্ডূষ ক'রে পূর্ব্বপুরুষের তর্পণ কর্‌ছ। যে আজ মৃত্যুর সঙ্গে মিত্রতা ক'রে করাল যমের দূত সেজেছে, কাল সে তোমায় কোলে ক'রে মৃত্যুঞ্জয়ের স্বরূপ দেখাচ্ছে।

কখনও টানন, কখনো টুটানো। এই বিঁধিয়ে বিঁধিয়েই সে তোমার সব ছড়ানোকে একঠাঁই কর্‌ছে, এই বিঁধিয়ে বিঁধিয়েই সে তোমার সব জড়ানোকে ছত্রক্ষিণ ক'রে দিচ্ছে। তুমি এই পেয়ে, এই না পেয়ে, যখন হর্ষ আর বিষাদের মাঝে পড়ে, মন্ত্রমুগ্ধের মত কেবলি ওঠা-নামা কর্‌ছ, যখন এই ওঠা-নামায় আর তোমার কোন হাত নাই, তখন কোন মান্ত্রিক তোমার এই দ্বিধার দ্বন্দ্ব ফুঁকিয়ে দিয়ে, তোমাকে বিশ্বের মাঝে ছেড়ে দিল। তুমি তখন জন্মের বন্ধন, কর্ম্মের বন্ধন, মর্ম্মের বন্ধন, দৈবের বন্ধন কিছুরি নিশানা পাচ্ছ না!—মুক্ত! মুক্ত! মুক্ত!—

"কে করে আর মানা রে ভাই! কে করে আর মানা;
সকল বাঁধন টুট্‌ল যবে, আমোদ তখন একটানা।"

শ্রীজগদম্বা দেবী।

চার-ইয়ারী কথা

(পরিচয়)

চারজন ইয়ার-বন্ধু 'ক্লাবে' ব'সে গতজীবনের যে চারটি ঘটনা বিবৃত করেছেন, তারই নাম 'চার-ইয়ারী-কথা'; সুতরাং বলা বাহুল্য, চারটি গল্পই প্রণয়-মূলক। কিন্তু সাধারণ প্রণয়-মূলক গল্প যা আজকালকার মাসিকপত্রগুলোকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছে, তা থেকে এদের কিছু বিশেষত্ব আছে; তাই গল্পের পরিচয় না দিয়ে সেই বিশেষত্বের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

চারজন বন্ধুই কৃতবিদ্য, কর্ম্মের পথে অগ্রসর এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশ থেকেই কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। প্রথম-যৌবনের প্রণয়-রাগচ্ছটায় আর সে উন্মাদনা নেই, কিন্তু তার মধুর স্মৃতিটুকু এখনও তাঁদের স্মৃতিপটে জড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং তাঁরা ভালবাসার মত একটা সনাতন মনোভাবের উপর অশ্রদ্ধ না হ'লেও সেটাকে নিয়ে একটু রঙ্গ-রসিকতা করতে ছাড়েন নি। ভালবাসায় পড়াটা মানুষের পক্ষে খুব স্বাভাবিক এবং কারো কারো মতে স্বর্গীয় হ'লেও তার মূলে যে হয় একটু বেশী ভাব-প্রবণতা, না হয় নির্ব্বুদ্ধিতা, না হয় প্রবঞ্চনা ও পাগ্‌লামী থাকে, তার ইঙ্গিত প্রতি গল্পেই পাওয়া যায়।

ভালবাসা মূলতঃ এক জিনিস হ'লেও ব্যক্তিগতভাবে তার প্রকৃতির যথেষ্ট বৈষম্য আছে; অর্থাৎ তার অর্থ, উদ্দেশ্য ও অভিব্যক্তি প্রত্যেক লোকের কাছে স্বতন্ত্র। সেই স্বাতন্ত্র্যটুকু যিনি চরিত্রের অনুপাতে ভাল ক'রে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন, তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন হ'তে পারে না।

এখন দেখা যাক্, প্রমথ বাবু তা পেরেছেন কি না। প্রথমেই আমাদের এটা চোখে পড়ে যে, তাঁর অঙ্কিত প্রত্যেক পুরুষ ও রমণী চরিত্রে একটা জীবন্ত বিশেষত্ব আছে। তাঁদের নৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য মতামত স্পষ্টভাবে আমাদের না বলা হ'লেও আমরা দেখ্‌তে পাই, তাঁদের Psychology যথেষ্ট বিভিন্ন এবং যতই জটিল হোক্ না কেন, পরিস্ফুট।

কিন্তু সে কথা এখন থাক্। তাঁদের প্রত্যেকের প্রণয়টি স্ব স্ব প্রধান ও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গত কি না, তাই দেখা যাক্। আমার মনে হয়, এখানে লেখক এমন একটা শিল্প-সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন,—যা নিপুণভাবে মনুষ্য-চরিত্র লক্ষ্য করবার ফল।

প্রথমতঃ সেন। ইনি ভাবুক ও কবি; অর্থাৎ বিষয়ী লোকের মতে ঠিক উন্মত্ত না হলেও উদ্‌ভ্রান্ত। সুতরাং এক অলৌকিক চন্দ্রালোকে একজোড়া নীলার মত কোমল চোখের মধ্যে যে ইনি আপনার আদর্শ-সুন্দরীর বা মানসী প্রতিমার সন্ধান পাবেন এবং অতি সন্তর্পণে, অতি আগ্রহভরে, অতি কবিত্বপূর্ণ ভঙ্গীতে আপনার মনোভাব বলি বলি ক'রেও বল্‌তে পারবেন না—এইটেই হ'চ্ছে স্বাভাবিক।

সীতেশ অবশ্য একজন সাদাসিদে practical man of the world হাজারে যেমন ন'শ নিরনব্বুই জন হয়। ইনি স্বভাবতই একটু রমণী-সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী—সুতরাং প্রথম ধূর্ত্ত রমণীর একটু অপাঙ্গদৃষ্টি, একটু কেশমুক্ত সুরভি, একটু কৃত্রিম সহৃদয়তা ও একটু অযাচিত প্রশংসার সঙ্গে মিশ্রিত সদয়-তিরস্কার, এঁকে একেবারে বিলুপ্তসংজ্ঞ ক'রে দিলে। এ রকম আত্মবিস্মৃতি অনেকটা মস্তিষ্কেরই বিকার, যাকে হিষ্টীরিয়াও বলা যেতে পারে।

তার পর সোমনাথ ও রিণী। এরা দুজনেই বাঁকা চালের লোক, যেমন চতুরঙ্গের ঘোড়া। এঁদের প্রণয়-কাহিনী পড়্‌তে পড়্‌তে কেবল মনে হয়—'যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে'। এঁদের দুজনের মধ্যে স্থৈর্য্য ও চঞ্চলতা, জীবনী ও অবসাদ, গাম্ভীর্য্য ও বাচালতা, মর্য্যাদা ও নিরভিমান, আন্তরিক পরিবর্ত্তন ও বাহ্য অবিক্রিয়া, ক্ষণে ক্ষণে নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে এবং সেই তরঙ্গ-হিল্লোলে দু'জনেই নেচেছেন ও পরস্পরকে নাচিয়েছেন, কতকটা বুঝেছেন, কতকটা বুঝেও বোঝেন নি। এ ভালবাসার অভিনয় করাও শক্ত এবং এর হার-জিত স্পষ্ট বুঝা যায় না। এতে যে শেষ পর্য্যন্ত ধরা দেয় না, সেই বোধ হয় বেশী ক'রে ধরা পড়ে। এ প্রণয়ের তৃপ্তি নেই, পরিসমাপ্তি নেই—এর জীবনেই কেবল আকাঙ্ক্ষাতে—গতিতে।

বিদ্যুতের মত তীব্র, রামধনুর মত বিচিত্র এই প্রণয়ের একচুমুক পান ক'রেই সোমনাথ যেন শ্যাম্পেনের নেশায় টল্‌টল্ করেছিলেন এবং আমার বিশ্বাস, মাত্রা বেশী হ'লে এ সীতেশের অষ্টধাতুনির্ম্মিত প্রকাণ্ড দেহকেও ভূমিসাৎ ক'রে দিতে পার্‌তো।

শেষ গল্পে 'এনের' ভালবাসাই প্রধান। এ ভালবাসায় মাদকতা না থাক্‌লেও চমৎকারিত্ব বেশী। এ যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি শান্ত, তেমনি পবিত্র। এ শুধু দেখ্‌বার, সেবা কর্‌বার, সুখী করবার কামনা; যাতে ইন্দ্রিয় নেই—যা পাতিব্রত্যের হানিকর নয়—যা নির্ম্মল উদার আকাশেরই মত। এ ভালবাসা ব্যথা নিতে জানে, দিতে জানে না—এ লজ্জার আবরণে সামাজিক দূরত্বের অন্তরালে অর্দ্ধেক চাপা—এ, এ জগতে প্রকাশ হয় না, প্রকাশ হয় পর-জগতের পারে।

রায়ের ভালবাসা একপক্ষীয়, সেনের ভালবাসাও তাই। তার মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত বা লোভনীয় ভাবে বল্‌তে গেলে আদান-প্রদান নেই। বিমানবিহারী রায় তাবের

বেলুনে চ'ড়ে যে, ভালবাসার বায়ুস্তরে সঞ্চরণ করেছিলেন, তা যেমন হাস্যোদ্দীপক, পরিচারিকা 'এনের' নিঃস্বার্থ, পার্থিব অথচ বাস্তব প্রেম তেমনি করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী।

সীতেশ ও সোমনাথের ভালবাসা অপর ভালবাসার প্রত্যুত্তর, অনেক পরিমাণে তার দ্বারা উদ্দীপিত। তবে এই দুই ভালবাসার মধ্যে প্রভেদ এই যে,—একটি ভ্রান্তি, অপরটি সন্দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত, একটি কৃপা, অপরটি বিস্ময়ে পর্য্যবসিত।

বিদেশিনীর সঙ্গে বিদেশী যুবকের প্রেম প্রত্যেক গল্পেরই বিষয়। সুতরাং গল্পের পরিণামসম্বন্ধে লেখককে বিশেষ সতর্ক হ'তে হয়েছে এবং experience এর চেয়ে কল্পনার উপর বেশী নির্ভর করলেও, মনে হয়, তিনি প্রত্যেক ঘটনাটিই প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি রিণীর মত একটি অদ্ভুত বিদেশিনী মহিলার হৃদয়-তন্ত্রীর প্রত্যেক সূক্ষ্ম, প্রত্যেক কোমল সুরটি এমন সুন্দরভাবে ধরেছেন যে, মনে হয়, তাঁর অন্তর্দৃষ্টির নিকট কোন রমণী-হৃদয়ের কোন গূঢ় রহস্যই লুকানো থাকতে পারে না। তিনি পর্য্যবেক্ষণ করতে জানেন ব'লে, তাঁর কল্পনার সৃষ্টিও এত স্বাভাবিক।

চরিত্রাঙ্কন ও ভাব-বিশ্লেষণ সম্বন্ধে দু এক কথা বলেছি, এবার আর্ট সম্বন্ধে কিছু বলবো। ছোট গল্প তৈরি করতে বড় শিল্পীর প্রয়োজন। অল্প চরিত্র, অল্প ঘটনা, সংযত বর্ণনা ও পরিমিত মনোভাবের মধ্য দিয়ে একটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করাই ছোট গল্প-লেখকের কাজ; 'তাতে কৃতকার্য্য হ'তে হ'লে প্রত্যেক শব্দটি বাছাই ক'রে' প্রত্যেক ঘটনাটি যাচাই ক'রে ব্যবহার করতে হবে এবং গল্প-বিকাশের প্রতিস্তরেই দৃষ্টি রাখতে হবে শেষ লক্ষ্যের দিকে।

চার-ইয়ারীর কথা যে এই শ্রেণীর রচনার একটি সুন্দর আদর্শ তা অসঙ্কোচেই বলা যেতে পারে। প্রথমতঃ লেখক চারটি গল্পকে একসঙ্গে গেঁথে এক জমির উপর বুনে দিয়েছেন এবং সে জমির রং এমন নূতন ধরণের যে, তাতে প্রত্যেক গল্পের রং নূতন সৌন্দর্য্য ও সজীবতা লাভ করেছে। সেই সন্ধ্যায় অস্বাভাবিক মেঘ-চোয়ানো আলোতে কবিত্ব, আবেগ ও রসিকতা এমন ভাবে ফুটে পরস্পরের গায়ে মিশে গিয়েছে যে, সাধারণ দিনে আলোতে তা কখনই হ'তে পারতো না।

তার পর বন্ধুদের গল্প আরম্ভ হবার আগেই লেখক তাঁদের চালচলন ও কার্য্যকলাপের এ রকম আভাষ দিয়েছেন, যাতে তাঁদের পরবর্ত্তী কথাবার্ত্তায় আমাদের মনে একটা চমক, কৌতূহল ও আগ্রহ এনে দেয়। প্রথমেই মনের মধ্যে এই ধারণা এসে পড়ে যে, তাঁরা অনেকটা চিন্তাশূন্য, এমন কি, যাকে "ফূর্ত্তিবাজ" বলে, সেই প্রকৃতির লোক। কিন্তু গল্পের সূচনা থেকেই দেখতে পাই, তাঁরা ভিতরে ভিতরে অন্য প্রকৃতির লোক-তাঁদের মনের স্তর সাধারণ লোকের মনের স্তর হ'তে অনেক উঁচু।

প্রমথ বাবুর আর্টের আর এক পরিচয় তাঁর গল্পের উপসংহারে। এমন অপ্রত্যাশিত অথচ সন্তোষজনক পরিসমাপ্তি অতি অল্প বাঙ্গালা গল্পেই দেখেছি; এর ফলে কোথাও হাস্য, কোথাও করুণ, কোথাও বা বিস্ময় রস এসে মূল রসকে তীব্রতর ক'রে তুলেছে। যাঁরা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরাই জানেন, ব্যভিচারী ভাবের সাহায্যে স্থায়ী ভাবের পোষকতা কাব্যের কত উৎকর্ষজনক।

লেখক তাঁর চরিত্রগুলির সম্বন্ধে নিজে কিছুই বলেন নি—তাদের মুখ দিয়েই তাদের কথা বলিয়েছেন। এতে তিনি নিজের উপর এমন একটা কঠিন কাজের ভার নিয়েছিলেন, যা কোন অল্পশক্তি শিল্পী কখনই নিতেন না। তাঁকে প্রত্যেক বক্তার ভাষা ও ভঙ্গিতে স্বতন্ত্র ও বিশেষভাবে সেই বক্তারই উপযোগী করতে হয়েছে। এই জন্যে সোমনাথের গল্পের ভাষা যেমন উপমা-প্রাণ ও উন্নত; রায়ের গল্পের ভাষা তেমনি সহজ ও আড়ম্বরহীন; কারণ, রায়ের গল্প একজন অর্দ্ধশিক্ষিতা পরিচারিকার সঙ্গে কথাবার্তা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

শব্দ-নির্ব্বাচন ও বাক্যগঠনেও লেখক যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন; কিন্তু তা দেখ্‌তে হ'লে খুব অভিনিবেশের সঙ্গে গল্পগুলি পড়া দরকার; কেবল গল্পের খাতিরে ভাসা ভাসা পড়্‌লে, তা চোখে পড়বে না। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্‌। "সূর্য্য অস্ত গেলেও তার পশ্চিম আলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেঘের গায়ে জড়িয়ে থাকে"। এখানে 'পশ্চিম' শব্দটি বসাবার আগে লেখককে বোধ হয়, তুল্যার্থ-বোধক অনেক শব্দকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। 'পরিত্যক্ত' 'নিরাশ্রয়' 'প্রবাসী' বা ঐ রকম অন্য কোন শব্দ ব্যবহার কর্‌লে বোধ হয়, লেখকের উদ্দেশ্য অত সফল হ'ত না। 'পশ্চিম' শব্দে যেমন পশ্চিম আকাশকে সূচনা করে, তেমনি পশ্চাৎপদ অতএব দলভ্রষ্ট এ ভাবটিও মনের মধ্যে এনে দেয়।

গল্পের প্রাণ বস্তুতন্ত্রতা; কিন্তু সে বস্তুতন্ত্রতার অর্থ এ নয় যে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের নিখুঁত ও নির্ভুল তালিকা দিতে হবে। কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ এই যে,—এ রকম ভাবে বর্ণনা করতে হবে—যাতে বর্ণনার বিষয় চোখের সাম্‌নে জীবন্ত ও জাগ্রত হয়ে ওঠে। এ উৎকর্ষের পরিচয় প্রমথ বাবুর গল্পে যতটা পেয়েছি, এত আর কোন গল্পলেখকের লেখায় পেয়েছি কি না সন্দেহ। চন্দ্রালোকে গঙ্গাতীর, বর্ষার দিনে বিলাতের রাস্তা প্রভৃতি দৃশ্যের তুলনা নেই। তিনি দু একটি বর্ণের সাহায্যে, দু একটি তুলির আঁচড়ে কেমন সুন্দর চিত্র আঁকতে পারেন, নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি হতেই তা প্রতিপন্ন হবে।

(১) জাহাজের গড়ন যে এমন সুন্দর, তা আমি পূর্ব্বে কখনো লক্ষ্য করি নি।

মনে হ'ল যেন, কোন সাগরপারে রূপকথা-রাজ্যের বিহঙ্গম ও বিহঙ্গমীরা উড়ে এসে এখন পাখা গুটিয়ে জলের উপর শুয়ে আছে—এই জ্যোৎস্নার সঙ্গে সঙ্গে আবার পাখা মেলিয়ে নিজের দেশে ফিরে যাবে।"

(২) "এ গন্ধ ফুলের নয়, কেন না, ফুলের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়, আকাশে হারিয়ে যায়,·········কিন্তু এ সেই জাতীয় গন্ধ যা একটি সূক্ষ্ম রেখা ধরে ছুটে আসে, একটী অদৃশ্য তীরের মত বুকের ভিতর গিয়া বেঁধে।"

(৩) "গলা থেকে পা পর্য্যন্ত আগাগোড়া কালো কাপড়পড়া একটি স্ত্রীলোক লেজে ভর দিয়ে সাপের মত ফণা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।"

(৪) "এখানে ওখানে সব জলের টুক্রো টাকার মত চক্‌চক্ করছে, পারার মত চল্‌চল্ করছে।"

গল্প চারটীর ভাষার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাক্‌লেও, তার প্রত্যেকটিই ফরাসী-রীতিতে লিখিত; লেখক যে ফরাসী রচনা-পদ্ধতিকে হুবহু নকল করেছেন, তা বল্‌ছি না, তবে তাঁর ভাষার উপর ফরাসী রচনার প্রভাব নদীবক্ষে মেঘের ছায়ার মত পতিত হয়েছে—তার ফলে গল্পগুলির ভিতর একটা হাল্কা স্বচ্ছন্দ-গতি আগাগোড়া বিদ্যমান। সামান্য ঘটনাকে অসামান্য কথার আড়ম্বরে ফেনিয়ে ফেনিয়ে তিনি দীর্ঘ করেন নি;—তাঁর গল্পগুলি পার্ব্বত্য ঝরণার মত ঘটনা হতে ঘটনায়, উত্তর হতে প্রত্যুত্তরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে এবং উৎক্ষিপ্ত বারিপুঞ্জে বর্ণালোকের মত নানা চিত্র ও নানা মনোভাব তাকে স্থানে স্থানে রঞ্জিত ক'রে রেখেছে। মোটের উপর চার-ইয়ারী-কথা ছোট গল্প সাহিত্যে এক নূতন সম্পদ এনে দিয়েছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

পান্থের প্রতি

(হাফেজ হইতে)

ভঙ্গুর-মূল সৌধ আশার,
নশ্বর আয়ু. ভিত্তি যাহার
রচিত চপল পবনে ;
এস চলে' এস ছাড়ি সে ভবন,
চাহ যদি তুমি অমর-জীবন
আন প্রেম-সুরা করি আহরণ
বন্ধুর লাগি গোপনে। ১ ॥
তাহার বালাই নিয়ে মরে' যাই,
তাহার চরণে আপনা বিকাই,
স্বাধীন যাহার জীবনে
নীল আকাশের না ফুটে নীলিমা,
রূপরসাদির রক্ত-গরিমা
রঞ্জিতে নারে শুভ্র-মহিমা
আসক্ত-রাগ-কিরণে। ২ ॥
শুন ভাই! শুন, হয়ো না বধির,
কানে কানে মোর কহিয়াছে পীর
পান্থ-শালায় স্বপনেঃ—
"সুন্দরী এই বৃদ্ধা ধরার
আশ্বাসে বুক বাঁধিও না আর,
শত শত পতি জান না কি তার
বধিল বাসর-শয়নে ? ৩ ॥
কেন বিহঙ্গ ঊর্দ্ধ-নয়ন!
ভুলিলে কল্প-বৃক্ষ-ভবন
বিহরি নিম্ন ভুবনে ?

ভ্রমিলে ধরণী সুখের আশায়,
সুখ না মিলিল, শ্রান্ত হিয়ায়
বিশ্রাম কভু মিলে কি ধরায়
বসিলে ক্লান্ত চরণে ? ৪ ॥
ছিঁড়ে ফেল এই বাগুরা মায়ার,
শোন স্বরগের মধুঝঙ্কার
আবাহন-ধ্বনি শ্রবণে ;
সংসার-দাব-দহন কি আর
পারিবে দহিতে হৃদয় তোমার ?
অযাচিত দান সে যে বঁধুয়ার,
লহ শির পাতি যতনে। ৫ ॥
আজি গো ললাট হইতে তোমার,
গ্রন্থি মোচন কর ভাবনার,
বন্ধুর দয়া স্মরণে ;
মুক্ত করিতে মুক্তির দ্বার,
বন্ধুর করে চাবিটি তাহার,
স্বাধীনতা হ'তে অধীনতা তাঁর
সন্তোষ দানে মরমে। ৬ ॥
মধুর মধুর হাসে যদি গুল্,
সে শুধু ভুলাতে তোরে বুল্‌বুল্ !
বাঁধিতে মোহের বাঁধনে ;
হাসির ফাঁসিতে জড়ায়ো না আর,
উধাও উধাও ধাও অনিবার,
যাবত না মিলে চুম্বন সার
বন্ধুর মধু-বদনে। ৭ ॥

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

নির্লোকসারচিন্তামণি

উপরে যে পুথিখানির নাম করা হইল, তাহা একখানি সহজিয়া ধর্ম্মের পুথি। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় যে সকল পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ইহা পাওয়া গিয়াছে। বইখানির নাম ইতিপূর্ব্বে সাহিত্যিক মহলে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বটতলায় ছাপা হইয়াছে কি না, নিঃসংশয়ে বলা যায় না। পুথিখানির যে প্রতিলিপি আমরা পাইয়াছি, তাহা বেশী দিনের পুরাণ নহে—১২৬০ সালে নকল করা হইয়াছিল। নকলকারী শ্রীরামচন্দ্র সেন গুপ্ত ও শ্রীবিশ্বম্ভরদাস অধিকারী। ইহাঁরা ২৫শে কার্ত্তিক, জগদ্ধাত্রী-পূজার দিনে বেলা আন্দাজ দুই প্রহরের সময় নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া লেখা শেষ করেন। মূল পুথিখানি যে কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। সে কালে বোধ হয়, পুথি-চোরের উপদ্রব খুব বেশী ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ পুথির শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়—

"লিখিতং বহুযত্নেন চৌরঞ্চ নীয়তে যদি।
তস্য মাতা চ স্থকরী পিতা তস্য চ গর্দ্দভঃ॥"

পুথিখানি ১ হইতে ৫৬ পাতায় শেষ হইয়াছে। প্রতি পৃষ্ঠায় পংক্তিবিন্যাসের কোন ধারাবাহিক নিয়ম নাই। দুই জনের হাতের লেখা ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ১—৫২ পর্য্যন্ত পাতাগুলি এক আকারের; শেষের চারিটি পাতা আগের পাতার চাইতে চওড়ায় কম। কাগজ বেশী দিনের পুরাণ না হইলেও অযত্নে কয়েকটি পাতার ধার পোকায় কাটিয়াছে। অনেক ভুল থাকিলেও হাতের লেখাটি মোটামুটি মন্দ নহে। অন্যান্য সহজিয়া পুথির ন্যায় ইহারও রচয়িতা কৃষ্ণদাস। যথা—

"শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে জার আস।
নির্লোকসারচিন্তামণি কহে কৃষ্ণদাস॥"

পুঁথির প্রতিপাদ্য বিষয় সহজিয়া ধর্ম্ম। বক্তা মহাপ্রভু, শ্রোতা সনাতন গোস্বামী। মহাপ্রভু যখন প্রয়াগে গিয়াছিলেন, তখন সনাতন আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু যাহা বলেন, এই গ্রন্থে কৃষ্ণদাস তাহাই সঙ্কলন করিয়াছেন। যথা—

"প্রয়াগে প্রভুর সহে মিলি সনাতন।
প্রভুর কৃপাদৃষ্টে পাইলা প্রভুর চরণ॥

প্রভু আলিঙ্গন কৈল শক্তি সঞ্চারিয়া।
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী করে নিভৃতে বসিয়া॥

* * * *

সনাতনে শিক্ষা দিলা প্রয়াগে বসিয়া।
সেই সব তত্ত্ব স্থন কহি বিবরিয়া॥"

পুথির আরম্ভে মহাপ্রভুর নমস্কার-শ্লোক এবং প্রতি প্রকরণের প্রথমে "জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়" ইত্যাদি পয়ার আছে। এই পুথির রচয়িতা কৃষ্ণদাস এবং চৈতন্যচরিতামৃতের লেখক কৃষ্ণদাস, পাছে এই উভয় লেখককে কেহ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, এই জন্য ইনি বলিতেছেন,—

"চৈতন্যচরিতামৃত করিয়াছি বর্ণন।
গুরুভক্তি কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা(র) কারণ॥"

ইহার পর মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

"এই সব তত্ত্বকথা স্থন সনাতন।
নাম মন্ত্রে কৃষ্ণপ্রাপ্তি না হয় কথন॥"

এইখান হইতেই মহাপ্রভু বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং সনাতন শুনিতে লাগিলেন। অপরাপর সহজিয়া বইতে যে রকম অশ্লীলতা ও রসের ছড়াছড়ি, এই পুথিখানিতেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। স্থানে স্থানে এত বাড়াবাড়ি যে, তাহা তোলা মোটেই নিরাপদ্ নহে। ১২টি প্রকরণে পুথিখানি শেষ হইয়াছে। প্রথম উপাসক-সাধ্য প্রকরণ, ইহাতে তত গোলের কিছু নাই। উপাসকের কিরূপ উপাসনা কর্ত্তব্য, বৈধী ভক্তি, কর্ম্মকাণ্ড, বেদবিধি—এ সকল কিছুই নহে, ব্রজে শ্রীমতীর চরণপ্রাপ্তিই মুখ্য উদ্দেশ্য, এ জন্য মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, কামবীজ, কামগায়ত্রী এবং নায়িকা-সাধনের শ্রেষ্ঠতা ও উপায় এই প্রকরণে বলা হইয়াছে। শেষে নায়িকার বর্ণনাটি মন্দ নহে, কিন্তু আধুনিক রুচি-সম্মত নহে বলিয়া তুলিলাম না। প্রকরণের শেষে মহাপ্রভু বলেন,—

"জীব যদি স্থনে ইহায় হয় সর্ব্বনাশ।
বৈধী ভক্ত স্থনিলে করয়ে উপহাস॥
বৈরাগী বৈষ্ণব বৈধী এই না লইব।
থাকু বলিবার কার্য্য নিন্দা সে করিব॥"

১২ পাতার ১ম পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকরণ শেষ এবং দ্বিতীয় প্রকরণ আরম্ভ। প্রকরণের আরম্ভেই সনাতন মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করিতেছেন,—

"সনাতন কহে প্রভু শুন দয়াময়।
বিস্তার করিয়া কহ ঘুচুক সংশয়॥
সামান্য শৃঙ্গার কিম্বা কহিবে আমারে।
প্রেমের শৃঙ্গার কহ কোন তত্ত্বসারে॥"

প্রশ্নের নমুনা দেখিয়াই বোধ হয়, পাঠকগণ এই প্রকরণের আলোচ্য বিষয় কি, তাহা বুঝিয়াছেন। আপনাদের মধ্যে যদি কেহ রসিক থাকেন, তবে তিনি ইহা "অন্তরে" বুঝিয়া লইবেন। অপরের বুঝিয়া কাজ নাই। ৩য় প্রকরণের প্রথম কতকটা একটু পদে আছে। এখানে গ্রন্থকর্ত্তা বলেন,—

"তবে সনাতন কহে শুন দয়াময়।
ভক্তিতত্ত্ব শুনিতে কিছু ইচ্ছা হয়॥"

কিন্তু এই ভক্তিতত্ত্বের বিশুদ্ধতা গ্রন্থকার বেশী দূর রাখিতে পারেন নাই। খানিক পরেই একটি নায়িকাকে আনিয়া ইহার সহিত মিশাইয়াছেন। চতুর্থ প্রকরণটি সংক্ষিপ্ত; তেমন কিছু নাই; সংক্ষেপে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-তত্ত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। পঞ্চম প্রকরণটি একটু কৌতূহলজনক। কেন না, এই প্রকরণে দশরথের পুত্র রামচন্দ্রকে আমরা সহজ-সাধনে রত দেখিতে পাই। সীতাহরণের ব্যাপারটিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়া গ্রন্থকার তাঁহাদের সহজ-রসের কথা বর্ণন করিয়াছেন। তবে তাঁহার এই সহজ সাধন 'স্বকীয়া'তেই হইয়াছিল; রামচন্দ্রের মত একপত্নীব্রত পুরুষে 'পরকীয়া' আরোপ করিতে বোধ হয়, গ্রন্থকারের সাহসে কুলায় নাই। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই,—রামচন্দ্র মারীচ বধে গমন করিলেন; কিছু দূর গিয়াই জানকীর মন বুঝিয়া, তাঁহার ছায়াকে মারীচ-বধে নিযুক্ত করিয়া, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। জানকীও কুটীরে নিজের একটি ছায়া রাখিয়া রামের সহিত মিলিত হইলেন, এবং দুইজনে সহজ-রসে মগ্ন হইলেন। এ দিকে রাবণ আসিয়া সীতার ছায়াকে হরণ করিল এবং রামের ছায়া মারীচকে বধ করিয়া, লঙ্কায় গিয়া রাবণকে যমালয়ে পাঠাইল। খাঁটি রাম-সীতা বা লক্ষ্মণের কিছুই হইল না; তাঁহারা ঐ সময়ে পঞ্চবটীর কোনও গুপ্ত স্থানে সহজ-সাধনে রত ছিলেন! রাবণ-বধের পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন মুনিগণ গিয়া তাঁহার নিকট বর চাহিলেন। কি বর চাহিলেন, তাহা কবির ভাষায় শুনুন—

* * মুনিগণ সভে তপস্যা করিঞা।
তপ অন্তে রামচন্দ্রে দর্শন পাইঞা॥
সহজ প্রার্থনা তারা মাগিলেন বর।
কায়িক ভজন বর দেহ গদাধর॥

এ দেহ সপিব মোরা নিগু'ণ হইয়া।
নিগু'ণীর সঙ্গ পাব গুণী তেয়াগিয়া ॥"

রামচন্দ্র ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

"সুনিয়া কহিলা রাম গুণধারী হঞা।
কিরূপে পূরিব বাঞ্ছা গুণযুক্ত কায়া ॥
দ্বাপরের শেষে কৃষ্ণ প্রকাশ করিব।
আমি নিগু'ণীর সঙ্গে গুণহীন হব ॥
সেই মুনিগণ আসি গোকুল নগরে।
হইল গোপের কন্যা গোয়ালার ঘরে ॥"

আর অধিক তুলিবার আবশ্যক নাই। ইহার পরে কোন্ কোন্ মুনি কি কি নামে গোপ-ঘরে জন্মিলেন, কাহার কি রূপ, কাহার কি গুণ, এই সকলের বর্ণনা করিয়া, কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের সহজ-সাধন এবং রাসক্রীড়ার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। পরিশেষে কৃষ্ণের ননীচুরী, বৃন্দাবনের বর্ণনা, মানুষ-তত্ত্ব এবং তাহার মহিমা, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন,—

"এই গ্রন্থ গোপনেতে রাখিবে ভক্তগণ।
ব্যক্ত হৈলে বস্তু নাহি হবেক ভজন ॥
অতি গুহ্য কথা এই সুন ভক্ত ভাই।
প্রকাশ করহ যদি রাধার দুহাই ॥
মাতৃজারক করি রাখিবে অন্তরে।
যোগ্যপাত্র জানি ইহা সুনাইবে তারে ॥

৬ হইতে ১০ম প্রকরণে কোন বিশেষত্ব নাই। এইগুলিতে সহজধর্ম্মের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, মানুষ-ধর্ম্ম, তাহার লক্ষণ ও প্রকার-ভেদ, 'পীরিতি' কাহাকে বলে, তাহার ভাবব্যাখ্যা ও মর্ম্ম প্রভৃতি সহজ-ধর্ম্মের অনেক জানিবার, শুনিবার ও বুঝিবার কথা বলা হইয়াছে। এই সমস্ত তুলিয়া প্রবন্ধ বাড়াইবার কোন প্রয়োজন দেখি না। প্রতি প্রকরণের শেষেই ঐ সকল বিষয় খুব গোপনে রাখিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। একাদশ প্রকরণে চণ্ডিদাসের সহজ-সাধন কথার বর্ণনা আছে। চণ্ডিদাসের নায়িকা রজক-ঝিয়ারী রামী কিন্তু এই নাম ছাড়া কানুদাস ও চণ্ডিদাসের পদে তাহার 'রামতারা' ও 'তারা' নামও পাওয়া গিয়াছে। এই পুথিখানিতেও 'তারা' নাম পাইতেছি,—

"তারা নামে রজকিনী ছিল এক জনা।
গুণে বর্ত্তমানে (মূর্ত্তিমান্?) গুণ রূপে কাঁচা সোনা ॥"

ইহার পর রাজা শিবসিংহ, লছিমা দেবী ও বিদ্যাপতির উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"রাজা শিবসিংহ ভক্ত কৃষ্ণপদে রত।
লছিমা তাহার রাণী অতি রূপবন্ত॥"

*   *   *   *   *

তাহার আশ্রয়ে হৈলা কবি বিদ্যাপতি।
অষ্টাক্ষর মন্ত্র দিয়া আপুনি শ্রীমতী॥ ইত্যাদি।

এই সাধনার কথা বোধ হয়, অনেকেই জানেন। তাই বেশী উদ্ধার করিলাম না। তার পর সনাতন মহাপ্রভুর নিকট প্রশ্ন করিতেছেন,—

"সনাতন কহে প্রভু কহিবে আমারে।
আর কেবা নিজ ভাবে কৃষ্ণভাব করে॥
প্রভু কহে লীলাশুক মহাকবিবর।
কর্ণামৃতে লিখিলেন ইহার উত্তর॥"

এইরূপে দেখা যায়, তীব্র বৈরাগ্যশালী বিল্বমঙ্গল ঠাকুরও ইহাদের হাতে পড়িয়া সহজিয়া হইয়া গিয়াছেন। দ্বাদশ প্রকরণের নাম স্ববিলাস-বর্ণন। পুথির শেষে একটি সূচী আছে, কোন্ প্রকরণের কি কি বিষয়, তাহাতে তাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। ইহার পরেই পুথি শেষ হইয়াছে।

সহজিয়া-সাহিত্যের খবর এ পর্য্যন্ত খুব বেশী পাওয়া যায় নাই বলিয়া সংক্ষেপে পুথি-খানির পরিচয় দিলাম। পুথিগুলি যতই অশ্লীলতা-মাখা হউক না কেন, ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে বোধ হয়, ইহাতেও অনেক জানিবার মত জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে। পণ্ডিতেরা যে সকল বিষয় লইয়া অনবরত মাথা ঘামাইয়াও কোন কূল-কিনারা করিতে পারেন না, ইহার কোন এক পাতার কোন এক কোণের একটি শব্দে হয় ত তাহার মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে। এই হিসাবে এ সকল পুথিও আমাদের উপেক্ষা করা উচিত নয়। ইহা ছাড়া আরও একটি বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার। আধুনিক সহজিয়া ধর্ম্ম যে, বৌদ্ধ সহজ-যানের পরিণতি, তাহা মোটামুটি এক রকম স্থির হইয়াছে। কিন্তু কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনা-চক্রে পড়িয়া ইহা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার বিস্তৃত অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। আমরা আগে জানিতাম, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবই সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টিকর্ত্তা। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত বৌদ্ধ গান ও দোহা গ্রন্থে দেখিতেছি যে, মহাপ্রভুর অনেক আগে বৌদ্ধেরা বাঙ্গালায় পদ বাঁধিয়া, খোল-করতাল লইয়া কীর্ত্তন করিত। সুতরাং বলিতে হয়, বৌদ্ধরাই সঙ্কীর্ত্তনের

সৃষ্টিকর্ত্তা এবং চৈতন্যদেব তাহাদের নিকট হইতেই উহা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে দেখা যায়, বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মেও কিছু বৌদ্ধ-গন্ধ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আজকালও যে বাঙ্গালী-জীবনের প্রত্যেক পরতে পরতে বৌদ্ধ ভাব ঢুকিয়া রহিয়াছে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। সুতরাং সহজিয়া-ধর্ম্মকে অশ্লীল বলিতে পারি, কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পরিণতি বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারি না।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শেষ বেলায়।

আজ্‌কে পথিক ছাড়া পেলে
প্রখর দিনের শেষ বেলায় ;
এবার বল নাম্‌বে তুমি কোন্ খেলায় ?
কোন্ আকাশের তলে তলে
কোন সাগরের জলে জলে
খুল্‌বে আবার আজ্‌কে তুমি কোন্ ভেলায় ?
এই প্রখর দিনের শেষ বেলায় !

পথিক কি গো আশ মিটেছে
জীবন-তরীর দোল্ দোলায় ?
আশ মিটেছে জীবন-দোলের রাস-লীলায় ?
এবার মরণ-কুঞ্জ-কোণে
লুকিয়ে যাবে সঙ্গোপনে,
শেষ ক'রে কি নেবে তোমার এই মেলায় ?
পথিক কি গো আশ মিটেছে
জীবন-দোলের রাস-লীলায় ?

আবার যখন ভোর বেলায়
ডাক্‌বে তোমায় জীবন-বাঁশীর সুর-লীলায়,
ওগো পথিক ভোর বেলায়!
কুঞ্জবনে ফুট্‌বে গো ফুল,
গন্ধে বাতাস হবে আকুল,
তখন তোমার হৃদয় ওগো মাত্‌বে না কি সেই খেলায়?
ওগো পথিক প্রভাত-বায়ে
জীবন-বাঁশীর সুর-লীলায়!

পথিক কহে—নয় গো নয়,
আশ মেটেনি আমার জীবন-তরীর শত দোল্‌-দোলায়,
ফির্‌বো আবার ভোর বেলায়
জীবন-বাঁশীর সুর-লীলায়।
মনের বনে ফুটিয়ে ফুল,
গন্ধে হিয়া করি' আকুল,
আবার গো মিল্‌ব এসে জীবন-দোলের রাস-লীলায়।
ফির্‌ব আবার ভোর বেলায়!

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ছেঁড়া ফুল

ঠিক ছবির মত একখানি ছবি! এক পাশ দিয়া পার্ব্বত্য নদী নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। বিশাল পর্ব্বত-বুকে খরস্রোতা, উদ্দাম উচ্ছল ও অবিরাম নৃত্যশীলা। নদীর তীর ধরিয়া পার্ব্বত্য পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া উপত্যকায় গিয়া পড়িয়াছে। দূরে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের তুঙ্গ শীর্ষ মেঘে মেঘে ঘোর করিয়া আছে। কাছে পার্ব্বত্য শ্বেতমল্লিকা ও গোলাপ বনের রঙ ও গন্ধে ছবিখানিকে যেন প্রাণের হাসি দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে।

শরতের সন্ধ্যার অস্ফুট আলোকে দূর-বন ঘোর নীলাভ হইয়া ক্রমশঃ সন্ধ্যার রঙের সঙ্গে মিলাইয়া গেল। পর্ব্বতের পাদদেশে নদীতীরে দুইটা তাঁবু পড়িয়াছে। তাঁবুর বাহিরে—সন্ধ্যালোকে তুর্কীসেনা বিশ্রাম করিতেছিল। কেহ বা এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতেছিল। তুর্কী সেনার অধিকাংশই অল্পবয়স্ক ও অর্দ্ধশিক্ষিত। কেহ বা চটুল গানে সমবয়স্কের চোখে মুখে চটুল রসের হাসির ফোয়ারা ফুটাইয়া তুলিতেছিল, কেহ বা নিকটস্থ গ্রামের ভিতরে গিয়া সদ্য-বিজিত পার্ব্বত্য জাতির ভয় জাগাইয়া নানা অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছিল। একে তাহারা জঙ্গী জোয়ান, তার উপর ওই পার্ব্বত্যজাতিকে তাহারা দমনে রাখিতে আসিয়াছে, অর্দ্ধ-শিক্ষিত বিজেতার স্বভাবই এই।

প্রকৃতির বুকের উপর এমনি করিয়া মানুষের অভিনব খেলা চলিতেছিল। একদিকে বিজেতার অত্যাচার, অন্যদিকে বিজিতের রক্তহীন পাণ্ডু-মুখের রূঢ় কঠোর নীরস শুষ্ক হাসি। কখন কখন বা চাপা অস্ফুট করুণ সুরের গান 'মৌন' সন্ধ্যাকে মুখর ও বেদনাতুর করিয়া তুলিতেছিল। নাসপাতির বাগানে, আঙুরের বনে, হাওয়া ওলট-পালট খাইতেছিল, বুলবুল তীব্র সুরে ডাকিতেছিল। গ্রামের প্রান্তে বৃক্ষতলে সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে প্রতিদিন একটি ছোট বাজারের মত বসিত। ছোট ছোট ঘর, পাতায় ঢাকা, দ্বারে দ্বারে দ্রাক্ষালতার ঝোপ! তাহারি সম্মুখে বৃক্ষতলে ছোট ছোট দোকান। তুর্কী সেনাগণ সেইখান হইতে অনেক জিনিস ক্রয় করিত। একটি খোঁড়া বুড়া, বয়স অনেক হইয়াছিল, সে ফল বিক্রয় করিত, আর তাহার কন্যা ফুল বিক্রয় করিত। বৃদ্ধের আবক্ষ শ্বেতশ্মশ্রু, শিথিল পেশী, কোটরগত চক্ষু, শীর্ণ শিরা, কুঞ্চিত লোলচর্ম্মের পার্শ্বে ফুলের বাজরা লইয়া

সদ্য-ফোটা গোলাপের মত কন্যা দাঁড়াইয়া থাকিত। দেখিলেই মনে হইত, জরা ও যৌবনের মাঝে কি একগাছা মিনি সুতার মত আছে, যাতে এই দুইকে এক করিয়া রাখিয়াছে। এক বার্দ্ধক্যের কাতর ব্যথিত দৃষ্টি, অন্যে যৌবনের মুখর চঞ্চল চাহনি। বয়ঃসন্ধির বিদ্যুৎকটাক্ষ আপনি ফুটিয়া উঠিতেছে।

রোজই পিতা ও কন্যা একসঙ্গে আসিত, একসঙ্গে ফিরিত। দূর হইতে তুর্কী সেনার দল দেখিত, কখন আশে-পাশে ঘুরিত, কিন্তু বৃদ্ধের সেই কাতর দৃষ্টির ভিতর কি অগ্নি ছিল, তাহাদের মনের চাঞ্চল্য হইলেও, কেমন যেন ভয়ে অগ্রসর হইত না।

একদিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধ আসিল না। কন্যা একাকিনী ফল-ফুল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ত্বরায় সৈন্যদল তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল।

কিশোরীর মুখে কোন চাঞ্চল্য ছিল না। স্থিরচক্ষু বিস্ফারিত, শুধু গাঢ় কাল তারকার স্বচ্ছ উজ্জ্বলতা ও ফুলের বাজ্‌রার পাশে যেন একটি আগোটা ডালশুদ্ধ গোলাপ।

"আজ তোমার বাবা কোথায়?"

"তাঁর বড় অসুখ।"

"তবে তুমিই বুঝি এখন থেকে ফল ও ফুল একসঙ্গে বিক্রী করবে?"

"হাঁ।"

একজন হাসিয়া বলিল, "ফুলেই ফলের বাসা।"...

"একজন হাসিয়া কতকগুলি ন্যাসপাতি ও দু থোলা আঙুর কিনিল; দাম দিয়া বলিল, "আজকের আঙুর রসে টস্‌-টস করছে, বুড়োর আঙুরগুলো শুখ্‌নো যেন কিস্‌মিস্‌ হয়ে থাকৃত।"

একজন তুর্কীসেনা দেখিতে অতি কদাকার। নাকের ডগাটা ছোরার মত বাঁকান—আর মুখের পরিমাণ অত্যন্ত বড়। চোখ দুটো ভ্রূর নীচে কোথায় যেন ঢুকিয়া গেছে ও চোখের কোলে কালশিরা পড়ার মত কালা ও নীল মাখান। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"এই ফুলটার দাম কত?"

"পয়সা জোড়া।"

"বাঃ, খুব সস্তা ত'—আর ওই রাঙ্গা ঠোঁটের একটি চুমুর দাম?"

কিশোরীর নয়নে আগুন খেলিয়া গেল। মুখ তুলিয়া বলিল, "তুর্কীর বুকের রক্ত।"

"ওঃ, বড় চড়া দাম বটে! কিন্তু আমি বুকের রক্ত দিয়েই কিনব!"

সহসা সেই তুরক মাংসাশী তরক্ষুর মত তাহার বাহু দ্বারা সেই কিশোরীকে সবলে

বেষ্টন করিয়া কিশোরীর রক্তপ্রবালের মত অধরে তীব্র আসক্তি-ভরা পিপাসার জ্বালা-ময় চুম্বন করিল।

কিশোরীর ঠোঁট দুখানি নীল হইয়া গেল। সে ধীরভাবে বলিল, "কই, ফুলের দাম নিতে কিন্তু ভুলে গেছেন।"

"তাই ত—হা হা! এই নাও! এই নাও!...কিন্তু চুমুর দাম নিতে তুমিও ভুল্‌লে যে!"

"না, তা ভুলি নি।"

কিশোরী তাহার রঙ্গিন জামার জেবের ভিতর পয়সা দুটি রাখিয়া আপেল গাছে হেলান দিয়া একটু হাসিয়া দাঁড়াইল। সৈনিকগণ হাস্য-কলরোল তুলিয়া চলিয়া গেল। দূর-পর্ব্বত হইতে ঘরমুখো রাখাল বালকের তীব্র উচ্চ কণ্ঠের সঙ্গে বাঁশীর রাগিণী বাজিয়া উঠিল। উপত্যকা অন্ধকারের গাঢ় ছায়ায় ঢাকিয়া গেল।

পর দিন প্রাতে যখন তুর্কী সেনার হাজিরী লওয়া হইতেছে, তখন দেখা গেল, এক-জন অনুপস্থিত। সেনাপতি আদেশ করিলেন, "সে আসিলেই তাহার অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাকে বন্দী করিবে।"

আর কয়জন মিলিয়া অশ্বারোহণে খুঁজিতে বাহির হইলেন।

সেনানিবাস হইতে কিছু দূর গিয়াই, পার্ব্বত্য পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া গেছে, সেইখানে একপার্শ্বে পর্ব্বত অতি উচ্চ। পার্শ্ব দিয়া একটি নির্ঝর ঝর্‌ঝর্ পড়িতেছে। অগ্রগামী স্বয়ং সেনাপতি অকস্মাৎ থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। চাৎকার করিয়া বলিলেন, "নাদির! ও কি ওখানে?"

সকলে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, সেই তুর্কী সেনানী পড়িয়া। চক্ষু তাকাইয়া আছে, পলক পড়ে না, মুখ সাদা হইয়া গেছে। বক্ষ দীর্ণ, রক্তে পরিচ্ছদ রঞ্জিত—বক্ষের কপাট উন্মুক্ত—তাহাতে হৃৎপিণ্ড নাই। মরণ তাণ্ডব-নৃত্যে যেন তাহাকে দলিয়া গিয়াছে।

রোষে তুর্কী সেনাপতি কর্কশ শ্মশ্রু-গুম্ফ নাড়িয়া, নাসিকা স্ফীত করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

দুই জন ঝোলা লইয়া আসিয়া মৃতকে সেনানিবাসে তুলিয়া লইয়া গেল।

সেনাপতি বলিলেন, "নাদির! যাও, সকলকে সেনানিবাসে ত্বরায় উপস্থিত হ'তে বল গে।"

বিদ্যুতের মত এই সংবাদ সকলের কাছে চমকাইয়া উঠিল। বিজয়ী তুরক্ সৈন্য প্রতিশোধের জন্য আল্লার নামে শপথ করিল। সে শপথ নিরীহ পার্ব্বত্য গ্রামে বজ্রের মত কড়কড় করিয়া উঠিল।

সেনাপতি সেই তুরুকের সঙ্গে ফলওয়ালীর চুম্বনের কথা সব শুনিলেন,

কিশোরীর চুম্বনের মূল্যের কথাও শুনিলেন। গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িল।

কিশোরীকে ধরিয়া আনিতে আদেশ হইল।

দলে দলে গ্রাম্য যুবকদের ধরিয়া আনা হইয়াছে। তাঁবুর সম্মুখে সার দিয়া দাঁড় করান হইয়াছে।

তুর্কী সৈন্যগণের চোখে আগুনের হল্‌কা উঠিতেছিল। কিশোরীকেও সৈন্যরা ধরিয়া আনিল।

সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই? এই?…তোর মুখে ও চুমু খেয়েছিল?"

"হাঁ।"

"তুই তাকে কি বলেছিলি?"

"সে চুমুর দাম জিগ্‌গেস্ করেছিল, আমি বলেছিলুম, তুর্কীর বুকের রক্ত।"

"তা হ'লে কে মেরেছে, তুই জানিস্?"

"হাঁ, আমি জানি, কে মেরেছে।"

"যা, তোকে দু ঘণ্টা সময় দিলুম, এখুনি তাকে খুঁজে এনে দে, যদি সে না আসে, তবে ওই সব দাঁড় করিয়ে রেখেছি, সব গুলী কর্‌ব।"

"হাঁ," বলিয়া কিশোরী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সৈন্যগণ আবার তাহাকে দুই চারটা ইতর ভাষায় গাল ও রসিকতা শুনাইল।

এদিকে গ্রামের সকল যুবককেই প্রায় ধরিয়া আনিয়াছে। সকলেই মরণের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কিশোরী ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বুড়া বাপ শেষ নিশ্বাস ফেলিয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াছে। চক্ষু মুদিত, বেদনার আর কোন চিহ্নও নাই। মৃতের শিয়রে একজন দীর্ঘাকার সুন্দর যুবা দাঁড়াইয়া, চক্ষু অশ্রুসিক্ত।

কিশোরী বলিল,—"মুরাদ! বাবাকে কবর দিয়ো তবে—আমি আসি।"

"মতিয়া!" তাহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ…স্বর গভীর ও উদ্বেলিত।

"না— ফুলের বাক্‌রা নষ্ট হইয়া গেছে!"

চারি চোখের মিলনে আগুন ঝলসিয়া উঠিল।

ধীর অচঞ্চল পদক্ষেপে মতিয়া চলিয়া গেল।

মুরাদ একবার দ্রুত ছুটিয়া গিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, আবার থামিয়া নিজের বৃদ্ধ আঙ্গুল কামড়াইল।

মতিয়া সেনাপতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া, বুকের জামার ভিতর হইতে রক্তাক্ত ছুরিকা বাহির করিয়া কহিল, "আমি খুন করেছি!"

"তুই ? কেন, চুমু খেয়েছিল ব'লে ?"

"হাঁ ! সে চুম্বন অন্যের জন্য ছিল, সে জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছে। আমাদের অধিকার, আমাদের দেশ, আমাদের যা কিছু প্রিয়, সব নিয়েছে, শেষ অধরের যে সোহাগ, যে পবিত্রতা, সেটুকু পর্য্যন্ত নিলে, তাই হৃৎপিণ্ডের রক্তে তার দাম চুকিয়ে দিতে হয়েছে। আমিই খুনী !"

"আচ্ছা, এখন ওই ওষ্ঠাধরের পবিত্রতা ও মাধুর্য্য কেমন থাকে দেখ্‌ছি ? নাদির !"

সেনাপতি নাদিরকে কি বলিলেন। নাদির চলিয়া গেল।

মুহূর্ত্ত পরে নাদির লাল ডগডগে লোহার সাঁড়াসী লইয়া আসিল। দুইজনে মতিয়ার হাত জোর করিয়া ধরিয়া রহিল, একজন মস্তক দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। মতিয়া স্থির অচঞ্চল।

গ্রামবাসী যুবকদিগের মধ্য হইতে মুরাদ সিংহের মত লাফাইয়া পড়িল। তুর্কী সৈন্যাধ্যক্ষ সেই নিরস্ত্র যুবককে এক আঘাতে পাতিত করিলেন। মুরাদ বিষম আঘাতে পড়িয়া গেল।

ওদিকে হতভাগিনী মতিয়ার মুখ, ওষ্ঠ, অধর, কপোল সব ঝলসিয়া নীলমূর্ত্তি ধারণ করিল। আহতা সিংহিনীর মত একবার মাথা তুলিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

সেনাপতি বলিল, "যাও, এইবার আবার চুমুর দাম আদায় কর গে।"

স্খলিতচরণে মুরাদ একবার উঠিয়া মতিয়াকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হাতে গলা জড়াইয়া সেই দগ্ধ অধরে চুম্বন করিল।

পার্শ্বে পর্ব্বতগাত্রে বন-গোলাপের ডাল হইতে ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া গোলাপের পাঁপড়ি তাহাদের উপর ছড়াইয়া দিয়া, একটা দম্‌কা হাওয়া হা হা করিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

জীবন ও জীবনের ধর্ম্ম

জীবন,—বিশ্ব-জগতের চির-বাঞ্ছিত এই বাণী! কত আশা, উৎসাহ ও আনন্দ এই তিনটি অক্ষরের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে;—অনন্ত বিশ্ব জগতে এই জীবন-স্রোত নিত্য প্রবাহিত এবং অনন্ত বিশ্ব-জগৎ এই জীবনের জন্য লালায়িত। বস্তুতঃ আমরা সকলেই জীবনের জন্য লালায়িত বটে, কিন্তু জীবন যে কি, তাহা আমরা যথার্থ অনুভব করিতে পারি না এবং এই জীবন-স্রোত বিশ্ব-জগতে চির-প্রবাহিত বটে, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

অমরা জীবন চাই ও মৃত্যুর নামে শিহরিয়া উঠি—আমরা জীবনের দীপ্ত-আলোকের পশ্চাতে মৃত্যুর করালচ্ছায়া সর্ব্বদাই দেখিতে পাই এবং জীবনের জন্য ব্যাকুলিত হইয়াও মৃত্যুকেই সচরাচর আলিঙ্গন করিয়া থাকি। কিন্তু কি যে জীবন, কিই বা যে মৃত্যু, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। প্রিয়জনের উৎফুল্ল আনন প্রতিনিয়ত আমাদিগকে আনন্দ দান করিতেছে, এই তাহাকে দর্শন করিতেছি, এই তাহার মধুময় বাণী শ্রবণ করিতেছি, এই তাহার বক্ষঃ-স্পন্দন আমারই বক্ষঃস্পন্দনের সহিত একীভূতভাবে অনুভব করিতেছি, কিন্তু কোথা হইতে এক কৃষ্ণ-যবনিকা পতিত হইল, মুহূর্ত্তে সবই অন্তর্হিত। কোথায় সেই নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টি, কোথায় কণ্ঠে সেই শত আশাময় বাণী—কোথায় সেই বক্ষঃ-স্পন্দন! এই কি জীবন?—এই কি মৃত্যু? উভয়ের মধ্যে কোন্‌টাই বা সত্য?—জীবন অথবা মৃত্যু? আমরা ভাবিয়া আকুল হই, কিন্তু কি যে জীবন অথবা মৃত্যুই বা কি, তাহা আমরা যথার্থ উপলব্ধি করিতে অক্ষম। জীবন কি, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না, তাই মৃত্যুর নামে শিহরিয়া উঠি। পৃথিবীতে এক ব্যতীত দুই নাই, যাহা নিত্য সত্য, তাহাই চির-বর্ত্তমান। আলোকের অভাবই যেরূপ অন্ধকার, বস্তুতঃ অন্ধকারের কোনও পৃথক্ সত্তা নাই, সেই প্রকার জীবনের অভাববোধই মৃত্যু, বস্তুতঃ এই অনন্ত-প্রবাহিত জীবন-স্রোতে মৃত্যু-নামক কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। মৃত্যু আমাদের মনঃকল্পিত বিভীষিকা মাত্র, তদতিরিক্ত কিছুই নহে এবং এই মৃত্যু-বিভীষিকাই আমাদিগকে যথার্থ মৃতবৎ করিয়া থাকে।

আমরা জীবনের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু যথার্থ জীবনে জীবিত নহি। এই যে আমরা চলিতেছি ফিরিতেছি, প্রাণ-স্পন্দনে স্পন্দিত হইতেছি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সঞ্জীবিত হইতেছি, এই যে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-সংযুক্ত হইয়া যেন কাহারও করধৃত

পুত্তলিকার মত ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছি, ইহাই কি জীবন? এই কি জীবন, যে জীবনে জীবিত হইয়া, আমরা অর্থ-পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া একে অপরের সর্ব্বনাশ-সাধন করিতেছি, ভোগ-লালসায় অধীর হইয়া ইহ-পরলোক সকলই ভুলিয়া যাইতেছি, ক্ষণিক সুখের জন্য জানিয়া শুনিয়াও অনন্ত দুঃখের পথে অগ্রসর হইতেছি, এই কি জীবন? এই কি জীবন, যে জীবনে জীবিত হইয়া আমরা কর্কশ বাক্যে ও নিষ্ঠুর ব্যবহারে অপরকে সর্ব্বদাই ব্যথিত করিতেছি, আপনাকে সকলের শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া হাস্যকর দাম্ভিকতা প্রদর্শন করিতেছি, বাক্যে এক এবং কার্য্যে অন্য পথ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদাই আপনাকে মিথ্যার আবরণে আবৃত করিয়া রাখিতেছি—এই কি জীবন? এই কি জীবন যে জীবনে জীবিত হইয়া আমরা সর্ব্বদা মৃত্যু-ভয়ে কম্পিত হইতেছি এবং মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়াও নিজেই নিজের আত্মহত্যাসাধন করিতেছি,—এই কি বিশ্ব-লোক-বাঞ্ছিত জীবন? হায় দুর্ব্বল হৃদয়, এই কি তুমি অমর হইতে বাসনা কর? এই কি তুমি অনন্ত জীবনের জন্য লালায়িত?

জীবন যে কি, তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন তিনি—যিনি অসুরের বিরুদ্ধে দেবসংগ্রামের জন্য,—পাপের বিরুদ্ধে পুণ্যের বিজয়-লাভ জন্য অকাতরে আপন অস্থি দান করিয়াছিলেন, সেই লোক-পূজ্য দেব-বরেণ্য দধীচী মুনি। জীবন যে কি, তাহা যথার্থ তিনিই জানিয়াছিলেন—যিনি জরা, মৃত্যু ও শোক-পরিপূর্ণ সংসারে প্রাণিগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া করুণা-বিগলিত হৃদয়ে মুহূর্ত্তে ঐহিক সুখ-সম্পদ্ অকাতরে তুচ্ছ করিয়া, নানা প্রলোভন পরাজয় পূর্ব্বক ধ্যান-নিরত সমাধিস্থ হইয়া বিশ্ব-জগতের দুঃখের প্রতীকারের জন্য নির্ব্বাণ-সুধা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ শাক্যসিংহ। জীবন যে কি, তাহা যথার্থ জানিতেন তিনিই—যিনি বিপথগামী জীবগণের জন্য স্বর্গের সমাচার বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, যিনি নির্দ্দয় উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়াও উৎপীড়কগণের জন্য প্রার্থনা করিয়া গিয়াছিলেন এবং পরিশেষে ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া নিজের দেহাবসান করিয়া অনন্ত জীবনের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রাণ খৃষ্ট।

যথার্থ যে জীবন, তাহা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, আপনার তেজে আপনিই প্রদীপ্ত এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ যাহা কিছু তাহাকেও উত্তপ্ত করিয়া তোলে। যথার্থ যে জীবন, তাহা নিত্যপ্রবাহিত বায়ু-হিল্লোলের ন্যায় আপনি চঞ্চল এবং অপরকে চঞ্চলতা-প্রদানকারী। ওঠ, ছোট, হে মানব, অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান্ তোমার এই জীবন। যে দেহ দুষ্ট শতব্যাধি-রোগগ্রস্ত, তাহা যেরূপ দেহপদবাচ্য হইয়াও দেহ নয়,—নিষ্ক্রিয় জড়-পিণ্ড-মাত্র, সেইরূপ সর্ব্বদা মৃত্যু-বিভীষিকায় অভিভূত এই যে জীবন আমরা বহন করিতেছি, তাহা যথার্থ জীবন নহে, জীবনের প্রতিচ্ছায়ামাত্র। আমাদের মধ্যেই যথার্থ জীবনের বীজ নিহিত রহিয়াছে, স্বকীয় চেষ্টায়ই আমরা তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে

পারি। কোনও প্রকারে প্রাণ বাঁচাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ও মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হওয়াই তোমার নিয়তি নহে, জ্বল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত প্রজ্বলিত হইয়া বিশ্ব-জগৎ উজ্জ্বল করিয়া তোল, ওঠ, ছোট, বেগবান্ বায়ুর ন্যায় দিকে দিকে প্রধাবিত হও, আপনার উৎসাহে অপরকে উৎসাহিত, আপন জীবনে অপরকে সঞ্জীবিত কর।

যথার্থ জীবনে যখন আমরা সঞ্জীবিত হই, তখন মৃত্যু আমাদিগের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, 'ভয়ই মৃত্যু', ইহা ধ্রুব সত্য। আমরা কি দেখিতে পাই না যে, আমরা জীবন—অর্থাৎ আমরা যাহাকে জীবন বলিয়া থাকি, সেই তথাকথিত জীবনে জীবিত হইয়াও মৃতবৎ, কিন্তু আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি, মহাপুরুষগণ সেই তথাকথিত মৃত্যুর ভিতর দিয়াই আমাদিগের যথার্থ যে জীবন, তাহার সন্ধান দিয়া থাকেন।

কোনও প্রকারে প্রাণ বাঁচাইয়া চলাই জীবনের ধর্ম্ম নহে, মৃত্যুকে অতিক্রম করাই জীবনের ধর্ম্ম। প্রিয়জন-বিয়োগে ব্যাকুল হইয়া যখন আমরা পৃথিবীকে মরুভূমির মত দেখিয়া থাকি, যখন আমরা মৃত্যুযবনিকার পরপারে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না, তখন যদি আমরা বুঝিতে পারি—জানিতে পারি যে, ঐ যবনিকা ক্ষণিক আবরণমাত্র, তখন যদি বুঝিতে পারি যে, ঐ দৃষ্টি-বিভ্রম-কারী তমসার পরপারে চির-উজ্জ্বল আলোক, তবে কি আমরা আমাদের শোক-দগ্ধ প্রাণে বহুল পরিমাণে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হই না? যখন আমরা পাপ ও দুর্গতির পথে অগ্রসর হই, যখন ক্ষণিক বর্ত্তমানের মোহে মুগ্ধ হইয়া বাঞ্ছিত জীবনকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাই, তখন কি আমরা যথার্থ বিশ্বাস করি যে, মৃত্যু কাল্পনিক বিভীষিকামাত্র, তাহার অস্তিত্ব নাই? পরলোক সম্বন্ধে আমরা বহুতর আলোচনা করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা যদি যথার্থই তাহাতে বিশ্বাসবান্ হইতাম, তবে কেন প্রতিনিয়ত দুঃখের কঠোর স্পর্শে জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিব? আমরা যথার্থই যদি জীবনের জন্য লালায়িত হইতাম, তবে আমাদের হৃদয় সতত উৎসাহ ও আশায় পরিপূর্ণ থাকিত, তবে আমরা মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াও জীবনের স্পন্দন অনুভব করিতাম। নচিকেতা যেরূপ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া অমৃতের সন্ধান আনিয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ করিতে সমর্থ হইতাম।

হে অমৃতের পুত্র মানব! চাহিয়া দেখ, একবার এই বিশ্ব-জগতের পানে একবার প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়া দেখ, এই চির-প্রবাহিত জীবন-স্রোত। ঐ যে তোমার মস্তকোপরি দিগন্ত-প্রসারিত উজ্জ্বল নীল আকাশ দূর চক্রবাল-রেখায় মিশিয়া গিয়াছে, এই যে শস্যশ্যামলা ধরণী পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া দীপ্ত সূর্য্য-

কিরণে হাসিতেছে, এই যে বিহঙ্গ-কুল চিরমধুর সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করিয়া তোমার হৃদয়ে স্বর্গীয় আনন্দের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে কোথাও কি মৃত্যুর আভাস দেখিতে পাও ?

একই অবচ্ছিন্ন জীবন-প্রবাহ সর্ব্বত্র প্রবহমান ; একই অখণ্ড চৈতন্য এই বিশ্ব-জগতের প্রতি রেণু-কণায় বর্ত্তমান ; জড়ে তাহা নিদ্রিত অবস্থায়, বৃক্ষলতা এবং মানবেতর প্রাণীতে তাহা ক্রমোন্মেষিত এবং মানবেই তাহা অধিকতর জাগ্রত-রূপে বর্ত্তমান। অধিকন্তু এই মানব-সম্প্রদায়েও আমরা এই চৈতন্য-শক্তির তারতম্য সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এই মানব-জীবনেই পশুত্ব ও দেবত্বের একত্র সমাবেশ,— আমরা আমাদের স্বকীয় ইচ্ছানুসারেই পশুত্ব অথবা দেবত্ব লাভ করিয়া থাকি। এই যে ইচ্ছা-শক্তি, ইহাতেই মানব জীবনের বিশেষত্ব, এই শক্তি যাহাতে প্রবল, তাহার অপ্রাপ্য কিছুই নাই। মানবেতর প্রাণী অথবা বৃক্ষলতা-গুল্ম ইত্যাদিতে এই ইচ্ছা-শক্তির অভাব বলিয়াই তাহারা মানবাপেক্ষা নিকৃষ্ট পর্য্যায়ভুক্ত। তাহারা প্রকৃতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, প্রকৃতির একান্ত বশী ত হইয়া জীবন ধারণ করে এবং কাল-অনুসারে জীব-দেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু মানব জীবন সেরূপ নহে, এই জীবনে জীবিত হইয়া মানব স্বকীয় ইচ্ছায় প্রকৃতিকে আপন বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়া থাকে, এবং প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিতে সমর্থ হয়। এই ইচ্ছা-শক্তি যাহাতে প্রবল, সে বিশ্ব জয় করিতে সমর্থ। সে অর্থ কামনা করিলে ধনবান্ হইবে, যশ কামনা করিলে যশস্বী হইবে এবং সে মুক্তি কামনা করিলে মুক্ত হইবে। ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল তাহার করতলন্যস্ত। এই ইচ্ছাশক্তি যাহার প্রবল, সে আপন নির্ব্বাচিত পন্থা অনুসারে পশু হইতেও অধম এবং দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ হইতে সমর্থ। এই ইচ্ছা-শক্তির যাহাতে একান্ত অভাব, সে মানবদেহধারী হইয়াও প্রকৃতি-পরিচালিত একটি যন্ত্র ব্যতীত অপর কিছুই নহে।

মানব-জীবনের অপর বিশেষত্ব হইতেছে প্রেম, এই প্রেমই মানুষকে মহৎ করিয়া তোলে, এই প্রেমই মানব-জীবনে পবিত্রতা, সুখ ও শান্তির উৎস, এই প্রেমের অনুশীলনেই মানব-জীবনের সফলতা এবং এই প্রেমেই মানুষ মৃত্যুকেও জয় করিয়া থাকে। এই প্রেমই মানব-জীবনে ত্যাগ শিক্ষা দিয়া থাকে এবং ত্যাগই মুক্তির উপায়। পারিবারিক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এই প্রেমের বীজ নিহিত থাকে,—পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্বার্থত্যাগেই ইহার বিকাশ ; এবং ইহাই ক্রমে বর্দ্ধিত ও পল্লবিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে শাখা বিস্তৃত করিয়া মানব-জীবনকে মহৎ ও মহত্তর করিয়া তোলে। যে আকর্ষণে পক্ষিদম্পতী আপনাদের ক্ষুদ্র নীড় রচনা

করিয়া থাকে ও ঐকান্তিক আগ্রহে আপনাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া স্বকীয় সুখ-সুবিধা, এমন কি, সময়বিশেষে আপন প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া স্বকীয় শাবকগুলিকে প্রতিপালন করিয়া থাকে, তাহার ভিতরেও আমরা আশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগ ও অপূর্ব্ব মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাদের ঐ আকর্ষণ ক্ষণিক, প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত হইয়াই তাহারা ঐরূপ করিয়া থাকে—একমাত্র মানব-জীবনই প্রেমের লীলাভূমি এবং এই প্রেমের বিকাশের তারতম্য অনুসারেই মানব-জীবনের সার্থকতার তারতম্য। প্রিয়জন-মিলনে তুমি উৎফুল্ল হও, হে মানব! প্রিয়জন-বিচ্ছেদে তুমি ক্রন্দন কর, যে বলে বলুক, উহা শুধুই দুর্ব্বলতা, ভ্রান্তি ও মোহ মাত্র ; আমি তাহা বলি না। যে হাসিতে ও কাঁদিতে জানে না, সে মৃত, প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত হইয়াও সে জীবিত নহে। তবে কি না, ইহাও সত্য যে, আমরা যে সকলেই প্রেমের বশীভূত হইয়াই ঐ আনন্দ ও বেদনা অনুভব করিয়া থাকি, তাহা নহে, আমরাও অনেকেই ঐ পক্ষিদম্পতীরই মত প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়মিত হইয়া থাকিমাত্র।

মহাপুরুষগণের জীবনেই আমরা এই প্রেমের মহত্তম প্রকাশ দেখিতে পাই। ভগবান্ বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন এই প্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহাদের জীবন দ্বারাই আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই যে, হৃদয়-হীনতাই সন্ন্যাস নহে, বিরক্তি ও ঘৃণায় যে ত্যাগ ও আত্মমোক্ষকামনায় যে ঔদাসীন্য, তাহা স্বার্থ-পূর্ণ। প্রেমমন্ত্রে যে দীক্ষিত, প্রকৃত ত্যাগ শুধু তাহাতেই সম্ভব। আপনাপন পরিজনবর্গকে পরিত্যাগ করিতে উক্ত মহাপুরুষদ্বয় যেরূপ বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই অপরে অনুভব করিতে পারিবে না। একটি ছাগ-শিশুর জন্য যিনি অকাতরে প্রাণ দিতে উৎসুক,—প্রহৃত হইয়াও যিনি প্রহারককে প্রেমালিঙ্গন দিতে উদ্যত, এইরূপ মহাপ্রেমিক যাঁহারা, তাঁহারা কখনই আপন পরিবারবর্গের প্রতি প্রেমশূন্য হইতে পারেন না। কিন্তু বেদনা যেখানে যত অধিক, ত্যাগে সেখানেই তত মহত্ত্ব। যাহার আছে, সে-ই দিতে পারে, এবং যে অকাতরে আপন সর্ব্বস্ব দান করিতে পারে, তাহারই দান মহৎ। তাই আমরা যখন দেখিতে পাই যে, জগৎ-জীবের কল্যাণার্থ বিশ্ব-প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ইঁহারা আপন হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াও সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছেন, তখন স্বতঃই আমরা তাঁহাদের চরণ-প্রান্তে প্রণত হই। যুগ-যুগান্তর অতীত হইয়াছে, শচীমাতার ক্রন্দনে এখনও আমরা অশ্রুতে অভিষিক্ত হইতেছি, আর শ্রীচৈতন্যদেব কি সে ক্রন্দনে অসীম বেদনা অনুভব করেন নাই? কিন্তু বিশ্বকল্যাণ-প্রসূ তাঁহাদের যে অগাধ প্রেম, সেই প্রেমের বেদনাও কত আনন্দপ্রদ, তাহা একমাত্র সেই মহাপ্রেমিকগণই অনুভব করিতে সমর্থ।

বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, "মনে হয়—এই জগতের দুঃখ দূর কর্ত্তে আমায় যদি

হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো।" কি মহাপ্রাণ, আপন মুক্তিকামনাও তুচ্ছ করিতেছেন! বিশুদ্ধ প্রেমই এই মহা-প্রাণতা প্রদান করিতে সমর্থ। পৌরাণিক আখ্যানে আমরা রাজর্ষি বিপশ্চিৎকে দেখিতে পাই, তিনি নরকে পাপীর দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া ব্যথিতচিত্তে আপন পুণ্যফল তাহাদের সমর্পণ করিতেছেন; তদীয় সঙ্গ-লাভে পাপিগণ সুখানুভব করিতেছে বলিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপন প্রাপ্য স্বর্গসুখ ভোগ করিতে যাইতেও তিনি উৎসুক নহেন, তাহাদিগের সহবাসই তিনি কাম্য মনে করিতেছেন। এই যে প্রেম, এই যে আকাশের মত উদার, সলিলের মত স্নিগ্ধ, বায়ুর মত জীবনসঞ্চারকারী, পৃথিবীর মত সুন্দর প্রেম, ইহাই মানব-জীবনের বিশিষ্ট প্রকৃতি।

এই মানব-জীবনেই আমরা জ্ঞানের উন্মেষ ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। মানবেতর প্রাণী প্রাকৃতিক সংস্কারবশতঃই সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে এবং বংশ পরম্পরাক্রমে একই প্রকারে জীবন অতিবাহিত করিয়া যায়। পরন্তু মানব এই জ্ঞানবলেই প্রতি পদক্ষেপে ভূপতিত হইয়াও সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে, প্রত্যেক বিঘ্ন ও বিপত্তির ভিতর দিয়াই নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছে। এই জ্ঞানই তাহাকে ন্যায় ও অন্যায়ের বিচার-শক্তি প্রদান করিয়া আত্মোন্নতিতে প্রবুদ্ধ করিতেছে। এই জ্ঞানের অনুশীলনই মানব-জীবনের লক্ষ্য এবং এই জ্ঞান দ্বারা যখন আমরা স্ব স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই এবং এই জ্ঞানের ক্রমোন্মেষে যখন আমরা এই যে বিশ্ব-জগতে এক অবিচ্ছিন্ন জীবন-স্রোত নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, সেই জীবনস্রোতের সঙ্গে স্বকীয় জীবনকে একীভূতভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হই, তখনই আমরা যথার্থ জীবনে জীবিত হইয়া পূর্ণ আনন্দের অধিকারী হইয়া থাকি।

এই জগতের মধ্যে যে শক্তি ওত-প্রোতভাবে বর্ত্তমান, যিনি এই বিশ্ব-জীবন, তাঁহারই প্রদত্ত ও তাঁহা হইতেই উদ্ভূত আমাদের এই জীবনে সেই অনন্ত শক্তির, অনন্ত আনন্দের ও অনন্ত জীবনের বীজ নিহিত রহিয়াছে। হে মানব, জাগ্রত হও, তোমার প্রতি রক্ত-কণিকায় সেই তাড়িত-শক্তি অনুভব কর, দেখিবে, তোমার কি অদম্য উৎ-সাহ, কি অজস্র শক্তি, কি বিশ্ববিপ্লবকারিণী প্রতিভা! তুমি ক্ষুদ্র নহ, তুমি দুর্ব্বল নহ, তোমার প্রবল ইচ্ছার নিকট সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অগ্নিমুখে মধূথের ন্যায় বিগলিত হইয়া যাইবে। একবার শুধু জীবনলাভে সচেষ্ট হও, মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া চলাকেই সর্ব্বস্ব মনে করিও না, শুধু নিঃশ্বাস-গ্রহণই জীবন নহে, যথার্থ যে জীবন, তাহা লাভ করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম কর। তার পর দেখিবে, কি তোমার শক্তি, জীবনই বা কি, তাহা বুঝিবে। তখন দেখিবে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ তোমার করতলগত, ইচ্ছা করিলেই তুমি তাহা লাভ করিতে পার। তখন তটিনীর কল্লোলে,

বৃক্ষরাজির পত্রমর্ম্মরে, পবনের মৃদু সঙ্গীতে শুধু জীবনের বার্ত্তাই তুমি শ্রবণ করিবে। মেঘের গর্জ্জন, সাগরের কল-নিনাদ, ঝটিকার ভীম রোল তখন তোমার নিকট জীবনের বার্ত্তাই বহন করিয়া আনিবে। বিশ্বজগতে নিত্য প্রবাহিত যে আনন্দ-স্রোত, তুমি তাহা নিজের প্রতি ধমনীতে অনুভব করিয়া সফলকাম হইবে।

অতএব হে হৃদয়! তুমি জাগ্রত হও, আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ ও আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল হইয়া আপন জীবন সার্থক কর। ভগবৎ-কৃপায় যে অমূল্য জীবন তুমি লাভ করিয়াছ, স্বেচ্ছায় তাহা ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইও না। দূর কর তোমার এই জড়ত্ব, যাহা তোমাকে এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; দূর কর তোমার ঐ চোখের আবরণ, যাহা তোমাকে নিজ শক্তি অনুভব করিতে অক্ষম রাখিয়াছে; দূর কর তোমার ঐ মৃত্যু-বিভীষিকা, যাহা তোমাকে জীবনের আস্বাদ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

তার পর দিকে দিকে এই জীবনের বার্ত্তা ঘোষণা কর, দেখিবে, জীবন ছাড়া আর কিছুই নাই। যে নিজে জীবন লাভ করিয়াছে, সেই অন্যকে জীবনদান করিতে সমর্থ; যে মৃত, সে অপরকে মৃত্যুমুখেই টানিয়া লয়। একবার জ্বলিয়া উঠিলে দাবানল যেরূপ মুহূর্ত্তে কানন হইতে কাননান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেইরূপ একজন যখন প্রকৃত জীবনে জীবিত হয়, তখন মুহূর্ত্তে দিগ্‌দিগন্তে জীবনস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে।

গিরি-নিরুদ্ধ ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী যেরূপ কোনও প্রকারে আপন ক্ষুদ্র গণ্ডী একবার অতিক্রম করিতে পারিলে প্রবলবেগে প্রস্তররাশি ভাসাইয়া নিয়া বিশাল হইতে বিশালতর হইতে থাকে ও পৃথিবীকে আপন সলিল-ধারায় শ্যামল, স্নিগ্ধ ও উর্ব্বরা করিয়া ক্রমশঃ সাগরের দিকে প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে সেই অকূল বারিরাশিতে আপন অস্তিত্ব মিশাইয়া দিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের ক্ষুদ্র জীবনও একবার যদি আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে, তবে মুহূর্ত্তে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রবল শক্তিতে শক্তিমান্ হইতে থাকে এবং ক্রমবিস্তৃতি লাভ করত এক অনন্ত জীবনস্রোতে পরিশেষে আপন অস্তিত্ব মিশাইয়া দেয় ও সমস্ত ধরণীকে আহ্বান করিয়া প্রতিনিয়ত এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকে ;—

'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' ইহাই মানব-জীবনের চরম পরিণতি এবং উহাতেই তাহার সার্থকতা।

শ্রীআশালতা সেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭—১৯০৫)

"Vaidantic Doctrines Vindicated" (1845)

দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে, V, D, V, গ্রন্থখানি যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। নারায়ণের বৈশাখসংখ্যার পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রাবণের 'ভারতী' আমার V. D. V. গ্রন্থখানির আলোচনা সম্বন্ধে আপত্তি প্রকাশ করিয়া, উক্ত সংখ্যার গোড়া-কার প্রবন্ধেই এক প্রতিবাদ জাহির করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি পুনরায় V. D. V. গ্রন্থখানির আলোচনায় বাধ্য হইলাম।

ভারতীর প্রতিবাদকারী লেখকের নাম হইতেছে, 'শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।' ইনি স্বনামী কি বেনামী, তাহা বুঝিলাম না, কিন্তু যাহাই হউন, আমার V. D. V. গ্রন্থের আলো-চনায় দেবেন্দ্রনাথের জীবনীলেখক শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর বিশালকায় গ্রন্থখানির যে স্থানে স্থানে আঘাত লাগিয়াছে ও ক্ষত হইয়াছে, ইনি সেই সমস্ত ক্ষতমুখে প্রলেপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অজিত বাবু আমার বন্ধু। ক্ষত জুড়িয়া গেলে ক্ষতি ছিল না, বরং আমিই তাহাতে সকলের আগে খুসী হইতাম। কিন্তু ওই প্রলেপে বিশেষ কোন ফল হইবে বলিয়া যেন আমার মনে হইতেছে না।

প্রথম প্রশ্ন উঠিয়াছে এই যে, আলোচ্য V. D. V. গ্রন্থখানি কাহার রচনা? শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ, ইঁহারা দুইজনে ইহা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, এই গ্রন্থের (প্রবন্ধের ?) রচনাকালে রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্ম-সমাজে আসেন নাই, এবং ইহাও একাধিক প্রমাণে স্বীকৃত যে, ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পর্কে রাজনারায়ণ বাবুর প্রথম রচনা হইতেছে, উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, লিওনার্ড সাহেব যে ব্রাহ্ম-সমাজের ইতি-হাস লিখিয়াছেন, তাহার মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন রাজনারায়ণ বাবু। যদি রাজনারায়ণ বাবু V. D. V. লিখিয়া থাকিতেন, তবে নিশ্চিতই লিওনার্ড সাহেবকে সে কথা তিনি বলিতেন। আর লিওনার্ড সাহেব যখন তাঁহার নিকট হইতে এত কথা শুনিয়া লিখিয়াছেন, কাজেই এ কথাটা তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গেই লিখিতেন। কিন্তু লিওনার্ড ত রাজনারায়ণ বাবুকে রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন না, এবং সেজন্য রাজনারায়ণ বাবু বা তাঁহার কেহ কোন আপত্তিও করিল না। অথচ পণ্ডিত শাস্ত্রী

মহাশয় এতকাল পরে সমগ্র ব্রাহ্ম-সংস্কারের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া লিখিলেন কি না, দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ এই V. D. V. লিখিয়াছেন।

এইবার ভারতীর 'শ্রীসত্যব্রতের' প্রলেপের নমুনাটা দেখাইতেছি। প্রলেপ বলিতেছেন হা, হা, শাস্ত্রী মশায়ের ইতিহাসই "ব্রাহ্ম-সমাজের একমাত্র খাঁটি ইতিহাস।" কেন না—"ঐ ইতিহাসের বহুতথ্য তিনি মহর্ষি মহাশয়ের (?) স্বমুখাৎ শ্রবণপূর্ব্বক লিখিয়াছেন, সুতরাং উহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য।" বেশ কথা। ভগবানের কৃপায় শাস্ত্রী মহাশয় এখনও জীবিত। তিনিই কেন না হলফ্ করিয়া বলুন যে, V. D. V. সে দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বাবুর রচনা, তাহা তিনি 'মহর্ষি মহাশয়ের স্বমুখাৎ শ্রবণ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন?' যদি এই কথা আজ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় হলফ্ করিয়াও বলেন, যাহা তিনি কালী-কলমে লিখিয়া ছাপাইয়াছেন, তবে তাহার উত্তরে আমরা বলিব, হয় দেবেন্দ্রনাথ মিথ্যা বলিয়াছেন, না হয় পণ্ডিত শিবনাথ মিথ্যা শুনিয়াছেন।

ভারতীর প্রলেপ বলিতেছেন,—হা, হা, শাস্ত্রী মহাশয় যে একেবারে নির্ভুল লিখিয়াছেন, তাহা কি বলি। ভুল আছে—ভুল আছে। তবে 'দু একটা'। যেমন! যেমন এই রাজনারায়ণ বাবু দ্বারা যে V. D. V. রচিত হইয়াছিল, এইটেই ভুল!! রাজনারায়ণ বাবুই, দেবেন্দ্রনাথের ইংরেজী লেখার ব্যাপারে লিপ্ত এবং নিযুক্ত ছিলেন কি না,—তাই শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ভুলটা হইয়া গিয়াছে। আহা!

ইহা হইতে কি প্রমাণ হয়? দেবেন্দ্রনাথের 'স্বমুখাৎ শ্রবণপূর্ব্বক' পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়া গেলেও, তাহাতে ভুলের সম্ভাবনা আছে, এবং অন্যান্য প্রমাণ ব্যতিরেকে "উহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য" নহে। "সর্ব্বসাধারণের নিকট ভক্তিভাজন যাঁহারা", আমিও মনে করি, শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদেরি মধ্যে একজন। কিন্তু আবার আমি ইহাও মনে করি, "সর্ব্বসাধারণের নিকট ভক্তিভাজন যাঁহারা," এবং যাঁহারা নহেন, এই উভয়েরাই যদি ইতিহাস লিখিতে গিয়া অজ্ঞানতঃ বা জ্ঞানতঃ মারাত্মক সব মিথ্যা কথা (অর্থাৎ যাহা সত্য নয়) লিখিয়া যান, তবে তাহা যে মিথ্যা, এ কথা বলিয়া দেওয়া ভাল। 'সর্ব্বসাধারণের নিকট ভক্তিভাজন'দের মিথ্যা উক্তিগুলিকে সত্য বলিয়া নির্বিবাদে মানিয়া লওয়া Bacdu কথিত idols গুলির মধ্যেই ধর্ত্তব্য, তদপেক্ষা বেশী কিছু নহে। কাজেই শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে আমি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম এবং এখনও দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, 'সংস্কার-যুগের ইতিহাস-লেখকদের মধ্যে তাঁহার মত দায়িত্ববোধহীন লেখক আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।' কেন না, আয়তনে তিনিই সব চেয়ে বিরাটকায় ইতিহাস লিখিয়াছেন, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভুলও, (নানা প্রকারের এবং 'দুএকটা' নহে।)

আমার বিবেচনায় তিনিই করিয়াছেন। সুতরাং ভারতীর প্রলেপ আমি এ বিষয়ে মুছিয়া ফেলিতে বাধ্য হইলাম।

তবে V. D. V. এর রচয়িতা কে? লিওনার্ড সাহেব বলেন, চন্দ্রশেখর দেব। আর কেহর নামোল্লেখ তিনি করেন না। ইহাতে দেবেন্দ্রনাথের 'দেড় বছরব্যাপী' জীবনী লেখক আমার বন্ধু অজিত বাবু বেজায় খাপ্‌পা হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু খাপ্‌পা হইলেই মানুষ সব সময়ে ধাপ্‌পা দিয়া সামলাইতে পারে না। যা হোক্, বন্ধু অজিত বলেন, তা চন্দ্রশেখর দেব রচয়িতা হয় হউক, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথও তাঁর সঙ্গে আছেন। বন্ধু অজিত দেবেন্দ্রনাথকে লইলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে, আর চন্দ্রশেখর দেবকে লইলেন, লিওনার্ড সাহেবের কাছ হইতে। কিন্তু তিনি এই উভয়কে যে অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে জুড়িয়া দিলেন, এইখানেই তাঁর মৌলিকত্ব। না দিয়া উপায় নাই। গ্রন্থখানি ইংরেজীতে লেখা। দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজী লিখিতেন না। কাজেই কেহ একজন ইংরেজী লেখক ত চাই? তা যখন লিওনার্ড সাহেব চন্দ্রশেখর দেবের কথা বলিতেছেন, তখন থাক চন্দ্রশেখর দেবই। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন আর চন্দ্রশেখর দেব লিখিয়াছেন এইরূপে V. D. V. র উদ্ভব হইয়াছে।

আমি বলিতে চাই, V. D. V. গ্রন্থ চন্দ্রশেখর দেব দেবেন্দ্রনাথের নিকট শুনিয়া তবে লিখিয়াছেন, ইহার প্রমাণ নাই। ইহা বন্ধু অজিতের কল্পনা-মূলক, এবং সেই কল্পনার মূলে কি প্রেরণা কার্য্য করিয়াছে, তাহা আমার অগোচর। আমার কথা এই - (ক) এ বিষয়ে লিওনার্ড সাহেবের গ্রন্থ বিশেষভাবে প্রামাণ্য। কেন না, এই গ্রন্থের মাল-মসলা রাজনারায়ণ বাবু সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। যদি এই গ্রন্থ-রচনায় দেবেন্দ্রনাথের কোনরূপ স্মরণীয় বা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব থাকিত, তবে রাজনারায়ণ বাবু তাহা লিওনার্ড সাহেবকে নিশ্চয়ই বলিতেন। (খ) এমনও কথা শুনিয়াছি যে, লিওনার্ডের এই গ্রন্থ-রচনায় স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ বিশেষরূপে উদ্যোগী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে ও উৎসাহে এই ঐতিহাস রচিত হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবু যে এই গ্রন্থের জন্য মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (গ) কেশব ও কৈশবদিগের সহিত দেবেন্দ্রনাথের এত বিরোধ হয় যে, ১৮৬৬ খৃঃ কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ করেন। এই বিরোধের সময় যে দলাদলি হয়, দেবেন্দ্রনাথ তাহার এক দলের প্রতিনিধি এবং কেশবচন্দ্র অন্য দলের প্রতিনিধিরূপে দণ্ডায়মান হন। এই উভয়দলের প্রত্যেক দলই বিপক্ষীয় দলকে মিথ্যাবাদী বলিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। লিওনার্ডের ইতিহাস কেশবচন্দ্র ও কৈশবদিগকে অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, দেবেন্দ্রনাথের দলকে সমর্থন করিয়াছেন। কাজেই দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে, রাজনারায়ণের মাল-মসলা-সংগ্রহে, এবং দেবেন্দ্র

নাথের কার্য্যাবলীর সম্পূর্ণ সমর্থনে যে ইতিহাস, তাহা কিছুতেই V. D. V. গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্বকে মুছিয়া ফেলিত না; এবং তৎস্থানে একা চন্দ্রশেখর দেবের নামোল্লেখ করিত না। (ঘ) কাজেই চন্দ্রশেখর দেব একাই V. D. V. প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছেন, আমার এইরূপ বিশ্বাস। (ঙ) উপনিষদের শ্লোকাদির জন্য দেবেন্দ্রনাথের মুখাপেক্ষী হইবার কোন কারণ চন্দ্রশেখর দেবের ছিল বলিয়া আমি মনে করি না। ডফের সহিত বেদান্ত লইয়া যুদ্ধ হইবার প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের সহিত রামমোহনের যে প্রথম বেদান্ত-যুদ্ধ হয়,—Brahmanical Magazine গুলি যাহার সাক্ষ্য ও সাহিত্য,—সেই সাহিত্যে চন্দ্রশেখর দেবের অধিকার ও হস্ত আমরা দেখিতে পাই; এবং সেই সাহিত্যে উপনিষদ ও তৎসঙ্গে দর্শন, পুরাণতন্ত্রের যে সমস্ত গবেষণা দৃষ্ট হয়,—তাহার সহিত যিনি সুপরিচিত, তিনি নিশ্চয়ই V. D. V. এর মধ্যে উপনিষদের শ্লোক বাছাইয়ের জন্যে দেবেন্দ্রনাথের মুখাপেক্ষী হইবেন না। (চ) Br. Magazineএ চন্দ্রশেখর দেবকে যে সংশ্লিষ্ট দেখা যায়—তাহা হয় ত প্রকৃত চন্দ্রশেখর দেব নয়। রামমোহনই চন্দ্রশেখরের ছদ্ম নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন,—এইরূপ আপত্তি উঠিয়াছে। উত্তরে বলিতে চাই যে, রামমোহন এ ক্ষেত্রে চন্দ্রশেখরের ছদ্মনাম গ্রহণ করেন নাই—'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর জীবিত এবং সুপরিচিত ও সহযোগী বন্ধুর নাম নিশ্চিতই রামমোহন ছদ্মনামরূপে গ্রহণ করিবেন না। তদ্ব্যতীত চন্দ্রশেখর দেবের সহিত Br. Magazineএর সাহিত্য-সম্পর্কে সম্বন্ধ এই যে, তিনি ইহার প্রকাশের সময় No IIIএর এক সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লেখেন এবং রামমোহনের সহিত সাধারণভাবে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও বিশেষভাবে এই পাদ্রী-সংঘাত-জনিত সাহিত্যের সহিত তাঁহার সহানুভূতি ও সহযোগিতা হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, Br. Magazineএর 'বাদানুবাদে' চন্দ্রশেখর উদাসীন ছিলেন না,—লিপ্ত ও উৎসাহী ছিলেন; এবং এই সাহিত্যে সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, দর্শন পাঠ করিয়া, পাদ্রীদের বিরুদ্ধে যে জবরদস্ত জবাব তৈয়ার হইয়াছিল,—তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। এই সাহিত্যে তাঁহার প্রবেশ, অধিকার ও উৎসাহ সত্যই 'ইতিহাস'। ইহাকে 'গাঁজাখুরী গল্প' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া একমাত্র গাঁজায় দম দিয়াই সম্ভব, অন্যথা—নহে। সুতরাং ভারতীর এ প্রলেপটিও আমি মুছিয়া ফেলিতে বাধ্য হইলাম।

শুধু মাত্র লিওনার্ড সাহেব লিখিয়াছেন বলিয়া নহে, উপরি-উদ্ধৃত একাধিক কারণে আমি একা চন্দ্রশেখর দেবকেই V. D. V. গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া মনে করিতেছি, এবং চন্দ্রশেখর দেব যে দেবেন্দ্রনাথের নিকট শুনিয়া ঐ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার একান্তই প্রমাণাভাব দেখিতেছি। সংস্কার-যুগের ইতিহাস-

সম্পর্কীয় প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত কোন পুঁথি-পত্রেই তাহা পাই নাই,—অবশ্য এক অজিত বাবুর গ্রন্থ ছাড়া। যাহা, বলা বাহুল্য, আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করি না। অজিত বাবুও এই অশ্রুতপূর্ব্ব তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, তাহা বলিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে তিনি যে সমস্ত কল্পনার জালবিস্তারের প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সত্যের সম্যক্ অপলাপ ঘটাইলেও,—হাস্যরসাত্মক সন্দেহ নাই।

তার পর প্রশ্ন উঠিয়াছে,—লিওনার্ডের ইতিহাস প্রামাণ্যগ্রন্থ কি না? অজিত বাবুর বেনামী সমর্থনকারী সত্যব্রতধারী শর্ম্মা মহাশয় বলিতে চান,—না কিছুতেই না। কারণ?

(ক) "দেবেন্দ্রনাথের কীর্ত্তি ও কাল সম্বন্ধে তাঁহার (লিওনার্ডের) ইতিহাসের তারিখ ও তথ্য প্রায় আগাগোড়াই ভুল।" আমি কিন্তু দেখাইয়াছি, লিওনার্ডের ইতিহাসই—রাজনারায়ণ বাবুর দ্বারা দেবেন্দ্রনাথেরই একটা কীর্ত্তি। এই কীর্ত্তির গৌরব অথবা লজ্জা হইতে দেবেন্দ্রনাথকে রক্ষা করা ফরমাসী সাহিত্যের পক্ষেও সহজ নহে। সে যাহা হউক, অজিত বাবু কিন্তু তত বড় কথাটা, তাঁহার প্রয়োজনাধিক বৃহদায়তন দেবেন্দ্রনাথের জীবন-চরিত গ্রন্থে, এক ছত্রেও উল্লেখ করেন নাই। তিনি যাহা উল্লেখ করেন নাই, তাঁহার বেনামদার তাহা আজ অতি বৃহৎ অক্ষরে ভারতীর পৃষ্ঠায় ছাপাইয়াছেন। উত্তম!

আগাগোড়া ভুলের মধ্যে অন্ততঃ দু'একটা ভুল তারিখ ও তথ্য দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিওনার্ড কোথায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সত্যব্রত তুলিয়া দেখান নাই কেন? রাজনারায়ণ বাবু মাল-মসলা জোগাইলেন, অথচ দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তারিখ ও তথ্য আগাগোড়াই ভুল! অথচ এই গ্রন্থ প্রকাশের পর ১৩২৪ শ্রাবণের ভারতী ছাড়া, ইহার কোন প্রতিবাদ বাহির হইল না। আশ্চর্য্য! আমরা জানিতে চাই—দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিওনার্ডের কোন্ তথ্য ও কোন্ তারিখ ভুল?

আমাদের বিশ্বাস—কেশবচন্দ্রের সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ-ব্যাপারে,— দেবেন্দ্রনাথের অযথা সমর্থন ও কেশবচন্দ্রের অযথা নিন্দা বিবৃত করিতে গিয়া লিওনার্ড দু'একটা ভুল করিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহা খুব নিশ্চিত যে, সে শ্রেণীর ভুল ধরিয়া দেওয়া, কি অজিত বাবু বা কি তাঁহার ভাড়াটীয়া সমর্থনকারীর সাধ্য নহে।

(খ) সত্যব্রত বলেন যে, "লিওনার্ড সাহেব যে সময়ে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার পক্ষে V. D. V. এর ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের নাম জানিবার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না।" কেন? "কারণ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে তিনি তাঁহার কার্য্যাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করেন নাই।" যদি করিতেন, তবে "এরূপ ভুল হইত না।"

দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিওনার্ড কোন্ তথ্যটা ভুল করিলেন, তাহা না অজিত বাবু, না তাঁহার 'শর্ম্মা' বলিতে ইচ্ছুক অথবা সমর্থ। ভুলটা যে কি, তাহা না বলিয়া এমন গম্ভীরভাবে ভুলের কারণ-সমূহ পর্য্যালোচনা করায় বাহাদুরী আছে, স্বীকার করি।

আমি কিন্তু দেখাইতেছি,—অজিত বাবু লিওনার্ডের ইতিহাসের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে কোন সন্দেহই করেন নাই। আজ সহসা জানি না কেন, তাঁহার বেনামদারের লেখনীমুখাৎ ভারতীবক্ষে, এত দেরীতে তাহা উদ্ঘাটন করিতেছেন। আমি আরও দেখাইতেছি—গ্রন্থ-লেখাকালে অজিত বাবু লিওনার্ড সাহেবকে নিতান্তই অন্ধভাবে অনুকরণ করিয়াছেন। কেন না, V. D. V. গ্রন্থের অন্ততঃ লেখক যে চন্দ্রশেখর দেব, ইহা এক লিওনার্ড ব্যতীত আর কোথা হইতে তিনি পাইয়াছেন, বলিতে পারেন কি? পারেন না। লিওনার্ডই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ও ভরসা। বিনা বিচারে তিনি এক্ষেত্রে লিওনার্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।

লিওনার্ডের গ্রন্থ যদি ইতিহাস নয়, তার আগাগোড়াই যদি ভুল, তবে কোন্ বিবেচনায় লিওনার্ড-কথিত চন্দ্রশেখর দেবকেই তিনি অনন্যগতি হইয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত V. D. V. এর রচনা-ব্যাপারে জুড়িয়া দিলেন?

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দেবেন্দ্রনাথের কাছ হইতে তাঁহার কার্য্যাবলীর সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, অতএব তিনি যাহা বলিবেন—তাই। বেশ! কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় ত বলেন, দেবেন্দ্রনাথের সহিত রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন। উত্তরে 'শর্ম্মা' বলেন, ঐ শুধু রাজনারায়ণ ভুল হইয়া গিয়াছে—কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠিক, নির্ভুল। সাধে কি বলি—'গরজ বড় বালাই'।

শাস্ত্রী মহাশয় কেন না প্রকাশ্যে আমাদের জানান,—যে, এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের মুখাৎ তিনি কি বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন? রাজনারায়ণ ভুল, কোথা হইতে আসিল! চন্দ্রশেখর দেবের কথা দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে কিছু বলিয়াছিলেন কি না—এবং বলিয়া থাকিলে তাহা তাঁহার স্মরণে আছে কি না? যদি স্মরণেই থাকিত, তবে রাজনারায়ণ বাবুর নাম লিখিবেন কেন? এইরূপ বলায় কহায়, শ্রবণে স্মরণে ও বিস্মরণে যে তারিখ ও তথ্যের খিচুড়ী ইতিহাস বলিয়া 'সর্ব্বসাধারণের ভক্তিভাজন' এবং অভাজনগণ আমাদিগকে দিতেছেন,—তাহাই ইতিহাস নহে। মিথ্যা তারিখ ও তথ্যের বহু ক্ষত তাহার মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে,—সত্যব্রতধারীর প্রলেপ নিতান্তই ব্যর্থ ও নিষ্ফল। মিথ্যাকে সত্যের প্রলেপে কে কতদিন ঢাকিয়াছে? কোন্ ইতিহাসে? কোন্ সাহিত্যে? হায়! হতভাগ্য বাঙ্গালীর বিগত শতাব্দীর সংস্কার-যুগ আর তার ইতিহাস,—আর সেই ইতিহাসের—লেখকবৃন্দ!

শেষ আপত্তি (বিশেষ সাংঘাতিক নহে) অজিত বাবু যে সমস্ত ইন্‌টারন্যাল এবং এক্‌স্‌টারন্যাল প্রমাণ দিয়া দেবেন্দ্রনাথকে V. D. V. গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—আমি সেই এক্‌স্‌টারন্যাল প্রমাণের (খ) দফার উত্তর দেই নাই, এবং ইন্‌টারন্যাল প্রমাণের (ক) দফার উত্তর দেই নাই। পরন্তু ঐ গুলিকে, ভারতীর 'শর্ম্মা' বলেন, আমি নাকি চাপা দিয়াছি!

আমার বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আছে,—যে, ঐ গুলি প্রমাণ-পদবাচ্য নহে। external এবং internal এই বুলীর আওতাতে শুষ্ক ঝুলী হইতে ধূলি ঝাড়িলেই তাহা evidence এর সূত্রে মণিগণা ইব দানা বাঁধিবে না। আচ্ছা, যদি চাপাই দিয়া থাকি, তবে উদ্‌ঘাটনই করা যাক্।

এক্‌স্‌টারন্যাল এভিডেন্স, দফা (খ) বলেন, "বইখানি প্রকাশিত হইলে, ইহার প্রণেতা যে কে, তাহার উল্লেখ থাকিল না।" থাকিলে আজ আর এ বিপদ্ উপস্থিত হইত না। কিন্তু ইহার প্রণেতার উল্লেখ না থাকাই কি প্রমাণ যে, ইহা দেবেন্দ্রনাথের রচনা? বরং বলা যায় না কি, দেবেন্দ্রনাথের রচনা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার নামোল্লেখ থাকিত। সে কালের অনেক ঋষিই তাঁহাদের দৃষ্ট ও আবিষ্কৃত মন্ত্রের উপর তাঁহাদের নামের ছাপ দিতেন না। তাঁহারা আপনাদিগকে গোপন করিয়া মন্ত্রকেই প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ত সে কালের বা সে শ্রেণীর ঋষি নহেন। তিনি ত তাঁহার রচিত সকল গ্রন্থের উপরই নিজের নাম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ হইতে ত তিনি নিজেকে গোপন করেন নাই। সুতরাং V. D. V. তাঁহার রচনা হইলে বা ইহার রচনায় তাঁহার উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্ব থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই তাহা গোপন করিতেন না। কাজেই দেবেন্দ্রনাথের নামোল্লেখ যখন তাঁহার সব গ্রন্থেই আছে, তখন এ গ্রন্থে না থাকায় ইহাই প্রমাণ হয় যে, ইহা দেবেন্দ্রনাথের রচনা নহে। অজিত বাবুর এক্‌স্‌টারন্যাল এভিডেন্সের চাপা দেওয়া দফার উদ্‌ঘাটনে ত এই দাঁড়ায়।

আচ্ছা, দেখা যাক,—ইন্‌টারন্যাল এভিডেন্স দফা (ক) কি বলেন। "বেদ যে আপ্ত শাস্ত্র, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের ভিতরকার মনের ভাবটি এই সময়েই বাহির হইয়া পড়িয়াছে দেখা যায়। বাহিরের প্রমাণ যে প্রমাণ নয়, ভিতরের আত্মপ্রত্যয়াদির প্রমাণই যে আসল প্রমাণ, এ কথা এ সময়েই তিনি বলিয়াছেন। রামমোহন রায় এ ভাবের কথা বলিতেন না!"

উপরোদ্ধৃত প্রমাণে যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, তাহাকে আগে হইতেই স্বীকার্য্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। V D. V. শাস্ত্রের প্রমাণ সম্বন্ধে যে যুক্তি বা উক্তি আছে,

তাহা যে দেবেন্দ্রনাথের, তাহার প্রমাণ কি? পরবর্ত্তিকালে দেবেন্দ্রনাথ ঐরূপ যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করিয়াছিলেন,—এই কথা? তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, V. D. V. গ্রন্থের শাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে মতবাদকে তিনি ইহার ৫।৬ বৎসর পরে গ্রহণ করিয়াছিলেন মাত্র; এবং অধিকতর সম্ভব এই জন্য যে, এই সময়ে বেদের শাস্ত্রপ্রামাণ্য লইয়া সবে তর্ক উঠিতেছিল মাত্র; এবং দেবেন্দ্রনাথ তখন পরিষ্কাররূপে শাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কোন ধারণাতেই পৌছাইতে পারেন নাই। বরং পরবর্ত্তিকালে V. D. V. এর মতবাদ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই বেশী বিশ্বাসযোগ্য।

তার পর কার্ত্তেজান দর্শন-প্রণালীর অন্ধ-অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া, এবং হিন্দুদার্শনিক মতবাদগুলির দার্শনিক পরিভাষার আবরণে উক্ত কার্ত্তেজান দর্শন-প্রণালীর ভাবগুলিকে প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে দার্শনিক চিন্তায় যে ভাবসঙ্করের উদ্ভাবন দেবেন্দ্রনাথ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত V. D. V. গ্রন্থের শাস্ত্রপ্রামাণ্যের যে মতবাদ,—তাহার কি সম্বন্ধ, আমি তাহা বুঝি না। "আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়" আর enlightenment of the human understanding প্রথম দৃষ্টিতে একই কথা বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ। understanding এর সহিত বিশুদ্ধ হৃদয়ের কি সম্পর্ক? তার পর এই আত্মপ্রত্যয় হইতে সহজ জ্ঞানের রাজ্যে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ এই উভয়ের এমন পৃথক্ ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, তাঁহার মতিস্থিরতার পরিচয় অতি অল্পই আমরা পাইয়াছি। তাহার সহিত V. D. V. এর মতবাদের সাদৃশ্য আমরা ত বিশেষ কিছু খুঁজিয়া পাই না। তবে সকলের দৃষ্টি সমান নহে, এই যা কথা।

শাস্ত্রপ্রামাণ্যে ঐতিহাসিক প্রমাণের অযোগ্যতা ও আত্মপ্রত্যয়াদির যোগ্যতা সম্বন্ধে V. D. V. তে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে—তাহা দেবেন্দ্রনাথ বলিয়া দিয়াছেন, এরূপ অনুমান না করিয়া, পরবর্ত্তিকালে দেবেন্দ্রনাথ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ বলিলে কি অধিকতর যুক্তিযুক্ত হয় না?

রামমোহন এ ভাবের কথা বলিতেন না। ইহা বলা শক্ত। ঐতিহাসিক প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিবার মত অজ্ঞতা দেবেন্দ্রনাথের মত রামমোহনের ত ছিল না। আর ঐতিহাসিক প্রমাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার মত পাণ্ডিত্য দেবেন্দ্রনাথের কোথায়? কাজেই তিনি সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু V. D. V. যে consonant to the dictates of sound reason and wisdom এর কথা বলা হইয়াছে, রামমোহন নিশ্চয়ই তাহার অনুমোদন করিতেন। রামমোহন সম্বন্ধে যা তা যখন তখন বলার অভ্যাসটা যেন ক্রমেই সাহিত্যে সংক্রামক হইতেছে। অথচ

রামমোহন মোটেই সহজ বস্তু নহে। তাহা যাঁহারা তাঁহার দোহাই দিয়া চলেন, তাঁহারাই সব চেয়ে কম বুঝেন।

সুতরাং ইন্‌টারন্যাল এভিডেন্সের (ক) দফা আমি অগ্রাহ্য ও অপ্রামাণিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছি। প্রলেপ এখানেও গেল!

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের শ্লোক আর V. D. V. গ্রন্থের শ্লোক অনেকাংশে এক বলিয়া V. D. V. গ্রন্থকে দেবেন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহাকে ইন্‌টারন্যাল এভিডেন্সের (খ) দফা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

ইহার উত্তরেও আমি তাহাই বলিব—যাহা (ক) দফার উত্তরে বলিলাম। অর্থাৎ এই সামান্য সাদৃশ্য অন্যপক্ষে ইহাই প্রমাণ করে যে, দেবেন্দ্রনাথ পরবর্ত্তিকালে এই V. D. V. গ্রন্থের মধ্য হইতে যে সমস্ত শ্লোকগুলি তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন মাত্র।

কিন্তু আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, এই V, D, V, গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির সহিত দেবেন্দ্রনাথের সহানুভূতি ছিল। অন্যথা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহা এরূপ ভাবে প্রকাশিত হইতে পারিত না।

অসম্ভব নয় যে, তত্ত্ববোধিনী সভার সমস্ত সভ্যদের মধ্যে V. D. V. গ্রন্থের মতগুলি বিশেষ ভাবে আলোচিত হইত, এবং ঐরূপ সমালোচনার delates পরে হয় ত একজন কেহ, এ ক্ষেত্রে চন্দ্রশেখর দেব,—তাহা লিখিয়া উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন। কাজেই যখন প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ হইল, তখন কোন এক জন ব্যক্তির নাম ইহার উপরে থাকিল না। তবে যিনি ইহাকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাকেই রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইলে—একা চন্দ্রশেখর দেবকেই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। দেবেন্দ্রনাথকে সঙ্গে জুড়িয়া দিবার জন্য কল্পনার জাল বিস্তার না করাই ভাল।

এই সমস্ত প্রবন্ধে সর্ব্বত্রই 'We' আমরা ব্যবহৃত হইয়াছে। কোথাও 'I' ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা সম্পাদকীয় 'আমরা'ও বুঝাইতে পারে, অথবা তত্ত্ববোধিনী সভার বহু সভ্যের সমবেত গবেষণা ও আলোচনার ফল বলিয়াও হইতে পারে।

তার পর আমি বলিয়াছিলাম যে, V. D. V. গ্রন্থ Brahmnical Magazine কে অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু ভারতীর 'সত্যব্রত' বলেন যে, তাহা না কি ধরে নাই। আমি আগামীবারে তাহারই আলোচনা করিব।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

মহীসুর-ভ্রমণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হায়দর আলিই প্রথমে এই উদ্যানের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তৎপরে তৎপুত্র টিপু সুলতান ইহার অনেক উন্নতিসাধন করেন; টিপুর মৃত্যুর এক বৎসর পরে ১৮০০ অব্দে ডাঃ বুকানন্ এই লালবাগের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এই উদ্যানটি ভিন্ন ভিন্ন চতুরস্র ক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল; এক এক ক্ষেত্রে এক এক প্রকারের বৃক্ষের চাষ হইত; কোনটিতে হয় ত শুদ্ধ গোলাপ, কোনটিতে শুদ্ধ দাড়িম্ব, ইত্যাদি; ইহার পথঘাটগুলির দুই ধারে সাইপ্রেসের শ্রেণী ইহার শোভা বৃদ্ধি করিত। বুকানন্ বলেন, হায়দর আলির সময় উদ্যানটি ইউরোপীয় রীতি অনুসারে রক্ষিত হইত; টিপু ইহার পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতীয় বা প্রাচ্যরীতির প্রবর্ত্তনা করেন। আমার বোধ হয়, ইহার কারণ টিপুর ইংরাজ-বিদ্বেষ। সে সময়ে টিপুর মত ইংরাজের শত্রু আর কেহ ছিল না। টিপুর মৃত্যুর পরে উদ্যানটি ইংরাজ সরকারের অধীনে আইসে। ১৮৩৬ অব্দে মহীশূরের কমিশনার সার মার্ক কাব্বন্ (Sir mark Cubbun) এই উদ্যানটি Agri-horticultural সোসাইটীর হস্তে অর্পণ করেন এবং জেলের কয়েদীদের দ্বারা ইহার অনেক উন্নতিসাধন করেন। ১৮৪২ অব্দে ইহা পুনরায় খাস গবর্ণমেণ্টে ফিরিয়া আইসে এবং ১৮৫৬ অব্দে ইংরাজ সরকার ইহাকে Horticultural garden রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া লণ্ডনস্থ Keed উদ্যান হইতে একজন উদ্যান-পরিচালক আনাইয়া তাঁহার হস্তে ইহার রক্ষার ভার অর্পণ করেন। আমি যখন ব্যাঙ্গালোরে ছিলাম, তখন ক্রম্বিগাল্ (Crombigal) নামক একজন জর্ম্মান্ পরিচালকের হস্তে উদ্যানটির ভার ন্যস্ত ছিল। শুনিতে পাই, মহীশূরের বর্ত্তমান মহারাজ ইঁহাকে অতিশয় অনুগ্রহ ও স্নেহ করেন এবং তাঁহারই অনুরোধে ইংরাজরাজ তখনও তাঁহাকে interned করেন নাই। লোকটিকে দেখিয়া আমার বেশ ভক্তি হইল; বেশ গম্ভীর অথচ কর্ম্মঠ; এই উদ্যানটিকে নন্দনকাননে পরিণত করিয়াছেন। সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক কলিকাতার Eden Gardens-এর ন্যায় এইখানেই ভ্রমণ করিতে আইসেন।

এই উদ্যানের মধ্যে লৌহফ্রেমে কাচমণ্ডিত একটি প্রকাণ্ড বাটী রহিয়াছে; এত বড় কাচের বাড়ী আমি কোথায়ও দেখি নাই। ইহার মধ্যে পুষ্পপ্রদর্শনী মেলা বসে; ১৮৯১ অব্দে প্রিন্স্ আলবার্ট ভিক্টর কর্ত্তৃক ইহার ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয়।

স্বামীজীরা আমাকে এখানকার জন্মাষ্টমী দেখিয়া যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। অদ্য ১লা সেপ্‌টেম্বর বুধবার জন্মাষ্টমী; এ দিন জন্মাষ্টমী-ব্রত স্মার্ত্তমতে, আর তৎপরদিন শ্রীবৈষ্ণব বা রামানুজ সম্প্রদায়ের মতে; আমাদের বঙ্গদেশের নিয়মও এইরূপ; আমাদের বঙ্গীয় পঞ্জিকার মতে ২রা সেপ্‌টেম্বর বৃহস্পতিবার গোস্বামী-মতে জন্মাষ্টমী-ব্রত নিষ্পন্ন হইয়াছিল। বঙ্গদেশের ন্যায় এ দেশেও জন্মাষ্টমী-ব্রতকে জয়ন্তী বলে। মঠে আজ বেশ উৎসব। নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত অনেকেই আসিয়াছেন; ইঁহারা অনেকেই বিশেষ সম্ভ্রান্ত, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী। টেম্পেল্‌ প্রকোষ্ঠে সভা বসিল, এখানে বক্তৃতা বা তর্ক-বিতর্ক নাই, কেবল সঙ্গীত—কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত। স্বামী অম্বিকানন্দ তানপুরা লইয়া গন্ধর্ব্বনিন্দিতকণ্ঠে সঙ্গীত ধরিলেন।

সকলেই মুগ্ধ, নিস্তব্ধ। এক একটি সঙ্গীত হইবার পর আমি ইংরাজীতে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে লাগিলাম। প্রথম সঙ্গীত হইল, শ্রীকৃষ্ণের জন্মসম্বন্ধে—ইহা ভক্ত সুরদাসের। সঙ্গীতে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে মহাদেব তাঁহাকে দেখিতে আসেন; কৃষ্ণকে দেখিয়া আহ্লাদে শিঙ্গাবাদন করিলেন ও তাঁহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রোতাদিগের মধ্যে এক জনের কথা আমি না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইনি একজন ৭২।৭৩ বৎসর-বয়স্ক অবসর-প্রাপ্ত এসিষ্টাণ্ট কমিসনার বা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ইনি যখন শুনিলেন যে, শিব কৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছিলেন তখন আহ্লাদে এত অধীর হইয়াছিলেন যে, উন্মত্তের ন্যায় সকলকে বলিতে লাগিলেন, "দেখেছ, শিব কৃষ্ণকে দেখিতে আসিলেন এবং শিঙ্গা বাজাইয়া আবার তাঁহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বাঃ, কি সুন্দর!" এ গানটি পুনরায় গাহিতে আদেশ করিলেন। আমি ত গায়কের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে ও বৃদ্ধের সরল ব্যবহারে যেন আবিষ্ট হইয়া পড়িলাম; নিকটে এক জন উষ্ণীষধারী স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন; ইনি একজন উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী। ইঁহাকে যেন তত প্রসন্ন দেখিলাম না। এ দেশে স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবে বেশ মনোমালিন্য আছে। এখানে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধটির একটু পরিচয় দিই। ইঁহার নাম তিরু মলাচার; ১৮৬৫ অব্দে রাজ-কার্য্যে প্রবেশ করিয়া ইনি ১৮৯৯ অব্দে অবসর লয়েন। বৃদ্ধের পুত্র মহীশূর রাজ্যের কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির (Co-operative Credit Society) রেজিষ্ট্রার (Registrar) নাম নারায়ণ আয়েঙ্গার। ইঁহার বয়স ৪৪।৪৫ বৎসর হইবে, বেশ শিক্ষিত। ইনি মহীশূর রাজ্যের বর্ত্তমান যুবরাজের গৃহশিক্ষক ছিলেন; লোকটি যেন কৃত-কর্ম্মতার অবতার, যেমন বলিষ্ঠ তেমনই সরল। পিতা পুত্র উভয়েই গৌরবর্ণ, পৌত্র-পৌত্রীরা চম্পকদাম সদৃশ সুন্দর। নারায়ণ আয়েঙ্গারের মত সরল ও তেজস্বী ব্যক্তি বড় বেশী দেখা যায় না। ইনি বাঙ্গালোর মঠের প্রাণস্বরূপ। স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ইঁহার বিশেষ ভক্তি। নিজের বাটীতে

বৈদ্যুতিক আলোক আনাইয়া মঠের সন্ন্যাসীদের বলিলেন যে, আমার বাটীতে আলোক আনা হইল, আর মঠে যে তৈল-প্রদীপ জ্বলিবে, ইহা কখনই হইবে না। নিজ হইতে প্রায় পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিয়া বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। মঠের চিরন্তন আয়ের জন্য কিছু টাকা দান করিয়াছেন। লোকটি যেমন ভক্ত, তেমনই সরল অথচ তেজস্বী।

২রা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মহীসুর যাত্রা করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। অদ্য শ্রীবৈষ্ণবদিগের মতে জন্মাষ্টমী; কল্য স্মার্ত্ত ও মাধ্বদিগের মতে জন্মাষ্টমী হইয়া গিয়াছে; রাত্রে স্থানীয় Central Collegeর গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুত গোপাল রাও মহাশয়ের বাটীতে স্বামীজীদের নিমন্ত্রণ; নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পাছে ট্রেণ না পাই, এই জন্য আমার নিমন্ত্রণ হয় নাই। রাত্রি ১০টার গাড়ীতে যাত্রা করিতে হইবে, ট্রেণের সময়ের ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে এত বৃষ্টি হইতে লাগিল যে, ভয় হইল, বুঝি সমস্ত আয়োজন ও বন্দোবস্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। সৌভাগ্যবশতঃ বৃষ্টি থামিয়া গেল, স্বামীজীরা আসিয়া পৌঁছিলেন; তাঁহাদের প্রণামাদি করিয়া যাত্রা করিলাম; সঙ্গে অধিক দ্রব্যাদি লইলাম না. রামেশ্বরম্ যাইবার পথে অধিক জিনিস লইবার ফল হাতে হাতে ফলিয়াছে। চাউল, ডাউল, ঘৃত প্রভৃতি আহার্য্য-পূর্ণ বাক্স, সামান্য ২।৪ থানি পরিধেয় বস্ত্র, স্বামীজিদত্ত উষ্ণ বস্ত্র, সামান্য বিছানাপত্র কয়েকখানি প্রয়োজনীয় পুস্তক ইত্যাদি লইয়া পূর্ব্বোক্ত ভৃত্যসহ যাত্রা করিলাম। আমার মনটা আদৌ চঞ্চল হয় নাই; কেননা, দেশভ্রমণ করিয়া করিয়া এক প্রকার অভ্যাস লাভ করা গেছে। রাত্রে গাড়ীতে স্থাপত্য-সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিতে করিতে চলিলাম।

পূর্ব্বেই স্বামীজীরা মহীসুরস্থ তাঁহাদের ভক্ত ও বন্ধু কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয়কে আমার গমনবার্ত্তা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন; ইনি মহীসুর গবর্ণমেণ্টের লোকাল বোর্ডের অডিটার; মহীসুর ষ্টেশনের প্লাটফরমে দেখি যে, ইনি আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, আমি সরকারী অতিথিভবনে (Govt. Guest house) থাকিব; তিনি স্বামীজীর পত্রে এইরূপ বুঝিয়াছিলেন। আমি বলিলাম যে, আমি যাত্রীদের বাঙ্গলো বা Traveller's Bunglow তে থাকিব, আমায় তথায় লইয়া চলুন।" তিনি মনে করিলেন যে, আমি বুঝি ভ্রমবশতঃ এইরূপ বলিতেছি; তাঁহারই ভ্রম বুঝাইয়া দেওয়াতে তিনি নিরস্ত হইলেন। আমরা ফিটন ভাড়া করিয়া সহরের উপকণ্ঠস্থিত ডাকবাঙ্গলোয় আসিয়া পৌঁছিলাম; বাঙ্গলোটি নগরের উত্তরাংশস্থিত দ্বারেরও বাহিরে।

মহীসুর বাঙ্গলোটী প্রথম শ্রেণীর, প্রকোষ্ঠগুলি বেশ প্রশস্ত ও উচ্চ; কিন্তু অনেক দিন হইল ইহার জীর্ণ সংস্কার হয় নাই; অনেকগুলি সার্সির কাচ নাই, জানালা-

গুলি উত্তমরূপে বন্ধ করিতে পারা যায় না ; ইহাতে কিন্তু কলের জলের বেশ বন্দোবস্ত আছে, তবে দিনরাত জল পাওয়া যায় না। কলিকাতা মহানগরীতেই বা এমন সুবিধা কোথায় ? যে আশায় কলিকাতাবাসীর শোণিতসদৃশ অর্থব্যয় করিয়া টালায় বিরাট আয়োজনের ব্যবস্থা করা হইল, তাহাই বা তেমন ফলপ্রসূ হইল কই ?

বাঙ্গলোর বয় বা খান্‌সামা বেশ ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরাজীতে আমায় অভ্যর্থনা ও অভিবাদন করিল এবং কি কি প্রয়োজন, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। এ লোকটি রোম্যান ক্যাথলিক খৃশ্চান ; ইহারা বংশানুক্রমে বাঙ্গলোর বয়গিরি করিয়া বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। সেরিংটামে বা শ্রীরঙ্গপত্তনের ডাকবাঙ্গলোয় বাস করিবার সময় ইহার সহোদর ভ্রাতা ডেভিড বয়রূপে আমায় বিশেষ আদর-আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করিয়াছে। সে কথা পরে বলিব। ইহারা বেশ ভদ্র ও শিষ্ট।

প্রত্যূষে বাঙ্গলোয় পৌছিয়া একটু চা পান করিয়াই কৃষ্ণস্বামী মহাশয়ের সহিত পূর্ব্বরাত্রির ট্রেণে-পরিহিত বেশেই নগর-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিয়দ্দূর আসিতেই পুলিশের একজন লোক একখানি পরওয়ানা লইয়া আসিল ; পূর্ব্বেই বাঙ্গলোর হইতে চিফ-সেক্রেটারীর আদেশজ্ঞাপক পত্র আসিয়া পৌছিয়াছে। পুলিশ-কর্ম্মচারী আমায় জিজ্ঞাসা করিল, আমার কি কি প্রয়োজন ? আপাততঃ কিছুই প্রয়োজন নাই বলিয়া, তাহাকে বিদায় দিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। ঘণ্টায় চারি আনা হিসাবে এক "ঝট্‌কা" বা অশ্বযান ভাড়া করিয়া নগর-পরিভ্রমণে বাহির হইলাম।

আমরা কর্জ্জন্ পার্কের মধ্য দিয়া জগন্মোহন প্রাসাদের নিকটে আসিয়া পৌছিলাম। ভিতরে যাইয়া শুনিলাম যে, প্রাসাদ-রক্ষক বা Palace Controllerর অনুমতি ও ছাড়পত্র ভিন্ন প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশাধিকার নাই। মহারাজার গৃহস্থলী বিভাগের একজন কর্ত্তা আছেন ; তাঁহার নাম Palace Controller। ইনি ডেপুটী কমিশনার বা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন উচ্চ কর্ম্মচারীর মধ্য হইতে নিযুক্ত হয়েন। এখন ফিরিয়া যাইয়া বিশ্রামান্তে মধ্যাহ্নে কন্‌ট্রোলার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কৃষ্ণস্বামী মহোদয় উপদেশ দিতে লাগিলেন। বলিলেন যে, এখন তিনি সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছেন, এখন যাইলে হয় ত বিরক্ত হইতে পারেন। আমিও সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়া বলিলাম, "তাহা হইবে না ; আমাকে পূর্ব্বাহ্ণেই দর্শন করিতে হইবে।" তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ কন্‌ট্রোলার মহাশয়ের বাটীতে যাইলাম ; ইহা প্রায় ১॥০ মাইল দূরে। দ্বারদেশে দেখিলাম, সশস্ত্র প্রহরী মুক্ত কৃপাণ হস্তে পাদ-চারণা করিতেছে ; আমার কার্ড পাঠাইয়া দিলাম ; আমাকে উপরতলের বৈঠকখানায় লইয়া গেল। গৃহতল কার্পেট-মণ্ডিত। পাদুকা না খুলিয়াই প্রবেশ করিলাম ; আমার একটু বিশেষ ধরণের পোষাক পরিধান করা ছিল বলিয়া ও আমাদের দেশপ্রথা

নহে বলিয়া পাদুকা খুলিলাম না; প্রায় ১৫ মিনিটকাল কন্‌ট্রোলার মহাশয়ের জন্য অপেক্ষা করিবার পর তিনি আসিলেন; তিনি তখন সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতেছিলেন; আমিও ইত্যবসরে তাঁহার গৃহের সজ্জা প্রভৃতি দেখিয়া লইলাম; দেখিলাম বেশ বাছা বাছা পুস্তক রহিয়াছে। কার্পেটমণ্ডিত গৃহতলে কৌচ গৃহের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে; দ্বারদেশে জাপানি পর্দ্দা রহিয়াছে ও রবিবর্ম্মার ২।১ খানি সুন্দর পৌরাণিক চিত্র গৃহভিত্তি শোভিত করিতেছে। আমাদের বঙ্গদেশস্থ কোন ধনী ব্যক্তির গৃহে যেন বসিয়া আছি বলিয়া বোধ হইল। আমার বোধ হয়, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এইরূপ ইংরাজী ধরণে গৃহ-সজ্জার ব্যবস্থা করা একরূপ ফ্যাসান্ বা রীতি হইয়া দাঁড়াইতেছে। মহীশূর প্রদেশের মধ্যবিৎ গৃহস্থেরা বোধ হয় আমাদের দেশস্থ মধ্যবিৎ গৃহস্থকে এই বিষয়ে পরাস্ত করিয়াছে। মহীশূর বলি কেন, সমস্ত দ্রাবিড় দেশেই আমার বোধ হয় বিদেশীয় সভ্যতার জীবনীশক্তি জাতীয় মজ্জার মধ্যে অধিকতর দৃঢ়রূপে প্রবেশলাভ করিয়াছে; ইহা চিন্তা করিবার বিষয়।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, নগ্নপদ, পুণ্ড্রক-শোভিত প্রশস্ত ললাট, মুণ্ডিত প্রায় মস্তক ও শিরোদেশের মধ্যস্থলে সামান্য কেশগুচ্ছ-যুক্ত একজন কৃশকায় গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার আগমনে বুঝিলাম, ইনিই কন্‌ট্রোলার মহাশয়। ইনি সাদরে করমর্দ্দন করিলেন; আমি বঙ্গদেশের লাট সাহেবের চিঠিখানি তাঁহার হস্তে দিলাম; আমাকে আপ্যায়িত করিয়া জগন্মোহন প্রাসাদ দেখিবার অনুমতিপত্র দিলেন ও বলিয়া দিলেন যে ইচ্ছা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই তাহা দেখিতে পারি।

মহারাজা যে প্রাসাদে থাকেন, তাহার নাম "দুর্গ-প্রাসাদ" বা Fort Palace; তাহা দেখিবার অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন যে, সম্প্রতি তাঁহার হস্ত হইতে সে ক্ষমতা মহারাজা তাঁহার "হুজুর সেক্রেটারীর" (Huzoor Secretary) হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তবে মহারাজার গৃহস্থলীর সমস্ত বিষয়ের ভার তাঁহার উপর; জানিলাম যে, হুজুর সেক্রেটারী মহাশয় তখন মহারাজার সহিত বাঙ্গালোরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেখানে তার করিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিতে বলিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, এরূপ ফিরিঙ্গী বা বিদেশীয় বেশে প্রাসাদ দেখিতে দেওয়া হয় না। মহারাজকে সম্মানপ্রদর্শনস্বরূপ নগ্নপদে, কটিদেশে কটিবন্ধ ও মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করিয়া যাইতে হইবে। তিনি বলিলেন যে, ইহাতে আপত্তির কোন কারণ নাই; দেওয়ান বাহাদুর বা প্রধান অমাত্য মহাশয়কে পর্য্যন্ত এই বেশে যাইতে হয়; বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ পারসীকদিগকে পর্য্যন্ত এই বেশ পরিধান করিতে হয়। আমি বলিলাম, "বিলক্ষণ, ইহাতে কি আবার কাহারও অসম্মতি হইতে পারে? আমাদের হিন্দু রাজাকে এ প্রকার সম্মান দেখাইব, ইহা ত পরম সৌভাগ্যের কথা। মহারাজা ত আমাদের ভারতবর্ষের

গৌরবস্বরূপ।" কন্‌ট্রোলার মহাশয় বলিলেন যে, তিনি আমার কটিবন্ধ, উষ্ণীষ প্রভৃতির সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন ও নিজে পরাইয়া দিবেন। যতদূর স্মরণ আছে, বোধ হয়, ইঁহার নাম রামকৃষ্ণ রাও; ইনি স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ। ইঁহার সহিত সেই অবকাশে প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা হইল; লোকটি অনেক সংবাদ রাখেন। মৎরচিত পুস্তকের সংবাদ রাখা আছে দেখিলাম। আমার সহিত ভারতীয় স্থাপত্যে গ্রীক প্রভাব-সম্বন্ধে সামান্য আলাপ হইল। আমি অনেকদিন হইতে এই মত চূর্ণ করিবার জন্য একটু আধটু গবেষণা করিতেছি; তিনি আমার মতগুলি শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, "দেখুন, ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত—আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য; মুসলমান-দিগের অত্যাচার ও আক্রমণে আর্য্যাবর্ত্তে প্রাচীন কীর্ত্তির তেমন উদাহরণ পাওয়া যায় না; প্রায়শঃ সমস্তই নষ্ট করিয়া দিয়াছে; কিন্তু দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে ঠিক এরূপ নহে; এখানে অনুসন্ধান করিলে অনেক প্রাচীন বিষয়ের সন্ধান মিলিতে পারে; আর এক কথা, এখানে আপনি বিজাতীয় প্রভাব-বিহীন খাঁটি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের উদাহরণস্বরূপ অনেক নূতন জিনিস দেখিতে পাইবেন।" কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর করমর্দ্দনে আপ্যায়িত করিয়া আমায় বিদায় দিলেন। দ্বারদেশে কৃষ্ণস্বামী মহাশয় অপেক্ষা করিতেছিলেন; তাঁহাকে সমস্ত বলিলে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। আমরা রাজকীয় পাঠাগার, কলেজ, পাব্‌লিক্ অফিস প্রভৃতি দেখিয়া জগন্মোহন প্রাসাদে আসিলাম। লাইব্রেরী বাটীটি উল্লেখযোগ্য। ইহা উচ্চ পোতার উপর নির্ম্মিত ও একতল; ইহার ঈষৎ ঘুরাণ সিঁড়িটি কিন্তু বাটীটির উপযুক্ত নহে। ইহার বারাণ্ডায় কৃষ্ণের গোচারণ প্রভৃতি পৌরাণিক চিত্র জ্ঞাপক Frieze রহিয়াছে; এ প্রকার সুন্দর চিত্র সচরাচর দেখা যায় না। কলেজ-বাটীটি অপেক্ষা ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটি আমার হৃদয় অধিকতর দ্রব করিয়াছে; এ প্রকার উন্মুক্ত স্থানে এই ক্ষুদ্র সৌধটি বিশেষ মনোজ্ঞ; আমি ত বিশেষ মুগ্ধ হইয়া দেখিতে-ছিলাম; বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণস্বামী মহাশয় বিশেষ ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন। লাইব্রেরীর সম্মুখে একটি স্তম্ভের চারি গাত্রে চারিটি অনুশাসন খোদিত রহিয়াছে; ইহা পাঠ করিতে পারা গেল না; আমার বন্ধুটি আমারই মত পণ্ডিত; কি ভাষায় লিখিত, বিশেষ কিছুই বলিতে পারিলেন না; শুদ্ধ বলিলেন যে, বোধ হয় ইহা "হালে কাণাড়ি' ভাষা। ইংরাজী ভাষায় ইহার মর্ম্ম-পরিচয় থাকিলে বিশেষ সুবিধা হইত; কিন্তু মান্দ্রাজ, বেজোয়াড়া ও বাঙ্গালোর মিউজিয়াম দর্শন করিয়া আমার একটা ধারণা হইয়াছে যে, এ দেশে ইংরাজী ভাষায় সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া রীতি নহে। আমি মান্দ্রাজ মিউজিয়-মের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করিয়া জানিয়াছিলাম যে, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ত্তারা নাকি ইহা পছন্দ করেন না; তাঁহারা করুন আর নাই করুন, ইহা নিতান্তই ক্ষোভের বিষয়; সংক্ষিপ্ত বিবরণীযুক্ত মুদ্রিত তালিকা বা

ক্যাটালগও ত প্রকাশিত করেন নাই। আমাদের কলিকাতা মিউজিয়মের ডাঃ এণ্ডারস্যান্ কত পরিশ্রম করিয়া ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে যে দুইখানি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা অসম্পূর্ণ হইলেও অমূল্য। এখানে বলিয়া রাখি যে, ডাঃ ব্লকের মৃত্যুর পর মিউজিয়মের কর্ত্তারা সম্প্রতি যে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা ৩৪ বৎসর পূর্ব্বেকার তালিকা উৎকৃষ্টতর।

সে সব কথা যাউক; আমরা "জগন্মোহন প্রাসাদের" দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রাসাদটী "দুর্গাপ্রাসাদ" বা Fort palaceর উত্তর দরওয়াজার সম্মুখে অবস্থিত। "জগন্মোহন প্রাসাদের" নামের সঙ্গতি আমি ত দেখিলাম না; জগৎকে মোহিত করা দূরে যাউক, আমাকে ত আদৌ মুগ্ধ করিতে পারিল না। এ বাটীটির ন্যায় বাটী কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীতে আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে এখানে অনেকগুলি চিত্র আছে, যাহা দেখিবার জিনিষ। মহিসুরের কোন মহারাজা এ বাটীটি ইউরোপীয় উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের প্রীত্যর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সময় সময় আসিয়া এ সৌধ, তাণ্ডব নৃত্য ও সঙ্গীতে মুখরিত করিতেন ও ফেণিলোচ্ছল সুরাতরঙ্গে নিমজ্জিত হইয়া প্রণয়িনীর প্রেমে আত্মহারা হইতেন; এই বাটীতেই বর্ত্তমান মহারাজার শুভোদ্বাহ ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়; তখন প্রধান অমাত্য ছিলেন সার্ শেষাদ্রি আয়ার। এই বিবাহের সভা একখানি চিত্রে চিত্রিত রহিয়াছে দেখিলাম; সার শেষাদ্রি ঠিক যেন দ্বারবানের ন্যায় একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; বৃদ্ধ অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া মহীসুর রাজ্যকে ভারতের দ্বিতীয় রাজ্যের আসনে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মত কূট ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক ইউরোপের যে কোন রাজসভা অলঙ্কৃত করিতে পারিত। বর্ত্তমান মহারাজের পিতা তাঁহাকে গুরু ও শাস্তার ন্যায় ভয় ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ১৮৮১ অব্দে মহিসুর রাজ্য যখন বর্ত্তমান রাজবংশে অর্পিত হয়, তাহার মূলেও সার্ শেষাদ্রি। ইনিই প্রথম দেওয়ান নিযুক্ত হন। বর্ত্তমান মহারাজার পিতা একটু উচ্ছৃঙ্খল হইলে সার্ শেষাদ্রি তাঁহাকে শাসাইয়াছিলেন যে, তিনি যদি রাজকার্য্যের উপযুক্ত না হয়েন, ইংরাজের করে রাজ্য প্রত্যর্পিত করিবেন। ইনি বর্ত্তমান মহারাজাকে পৌত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন ও কি উপায়ে তাঁহার ও রাজ্যের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তাহা তাঁহার ধ্যান ধারণার বস্তু ছিল; ক্রমশঃ সে সব কথা বলিব। সমগ্র মহিসুরের লোকে তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করে; এত ভক্তি আমরা ত কাহাকেও করি না। এই জন্যই আমাদের এই দুর্দ্দশা। রাজা রামমোহনই হউন, আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ই হউন, আমরা সকলকেই সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। হায় দুর্ভাগ্য, একটি লোক কি নাই—যাঁহাকে আমরা

সমগ্র হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধা দান করিতে পারি। ইহা না হইলে জাতির অভ্যুত্থান কোন কালেই হইবে না। সার শেষাদ্রি মহাশয় যে সমস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এখনও ক্রমশঃ ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত হইতেছে। তাঁহার এমনই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল।

জগন্মোহন প্রাসাদের অঙ্গনে একটি ক্ষুদ্র উদ্যানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এই উদ্যানে season flower or ঋতুপুষ্পগুলি কেমন সুন্দর ভাবে রোপিত করা হইয়াছে দেখিলাম। প্রাসাদের সম্মুখস্থ গৃহটী যেখানে বর্ত্তমান মহারাজার বিবাহোৎসব ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহা বেশ কারু-কার্য্য যুক্ত হইলেও অতিশয় অযত্নে রহিয়াছে। প্রাসাদের প্রথম তলে মৃত মহারাজার অনেক প্রকারের কারুকার্য্যযুক্ত যষ্টি, দূরবীক্ষণ যন্ত্র, হস্তিদন্তখচিত বাক্স ইত্যাদি দ্রব্য রহিয়াছে। একশত বৎসরের অপেক্ষাও প্রাচীন চিত্র দেখিলাম; তাহাতে আমাদের দেশস্থ রাণীগঞ্জ টালির মত টালিযুক্ত ঘর রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এ প্রকার টালি যাহা এ দেশের Burn কোম্পানি রাণীগঞ্জ টালি নামে এবং ম্যাঙ্গালোরের Bassel mission ম্যাঙ্গালোর টালি নামে চালাইতেছেন, তাহা এ দেশেরই নিজস্ব জিনিষ। ইহার পরে আমি ব্যাঙ্গালোরস্থ প্রত্নতত্ত্ব অফিসে যাইয়া মহিসুরান্তর্গত চিতলপুর্ণ হইতে আবিষ্কৃত খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বকার সময়ের ঠিক এই প্রকারের টালি দেখিয়াছি।

আর একখানি চিত্র আমায় আকৃষ্ট করিল, ইহা পুর্ণাইয়ার। টিপুসুলতানের মৃত্যুর পর যখন হিন্দুরাজত্বের পুনরায় অভ্যুদয় হয়, তখন পূর্ণাইয়া প্রধান অমাত্য নিযুক্ত হন; টিপুর সময়েও ইনি একজন অমাত্য ছিলেন। ইনি ধূর্ত্ত চূড়ামণি। মহীসুর রাজ্যের সমস্ত অমাত্যগুলির চিত্র রহিয়াছে। দ্বিতলের চিত্রগুলির মধ্যে টিপুর সহিত ইংরাজের যুদ্ধজ্ঞাপক যে সমস্ত steel engravings রহিয়াছে, সেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বোধ হইল; এই ছবিগুলি পূর্ব্বে অনেকবার কলিকাতাস্থ Victoria memorial প্রদর্শনীতে দেখিয়াছি; যে চিত্রে টীপুর মৃতদেহ প্রদর্শিত, তাহা দেখিয়া হৃদয়ে বেদনা-বিদ্ধ হয় না। এমন নিষ্ঠুর ব্যক্তি বোধ হয় অল্পই আছেন। এক খানি চিত্রে শ্রীরঙ্গপত্তনের সেতুর উপর দিয়া ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল আর্থার ওয়েলেসলি ইংরাজ বাহিনী লইয়া টিপুকে আক্রমণ করিতে যাইতেছেন, বেশ বিশদভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। এ সব অনেক কথা শ্রীরঙ্গপত্তন বর্ণনা কালে বিবৃত করিব। অনেকগুলি চিত্রে প্রাচীন কালের যুদ্ধ ও শোভাযাত্রা বেশ নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত; সে সময়ে কত প্রকারের কৌতুকাবহ যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কতিপয় শ্রেণীর বলিষ্ঠ যোদ্ধারা কেমন নগ্নগাত্রে প্রাচীনকালের অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিতেছে, দেখিলে শুদ্ধ যে

কৌতূহল স্পৃহা চরিতার্থ হয় তাহা নহে, অনেক পুরাতন কথা জানিতে পারা যায়।

জগন্মোহন প্রাসাদটি বেশ উচ্চ; তাহার উপরতলে গিয়া মহিসুর নগরের শোভা নিরীক্ষণ করিলাম। অদূরে চামুণ্ডা পর্ব্বত, সম্মুখে দুর্গপ্রাসাদ, ও পশুশালা-সংক্রান্ত উদ্যান, মধ্যে মধ্যে শ্বেত রক্ত পীত প্রভৃতি নানাবর্ণের সৌধশ্রেণী, দূরে—বহুদূরে পর্ব্বতসঙ্কুল, বনৈশ্বর্য্যগর্ব্বিত ধূসর প্রদেশ দিক্‌বলয়ে মিলিয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

মধ্যাহ্ন প্রায় অতীত হইলে জগন্মোহন প্রাসাদ হইতে ফিরিলাম; ফিরিবার সময় টেলিগ্রাম আফিসে বাঙ্গালোরস্থ হুজুর সেক্রেটারীকে একখানি প্রিপেড্ আরজেণ্ট তার করিলাম। যাহাতে দুর্গপ্রাসাদ দেখিবার অনুমতি দেওয়া হয়। এ দেশের কেমন অভিসম্পাত আছে যে, ২৬ মাসে বৎসর। সময়ের প্রকৃত মূল্য আমরা এখনও শিখি নাই। কবে যে শিখিব, তাহা কে জানে! জরুরি বা আর্জেণ্ট প্রিপেড্ তার করিলাম; উত্তর পাইলাম তিন দিন পরে। তার পাইবার পূর্ব্ব দিন রাত্রে Fort palace অঙ্গনে ভ্রমণ করিবার সময় জানিলাম, সেইদিনই মহারাজা সদল বলে বাঙ্গালোর হইতে মহিসুরে আসিয়াছেন; তখনই ভাবনা হইল যে, আর প্রাসাদাভ্যন্তর দেখা হইবে না। তৎপর দিন তার পাইয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম। হুজুর সেক্রেটারি মহোদয় বাঙ্গালোর হইতে দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, বাহিরের লোককে প্রাসাদাভ্যন্তর দেখিতে দেওয়া হয় না। মহিসুরে বসিয়া এ সংবাদ পাইলাম। তাঁহার বাঙ্গালোর হইতে মহিসুর নগরে ফিরিবার পরদিন আমিও হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, কেননা মন হইতে একটা ভাবনা দূর হইয়া গেল। পুরাতন প্রাসাদ ভস্মসাৎ হওয়ায় কয়েক বৎসর হইল এ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে; ইহার কোন অংশ প্রাচীন নহে বা ভারতীয় স্থাপত্য পরিচায়কও নহে, ইহাতে কোনও বিশেষ নির্ম্মাণ-রীতির প্রচলন নাই; আমি বাহির হইতে একরূপ দেখিয়া লইয়াছি। তবে ইহার মধ্যে নানাপ্রকারের বিলাস সামগ্রী আছে। কৃষ্ণস্বামী মহাশয় বলিলেন যে, কিছুদিন হইতে বাহিরের লোককে প্রাসাদ দেখিতে দেওয়া হয় না; ইহার একটি কারণ প্রচলিত আছে শুনিলাম। তিনি বলিলেন যে, প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ এখন হইতে দুই বৎসর পূর্ব্বে, যখন বরোদার গাইকোয়ার মহোদয় তাঁহার মৃতবন্ধুর পুত্র বর্ত্তমান মহারাজকে দেখিতে আসেন, তখন নাকি অবিমিশ্ররীতি-বিবর্জ্জিত নব-নির্ম্মিত প্রাসাদ দেখিয়া অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করেন; সেই অবধি বাহিরের কাহাকেও প্রাসাদ দেখিতে দেওয়া হয় না; জানি না ইহা কতদূর সত্য। যাহাই হউক, ইহার অন্তস্থলে রাজকীয় কোন গুপ্তনীতি প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া বোধ

হইল। নিজামরাজ্যে ভ্রমণকালে গোলকুণ্ডা দেখিবার জন্য রেসিডেন্সিতে যাইলে, সহকারী রেসিডেন্ট মহাশয় এই প্রকার রাজনীতিমূলক মিষ্ট কথায় আমায় বিশেষভাবে আপ্যায়িত ও সম্মানিত করিয়াছিলেন। আমি তজ্জন্য চির-কৃতজ্ঞ! হায় বাঙ্গালি!

জগন্মোহন প্রাসাদ দেখিয়া বাঙলোয় ফিরিতে প্রায় ১টা বাজিয়া গেল; তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া পুনরায় বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে ভয়ানক বৃষ্টি হইল; এ যেন আমাদের বাঙ্গালা দেশের বৃষ্টি। কৃষ্ণস্বামী মহাশয় তাঁহার আফিসে আসিতে বলিয়া দিয়াছিলেন; ইনি একজন লোকাল্ ওয়ার্কস্ অডিটর বা আয়-ব্যয়-পরীক্ষক। ইহাঁর অফিস মহীসুর নগরের টাউনহলে; এ বাটীতে মিউনিসিপ্যাল অফিসও অবস্থিত। হেল্‌থ অফিস দ্বিতলে; দেখিলাম বারাণ্ডার দেওয়ালে বিজ্ঞাপনের ন্যায় স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় মূল নীতিগুলি লিখিত রহিয়াছে;—যথা, (১) মশক হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি, এই কারণ মশারি ব্যবহার করা উচিত, (২) দুগ্ধ সর্ব্বদা উষ্ণ করিয়া পান করা উচিত, কারণ তাহা না হইলে শীতল দুগ্ধে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অনেক জীবাণু দেহে সংক্রামিত হইয়া নানাবিধ ব্যাধির সৃষ্টি করে, (৩) টীকা লইলে বসন্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ইত্যাদি।

এ প্রকারে জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা বেশ সুন্দর, আমরা সাধারণকে কোনকালে শিক্ষা দিবার বা তাহাদের কু-সংস্কারগুলি দূর করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিব না, অথচ এ দেশবাসীরা স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন বলিয়া অভিযোগ করিব। আমি সভ্য-অভিমানী কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কথাই বলিতেছি; এখানেও জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে তেমন কোন চেষ্টাই দেখা যায় না; কেবল আইন কানুনের সূক্ষ্মজালে চেষ্টাকে সরল সহজ না করিয়া জটিলই করা হইয়াছে।

টাউনহলে অনেক অফিস বসে; এখানকার হলে একটি থিয়েটারের ষ্টেজ বাঁধা আছে; তাহার সম্মুখে গ্যালারী; ষ্টেজের দুই ধারে সরস্বতীর দুইটী সুন্দর চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে; বাঙ্গালা দেশের মত বিকৃত রুচিসম্পন্ন নহে। এ দেশের লোকেরা শিল্প-কলাকে নিজ জাতীয়তার মধ্য দিয়া আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে।

এতক্ষণ ধরিয়া অতিশয় বৃষ্টি হইতেছিল; কৃষ্ণস্বামী মহাশয়ের অফিসে যাইয়া তাঁহার সহকারী ও উপরিতন কর্ম্মচারীর সহিত নানা গল্প করিতে লাগিলাম; শেষোক্ত কর্ম্মচারীর অনুমতি লইয়া কৃষ্ণস্বামী মহাশয় আমার সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন। আমরা চামুণ্ডা পর্ব্বতের উদ্দেশে বাহির হইয়া অবশেষে পশুশালায় যাইলাম, কেন না এ বৃষ্টিতে পর্ব্বতারোহণ বিপত্তিজনক। কলিকাতার ন্যায় এখানকার পশু-

শালার দ্বারদেশে দর্শনী দিয়া প্রবেশ করিতে হয়; বৃষ্টি হইয়া যাওয়ার জন্ম অতিশয় শীত করিতেছিল; আমি ত শীতে কাঁপিতে ছিলাম। এখানকার পশুশালায় এক সুন্দর নিয়ম দেখিলাম; এক এক পশুর পুরুষ ও স্ত্রীকে একত্রে মিথুনভাবে থাকিতে দেওয়া হয়, এক এক পিঞ্জরে ব্যাঘ্র-ব্যাঘ্রী, সিংহ-সিংহী, একত্র রহিয়াছে। ইহাতে তাহারা বেশ সুখে থাকে। আর একটা বিশেষত্ব দেখিলাম; এখানে শুক্রবারে মাংসাশী পশুদিগকে জল ভিন্ন কিছুই আহার করিতে দেওয়া হয় না। পশুরক্ষকেরা বলিল যে, ইহারা ঐ দিন জুম্মা বা শুক্রবার পালন করে। অদ্য শুক্রবার বলিয়া পশু-দিগকে কিছুই খাইতে দেওয়া হয় নাই। শুনিলাম, ইহাতে নাকি তাহাদের শরীর ভাল থাকে—প্রাণিবিদ্‌েরাই জানেন ইহা কতদূর সত্য। এখানে শ্বেত হস্তী, বার্ড অফ প্যারাডাইস, শ্বেত কাক, কুম্ভীর প্রভৃতি অনেকগুলি জীব দেখা গেল; আমার এত শীত বোধ হইতেছিল যে, আমি অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না; এদিকে সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিল। আমরা বাহিরে আসিলাম; দুর্গপ্রাসাদের পরিখার পার্শ্ব দিয়া কৃষ্ণস্বামী মহাশয়ের বাটীতে আসিলাম; তাঁহার বাটীতে তাঁহার অনুরোধে কিছু জল-যোগ করিয়া বাঙ্গলোয় প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

সামর্থ্য

দ্বারকার রাজসিংহাসন, ভাগ্যবান্, বক্ষে ধরি' যবে
বিশ্ব-রাজ ব্রজেন্দ্র-নন্দনে,
বংশীধারী কংসারি সে যবে সংসারীর ছলে বদ্ধ হেন
ঐশ্বর্য্যের বিলাস-বন্ধনে,—
একদিন দেবেন্দ্র-বিজয়, রত্নময় পর্য্যঙ্ক-শয্যায়,
অঙ্কলক্ষ্মী রুক্মিণীর সহ,
অনুরক্ত বিশ্রব্ধ-কৌতুকে, পরস্পারে মান অভিমান—
প্রণয়ের আগ্রহ-নিগ্রহ ;
আত্মকান্তি সহসা নীরস কহে কৃষ্ণ এ কি প্রিয়ে মোর
ঘটিল বিষম শিরঃশূল,
আচম্বিতে, কেন আজি হেন, নিদারুণ দৈব-বিড়ম্বনা,
যন্ত্রণায় অন্তর আকুল ?
শশব্যস্তে, রুক্মিণী অমনি, মৃদু হস্তে, স্পার্শ করি' ঘন
ব্যথিত সে শিরোদেশ তার,
মন্দ মন্দ বীজনী সঞ্চারি' কহে, নাথ, "কহ কিসে হয়
এ ব্যাধির আশু প্রতীকার ?"
চক্রধর কহে, "শুচিস্মিতে, কি কহিব, অসহ্য যাতনা,
বাহ্য বিশ্ব যাইতেছি ভুলি',
প্রতীকার একমাত্র বটে আছে তোমা কহি, সুলোচনে,
সতী-রমণীর পদধূলি।"
কহে রাণী, "কহ, হৃদয়েশ, কে সে সতী, কিবা নাম তার,
কোথা রহে সেই ভাগ্যবতী ?"
কৃষ্ণ কহে, "নহে আর কেহ, দ্বারকায় নারী-শিরোমণি
কৃষ্ণপ্রিয়া রুক্মিণী সে সতী।"
"পরিহাস রাখ, রসরাজ, কহ সত্য, কেবা সে কামিনী,
তব তরে ব্যথা বাজে প্রাণে ;

হরি কহে, "যা কহিনু, প্রিয়ে, এস ত্বরা, ঘুচাও এ জ্বালা
তোমার চরণ-রেণু-দানে।
অসম্ভব এ কি কথা, নাথ, পতি চির-আরাধ্য সতীর,
ধন্যা সতী পতি-পাদোদকে,
রুক্মিণী কি হেন পাপীয়সী বিশ্ব-বন্দ্য-শিরে পদ রাখি'
চিরতরে মজিবে নরকে ?"
দ্বারকা-লীলার পুরোভাগে, নটরাজ ব্রজমাঝে যবে
বসি' শ্যাম যমুনার তটে,
মাধুর্য্যের হেম-তুলিকায় আঁকিতেন নিত্য নব ছবি
গোপিকার চিত্ত-চিত্রপটে,
লীলাময় এমনি একদা, নিভৃত-নিকুঞ্জ-বন-মাঝে,
শিরোব্যথা রাধারে জানায় ;
শক্তিশেল সম রাধিকার বক্ষে বাজে নির্ম্মম সে বাণী,
পতিপ্রাণা উন্মাদিনী-প্রায়।
"কহ ত্বরা, কহ, রাধানাথ, উপশম কিসে হয় ব্যাধি,"
কহে রাধা ভাসি' আঁখি-নীরে ;
কৃষ্ণ কহে, "কৃষ্ণ-প্রাণাধিকে, সুস্থ হই, দাও যদি সতি,
তব পদরজঃ মোর শিরে।"
প্যারী কহে, "জীবন-বল্লভ, আমার যে সরবস্ব তুমি,
ভাল মন্দ কিছু নাহি জানি ;
তোমার সুখের তরে, বঁধু, কি না পারি এ বিশ্ব-মাঝারে ;
পদধূলি অতি তুচ্ছ বাণী !
এই শিরে দিনু পদধূলি, কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী নাহি ডরে,
জগতের নিন্দা অগৌরব ;
সুস্থ তুমি, কহ একবার, হাসিমুখে যেচে লই আমি
জন্ম জন্ম অনন্ত-রৌরব।"

শ্রীবল্লভবল্লভ গোস্বামী।

শকুন্তলার মা

শকুন্তলার মা মেনকা। স্বর্গের অপ্সরা। অপ্সরাদের সেরা। ইন্দ্রের আজ্ঞাকারী। বিশ্বামিত্রের ভয়ানক তপস্যা দেখিয়া ইন্দ্র ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি মেনকাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "উহার তপস্যার বিঘ্ন কর।" মেনকা অপনার অপরূপ রূপ লইয়া বিশ্বামিত্রের কাছে আসিয়া উপস্থিত। বিশ্বামিত্রের তপস্যাভঙ্গ হইল, মেনকার এক কন্যা হইল। কন্যাটিকে তিনি ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। কণ্বমুনি মেয়েটিকে কুড়াইয়া আনিয়া পালন করিলেন। সেই মেয়েটিই শকুন্তলা।

মহাভারতে এই গল্পটি একটু অন্যরূপ। মেনকা যাইতে চাহেন না। কেন না, ঋষি বড় রাগী লোক, পাছে রাগ করিয়া শাপ দিয়া বসেন, সেই ভয়ে তিনি যাইতে চাহেন না। ইন্দ্র পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। মেনকা বলিলেন, "দেখুন, আপনি যাহার ভয়ে অস্থির, আমায় তাহার কাছে পাঠাইতেছেন কেন? তিনি জোর করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। বশিষ্ঠকে নিঃসন্তান করিয়াছেন। আপনার শৌচের জন্য তিনি এক প্রকাণ্ড নদী বহাইয়া দিয়াছেন। যাঁহার দুর্গে মহর্ষি মতঙ্গ ব্যাধ হইয়া, আপনার স্ত্রীপুত্রগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় যিনি আশ্রমে আসিয়া পারা নামে নদী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি মতঙ্গের জন্য যজ্ঞ করিলে, আপনি ভয়ে তথায় সোমপানের জন্য যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যিনি নক্ষত্র দিয়া অপর একটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ত্রিশঙ্কুকে, গুরু শাপ দিলে, তিনি তাঁহাকে অভয় দিয়াছিলেন; এবং তাঁহাকে স্বর্গের রাজ্য পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। যিনি এমন প্রবলপ্রতাপ, আপনি আমায় কোন্ সাহসে তাঁহার কাছে পাঠাইতেছেন?" ইন্দ্র আরও পীড়াপীড়ি করিলেন; মেনকা রাজি হইলেন; কিন্তু সর্ত্ত রহিল যে, আমার সঙ্গে মদন ও বায়ু যাইবেন। মেনকা ঋষির নিকটে গিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বায়ু তাঁহার কাপড় উড়াইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন; তিনি সেই কাপড় ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুজনের মিলন হইল ও শকুন্তলার জন্ম হইল। মেয়েটিকে ফেলিয়া মেনকা স্বর্গে গেলেন। ঋষিও সরিয়া পড়িলেন। পাখীরা দেখিল, এমন মেয়েটি হিমালয়ের নিবিড় জঙ্গলে পড়িয়া আছে, এখনই বাঘে খাইয়া ফেলিবে। তাহারা ঘেরিয়া লালন-পালন করিতে লাগিল। তাই তাহার নাম শকুন্তলা। পাখীরা একদিন কণ্বমুনিকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া মেয়েটিকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিল। শকুন্তলা শব্দের এই ব্যুৎপত্তি আমরা মহাভারতেই পাই; অভিজ্ঞান-শকুন্তলায় ইহার নামমাত্রও নাই।

কিন্তু মেনকা কি শকুন্তলাকে ভুলিয়া ছিলেন? তাহা ত বোধ হয় না। শকুন্তলার গল্প পড়িলেই মনে হয়, একটা-না-একটা অলৌকিক শক্তি তাঁহার অদৃষ্ট ফিরাইয়া দিতেছে; তাঁহার গতিবিধি দেখিতেছে ও যাহাতে তাঁহার ভাল হয় করিতেছে। মহাভারতে ছেলে হইবামাত্রই দেবতারা আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন, আবার রাজা তাড়াইয়া দিলে দৈববাণীতে দেবতারা বলিয়া দিলেন যে, এ ছেলে তোমারই। তুমি শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছিলে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলে গোড়া হইতেই আমরা এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাই। প্রথম অঙ্কে রাজা যেন নিয়তি-প্রেরিত হইয়াই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বিতীয় অঙ্কে রাণীদের নিমন্ত্রণও যেন সেই নিয়তিরই খেলা। চতুর্থ অঙ্কে দৈববাণীও নিয়তির কাজ। বনদেবতাদের হাত বাহির করিয়া গহনা দেওয়া অলৌকিক শক্তির বিকাশমাত্র। পঞ্চমে ত স্ত্রীরূপধারী একটি জ্যোতিঃ শকুন্তলাকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল। ষষ্ঠে মেনকার এক সখী সর্ব্বদাই উপস্থিত। সপ্তমে মেনকা স্বয়ং মারীচের আশ্রমে উপস্থিত আছেন। অতএব মেনকা মেয়েটিকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই। স্বর্গ হইতে তাহার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই উহার উপর চোখ রাখিতেন। অপ্সরা-মহলের সকলেই জানে, শকুন্তলা মেনকার মেয়ে। সকলেই শকুন্তলার মঙ্গলকামনা করিত।

শার্ঙ্গরব যখন শকুন্তলাকে কুলটা বলিয়া তাহাকে পতিগৃহে দাস্য করার কথা বলিলেন, তখন রাজা বলিলেন, "আপনারা কেন উহাকে ঠকাইতেছেন? চাঁদ কুমুদিনীকেই চায়, সূর্য্য কমলিনীকেই চায়; ভদ্রলোকের মন কখনই পরের স্ত্রীকে চায় না।" অর্থাৎ শকুন্তলা আমার স্ত্রী নহে, আমি উহাকে বাড়ীতে দাস্যবৃত্তি করিতেও দিতে রাজী নহি। তখন শার্ঙ্গরব আবার বলিলেন, "আচ্ছা, যদি আপনারই ভুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি হইবে?" তখন রাজা পুরোহিত সোমরাতকে মধ্যস্থ মানিলেন; বলিলেন, "আপনাকেই আমি মধ্যস্থ মানিতেছি, বলুন দেখি, আমিই ভুলিয়া গিয়াছি, অথবা এই মিথ্যাকথা কহিতেছে;—এইরূপই যখন সন্দেহ—তখন আমি কি করি? স্ত্রীত্যাগ করিয়া পাপী হইব অথবা পরস্ত্রী গ্রহণ করিয়া পাতকী হইব? এই দুইএর মধ্যে কোন্‌টা গুরু আর কোন্‌টা লঘু, আপনিই আমায় উপদেশ দিন।" পুরোহিত মহাশয় একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "সাধুরা বলিয়া গিয়াছেন, আপনার প্রথম সন্তানে চক্রবর্ত্তী রাজার সব লক্ষণ থাকিবে। যদি কণ্বমুনির দৌহিত্রের—আপনার পুত্র বলিতে যখন আপনি সঙ্কেত করিতেছেন, তখন কর্ণ মুণির দৌহিত্র বলাই ঠিক সেই সব লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে ইহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে পারেন; নচেৎ ইনি বাপের বাড়ীই যাইবেন;

এখন ইনি আমার গৃহেই থাকুন।” রাজা তাহাতে রাজী হইলেন; কিন্তু তাঁহার সন্দেহ গেল না, তিনি খুসী হইলেন না।

শকুন্তলাকে লইয়া পুরোহিত চলিয়া গেলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তপস্বীরাও গেলেন। রাজা এই চিন্তায়ই মগ্ন হইয়া খানিক বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে নেপথ্যে শব্দ হইল—“আশ্চর্য্য।” রাজা চমকিয়া উঠিলেন; দেখিলেন, পুরোহিত মহাশয় আসিয়াছেন; তাঁহার মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। ক্রমে তিনি ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন, “কণ্ব শিষ্যেরা চলিয়া গেলে মেয়েটি আপনার অদৃষ্টের নিন্দা করিতে লাগিল আর হাত তুলিয়া তুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আর অমনি অপ্সরাদের যে ঘাট আছে, সেইখান হইতে একটা জ্যোতিঃ নামিয়া আসিল; জ্যোতিটার আকার একটি স্ত্রীলোকের মত। সে উহাকে লইয়া উপরদিকে উঠিয়া গেল।” রাজা বলিলেন, “ও কথায় আর কাজ কি? আপনি বিশ্রাম করুন্ গে, আমিও বড় আকুল হইয়াছি, শুই গিয়া।”

এখন সকল বড় বড় নগরেই অনেক ঘাট থাকে। হস্তিনায় শচীর ঘাট ছিল। সেইখানেই গৌতমী বলিয়াছিলেন যে, শকুন্তলার আঙটী হারাইয়া গিয়াছে। আর একটি ঘাট ছিল, তাহার নাম অপ্সরা-তীর্থ। সেখানে, আমরা পরে জানিতে পারিয়াছি, পালা করিয়া অপ্সরারা পাহারা দিত। মেনকার মেয়ের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া সেদিনকার অপ্সরা তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল; মেনকার কাছে তাহাকে দিয়া আসিল। বিষম সঙ্কটসময়ে মেনকার দ্বারাই শকুন্তলার উদ্ধার হইল।

শকুন্তলার মা কি এই উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন? তাহা নহে। তাহার জন্ত সকল অপ্সরাই ব্যস্ত—কিসে রাজবাড়ীর খবর পাইব; কেমন করিয়া রাজা শকুন্তলাকে আবার গ্রহণ করিবেন। একদিন অপ্সরা-তীর্থে সানুমতী অপ্সরার পালা ছিল। সে পালা খাটিয়া মনে করিল, “যাই; রাজবাটীর খবর লইয়া যাই। মেনকার সম্পর্কে শকুন্তলা ত আমার মেয়েরই মত। মেনকা ত আমায় বলিয়াই দিয়াছেন যে, তুমি সর্ব্বদা রাজার বাড়ীর খবর লইবে। আচ্ছা, এই ত বসন্তকাল পড়িয়াছে; এই সময় ত উৎসব হয়; আজ তাহার নামও নাই কেন? আমি ধ্যানে জানিতে পারি; কিন্তু তা হলেও এ খবরটা চোখে দেখাই ভাল। কারণ, তা হ'লে মেনকার উপর আদর দেখান হইবে। যা হোক, আমি অদৃশ্য থাকিয়া এই মালিনীর ব্যাপারটা দেখি। মালিনীরা উৎসবের জন্ত আমের বোউল তুলিতেছে আর গল্প করিতেছে ও বোউল দিয়া মদনের পূজার আয়োজন করিতেছে।” এমন সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া তাহাদের তিরস্কার করিয়া বলিল, “তোরা বোউল ছিঁড়্‌চিস্ যে? জানিস্ না, উৎসব বন্ধ, রাজা নিজে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন?” তাহারা বলিল, “আমরা নূতন আসিয়াছি, জানি না। হাঁ মহাশয়, কেন রাজা এমন হুকুম দিলেন?” সানুমতী মনে মনে বলিল, ‘কোন

গুরুতর কারণ অবশ্যই থাকিবে।' কঞ্চুকী বলিল, "আপনার একটি আঙটী পাইয়া রাজার ঠিক মনে হইয়াছে যে, ঋষির যে কন্যাটিকে সে দিন তাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহাকে সত্য সত্যই বিবাহ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইয়াছে। সেই জন্যই উৎসব বন্ধ।" মালিনীরা চলিয়া গেল। সেইখানে রাজা আসিলেন, বিদূষক আসিলেন, আর প্রতীহারী আসিলেন। রাজাকে দেখিয়াই সানুমতী মনে মনে বলিলেন, "তাড়াইয়া দিলেও শকুন্তলা যে আজও রাজার জন্য ঝোরে, তা ঠিক।" রাজা যখন বলিলেন, "আহা, সে বেচারা আমার মনে করাইয়া দিবার জন্য এত চেষ্টা করিল, তখন ত আমি বুঝিলাম না, এখন মনে হওয়াটা কেবল অনুতাপেরই কারণ হইল।" সানুমতী শুনিয়া মনে মনে বলিল, 'বেচারার ভাগ্যই এমনি।' রাজা সেখান হইতে মাধবীলতাকুঞ্জে গেলেন; সানুমতীও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। রাজা যখন অত্যন্ত কাঁদাকাটি করিতে লাগিলেন, তখন সানুমতী একটু খুসী হইলেন; কিন্তু বলিলেন, "আমরা এমনি স্বার্থপর যে, এ বেচারা কাঁদিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, আর আমার আমোদ হইতেছে।"

রাজা যখন বলিলেন, 'শকুন্তলার মা মেনকা, তাই বোধ হয়, কোন অপ্সরা তাহাকে লইয়া গিয়াছে,' তখন সানুমতী বলিলেন, "ইঁহার যে ভুল হইয়াছিল, সেইটাই আশ্চর্য্য; মনে পড়া ত কিছু আশ্চর্য্য নয়।" রাজা যখন অঙ্গুরীটিকে তিরস্কার করিলেন, সানুমতী বলিলেন, "এটি যদি আর কাহারও হাতে পড়িত, সত্যই তিরস্কারের যোগ্য হইত।" রাজা যখন বলিলেন, "এই আঙটীটি হাতে পরাইবার সময় বলিয়াছিলাম, আমার নামের অক্ষরগুলি রোজ একটি একটি করিয়া গুণিতে থাক; যে দিন শেষ হইবে, সেই দিনই আমার লোক তোমায় লইতে আসিবে।" সানুমতী বলিলেন, "এমন সরস্তও ভাঙে।"

বিদূষক বলিলেন, "জেলের মাছের মধ্যে গেল কি করিয়া?" রাজা বলিলেন, "শচীতীর্থে স্নান করিতে গিয়া হারাইয়া গিয়াছিল।" সানুমতী বলিলেন, "এই জন্যই রাজার বিবাহে সন্দেহ হইয়াছিল। কিন্তু যেখানে এত ভালবাসা, সেখানে কেন অভিজ্ঞান চাহিতে হইবে, বুঝি না।" চতুরিকা যখন শকুন্তলার ছবি আনিয়া রাজার হাতে দিল, সানুমতী বলিলেন, "বাঃ, রাজা ত বেশ আঁকিতে পারেন। সখী যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।" রাজা যখন ছবিটির আলোচনা করিতে লাগিলেন, সানুমতী বলিলেন, "রাজার যেমন স্নেহ, যেমন মমতা, তার মতই আলোচনা হইতেছে।" বিদূষক যখন বলিল, 'এ তিনটির মধ্যে কোন্‌টি শকুন্তলা?' তখন সানুমতী মনে মনে বিদূষককে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। সে যখন বলিল, "এমন ছবি, ইহাতে আবার কি লিখিবে?" তখন সানুমতী মনে করিলেন, 'সখী যে সকল জায়গা ভালবাসে ও তাহার যে সাজ বনবাসে সাজে, এ সব না লিখিলে ত

ছবিখানা পূরা হয় না।' এইরূপে সানুমতী দেখাইতেছেন, তাঁহারা অপ্সরারা, ছবি আঁকায় এক এক জন দক্ষ বৃহস্পতি। কিন্তু দেখিতে দেখিতে রাজাও তন্ময় হইয়া গিয়াছেন, সানুমতীও তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। রাজা ভোমরাটাকে শাস্তি দিবার চেষ্টায় আছেন, এমন সময় বিদূষক বলিল, "এ যে ছবি, কর কি?" তখন সানুমতী বলিলেন, "আমারই ভ্রম হইয়াছিল, রাজার ত হবেই; ইনি যে নিজে ভেবে লিখেছেন।" রাজা মনে করিতেছিলেন, সত্য সত্যই শকুন্তলা সামনে রহিয়াছেন। এখন ওটা ছবি শুনিয়া তিনি একেবারে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। সানুমতী বলিলেন, "রাজার এ বিরহটার গতি বুঝা যায় না; এর আগার সঙ্গে গোড়ার মিল নাই।" রাজা বড়ই বিলাপ আরম্ভ করিলেন, সানুমতী বলিলেন, "সখীকে তাড়াইয়া দিয়া রাজা যে দুঃখ দিয়াছেন, সে দুঃখটা এখন মুছে ফেলা উচিত।" দেবী বসুমতীর উপর রাজার ভাব দেখিয়া সানুমতী মনে করিলেন, 'রাজার মন এখন অন্যের উপর হইলেও রাজা আগেকার ভালবাসা ভুলেন নাই।' রাজা যখন 'আমারও ছেলে নাই' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন সানুমতী কহিলেন, "তোমার বংশ এখন লোপ করে কে?" আবার যখন আপনি নিঃসন্তান বলিয়া রাজা মূর্চ্ছা গেলেন, তখন সানুমতী বলিলেন, "কি কষ্ট, দীপ রহিয়াছে, পর্দ্দার দোষে অন্ধকার দেখিতেছেন। আমি এখনি ইঁহাকে সুখী করিতে পারি, কিন্তু দাক্ষায়ণী শকুন্তলাকে আশ্বাস দিবার সময়ে একদিন বলিয়াছিলেন যে, দেবতারা শীঘ্রই মিলন করাইয়া দিবেন। দিনকতক যাক না। কিন্তু এই সব কথা আমার মুখে শুনিলে তাঁহার নিশ্চয়ই আশা হইবে।" এই বলিয়া সানুমতী অদৃশ্য অবস্থাতেই উপরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

এই যে সানুমতীকে অদৃশ্য করিয়া আনা, ইহাও কালিদাসের একটা ভারি গুণপণা। ইহাতে রাজার কোন উপকারই হইল না, তাঁহার উৎকণ্ঠা-নিবৃত্তি হইল না। না হওয়াই ভাল। যিনি অত সাধ্যসাধনার পরও শকুন্তলাকে নিলেন না, তাঁহাকে মিথ্যাবাদী কুলটা বলিয়া গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার যে একটু শাস্তি হয়, এটা সকলেই চায়। সানুমতী বলিয়াছেন, ইঁহার দুঃখে আমার সুখ হইতেছে। যারা থিয়েটার দেখিতে গিয়াছে, তাহাদেরও মনের ভাব তাই। কিন্তু সানুমতীকে এই ভাবে আনিয়া কালিদাস প্রেমিকবর্গের উৎকণ্ঠাটা অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছেন। আবার রাজাকে শকুন্তলার খবর না দিয়াও শকুন্তলাকে রাজার খবর দেওয়াইয়া তাহার মনেও আশার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। কালিদাস এ কৌশল কোথায় পাইলেন, জানা যায় না। ভাস কবির অবিমারক নামক নাটকে কতকটা এইরূপ কৌশল আছে। একটি আঙ্‌টী ডান হাতে পরিলে

তাহাকে দেখা যাইত, আবার বাঁ হাতে পরিলে দেখা যাইত না। তাই থেকে যদি কালিদাস এই কৌশল লইয়া থাকেন, তাহা হইলে এটা এক রকম নূতন সৃষ্টিই বলিতে হইবে। কালিদাস কোথায় পাইয়াছেন, না জানিতে পারিলেও ভবভূতি যে কালিদাসের এই সানুমতীর অদৃশ্য থাকা লইয়া একটি অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভবভূতি একজন সখীর সহিত সীতাকে অদৃশ্য করিয়া আনিয়াছেন এবং রামের অবস্থা দেখাইয়া নিজের দুঃখ ভুলাইয়া দিয়াছেন। কালিদাস যেটা পরম্পরা সম্বন্ধে করিয়াছেন, ভবভূতি সেইটাই সাক্ষাৎসম্বন্ধে করিয়াছেন।

আমরা কোথাও মেনকাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাই না। কিন্তু তাঁহার কার্য্য সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। অনেক জিনিস তাঁহার কার্য্য নাও হইতে পারে। কিন্তু কালিদাস মেনকাকে বাহির না করিয়া, এমনি কৌশল করিয়াছেন—যাহা তাঁহার কার্য্য নহে, তাহাও তাঁহার বলিয়া বোধ হয়। মারীচাশ্রমেও মেনকাকে আমরা দেখিতে পাই না; কিন্তু দাক্ষায়ণী বলিয়াছিলেন, তিনি এইখানেই আছেন। কেন আছেন? যে হেতু, আজ রাজার সহিত শকুন্তলার মিলনের দিন—আর মেনকা—শকুন্তলার মা।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বিজয়া

রাগিণী—ললিত

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,
ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার ॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা ডাকে বার বার ॥
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হলো বিদার ॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় এ কি বিড়ম্বনা বিধাতার ॥
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি-রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার ॥

রামপ্রসাদ সেন।